পোষ্যপুত্র

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ... কলিকাতা - ৬

চার টাকা আট আনা

সপ্তম সংস্করণ
পৌষ—১৩৬২

উৎসর্গ

যাঁহার অতুলনীয় আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া,

স্নেহে—শাসনে অটল

আদর্শ পিতৃচরিত্র

অঙ্কনে প্রয়াস পাইয়াছি,

আমার সেই পরমারাধ্য পূজনীয়

পিতৃদেবের

শ্রীচরণে

এই অকিঞ্চিতকর গ্রন্থ

হৃদয়ের ঐকান্তিক ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত,

উৎসর্গীকৃত হইল।

পোষ্যপুত্র

১

প্রভাতের শীতল মৃদু বায়ু খোলা জানালার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তরুণ সূর্য্য তখন অরুণ নেত্র মেলিয়া সকৌতুকে চাহিতেছিল, রৌদ্রাভাস চোখে লাগিতে শিবানীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। শশব্যস্তে উঠিয়া বসিয়া দুই হস্তে চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিল। "উঃ! বেলা হয়ে গেছে যে!" বলিয়া ত্বরিতে উঠিয়া পড়িল। বিছানা তুলিয়া কুশের ঝাঁটায় ক্ষুদ্র ঘরখানি ঝাঁট দিতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় হাঁক পড়িল—"শিবি, বলি ও শিবি, আজ কি তুই উঠ্‌বি নি?"

শিবানী তাড়াতাড়ি গৃহমার্জ্জন সারিয়া নীচে নামিয়া গেল। উঠানে রাত্রের উচ্ছিষ্ট বাসন-পত্র পড়িয়া আছে, গরুগুলা এখনও জাব পায় নাই, বাসি ঘর-দুয়ার ভ্যান্‌-ভ্যান্‌ করিতেছে। দেখিয়া সে সলজ্জে গোলা হাঁড়ি লইয়া রান্নাঘরে ঢুকিল।

শিবানীর মাতা সিদ্ধেশ্বরী বিচালীর ঝুড়ি নামাইয়া কহিলেন—"আজ তোকে কুম্ভকর্ণ ভর করেছে না কি লা? সকালবেলা উঠে যে একটু পূজো-আহ্নিক কর্ব্বো তারও যোটি নেই—চার কাল খেটেই মর্‌বো।"

গোময়-মৃত্তিকালিপ্ত হাত ধুইতে ধুইতে কন্যা ধীর কণ্ঠে কহিল—"তুমি চান করতে যাও না মা, আমি এখনি সব সেরে ফেলচি—"

মা গরুকে জাব মাখিয়া দিয়া স্নান করিতে গেলেন।

বর্ষায় যমুনার চর ডুবাইয়া চড়া ভাঙ্গিয়া ঘাটের কোলে কোলে পুরাতন পাথরের সিঁড়ি পর্য্যন্ত জল আসিয়াছে। বস্ত্রহরণ ঘাটের প্রশস্ত সিঁড়ির উপর জটলা করিয়া স্নানার্থীরা কেহ তৈল মাখিতেছে, কেহ মৃত্তিকা দ্বারা মাথা ঘষিতেছে, কেহ কচ্ছপকে ছোলা ভাজা খাওয়াইতেছে, কেহ বা পূজা করিতেছে। সকলেই নিজ নিজ কার্য্যে ব্যস্ত; ঘাটের পাণ্ডারা দস্তুরমত হাঁক দিতেছে, পয়সা লইতেছে, ফোঁটা তিলক দান করিয়া ঠাকুর দেখাইয়া অযাচিত অভিজ্ঞতা জন্মাইয়া দিয়া স্নানার্থী ও দর্শনার্থীকে 'ত্রাহি মধুসূদন' ডাক ছাড়াইতেছে। নিয়মানুযায়ী সবই চলিতেছে।

তথাপি সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরাণীর আজ যেন স্নানের অর্দ্ধেক সুখ চলিয়া গিয়াছিল। বেলা হওয়ায় ভাবীসাবির দল আজ আর কেহ উপস্থিত নাই। স্নান ও স্নানকৃত্য সংক্ষেপে সারিয়া কলসী ভরিয়া বাড়ী ফিরিলেন। শিবানী তখন বাসি পাট সারিয়া, বাসন মাজিয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় সাজাইয়া রাখিতেছিল, মায়ের পদশব্দে মুখ ফিরাইয়া, বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল—"চান হয়ে গেল? এত শীগ্‌গির ফিরলে যে মা?"

কন্যার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া মাতা ভাণ্ডার-ঘরের এক পার্শ্বে জলের কলসী নামাইয়া রাখিয়া, পুরাতন মটকা সাড়ী ও ফুলশূন্য সাজি লইয়া বাহিরে আসিলেন; আর্দ্র বস্ত্র বাঁশের উপর ফেলিয়া কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন—"শিবি, তুই চট্ করে ডুব দিয়ে এসে রান্না চড়িয়ে দে, শেঠ-মন্দিরে আটটার ঘড়িতে ঘা পড়্‌ল, আমি চললুম। নীরদ আসে ত ভাঁড়ারের তাকের ওপর মুড়কি আছে, তাই দিস্, হ্যাঁলো, গোপালজীর পেসাদী প্যাঁড়া বুঝি আছে দুটো, তাই দিস্, বাবুর আবার মুখে মুড়কি রোচে না, পড়েই থাকে দেখি, মুখখানি যে নবাব পুত্তুরের মতন!

"আচ্ছা" বলিয়া শিবানী তেলের বাটি পাড়িয়া চুল খুলিতে বসিল। সিদ্ধেশ্বরী উঠানের এক পাশে ফুলন্ত কৃষ্ণকলি ও টগর গাছ হইতে পুষ্প

পাড়িতে পাড়িতে "যশোদা রাখিল নাম যাদু বাছা ধন,—শ্রীনন্দ রাখিল নাম নন্দেরি নন্দন" ইত্যাদিতে কৃষ্ণমহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

দ্বিপ্রহরের আহারাদি সমাপ্ত হইলে রান্নাঘরের দাওয়ায় তাল পাতার চেটাই পাতিয়া সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরাণী টেকোয় সূতা কাটিতেছিলেন। কাজকর্ম্ম সারা হইয়া গিয়াছে, রাত্রের খাবার ঢাকা দিয়া রান্নাঘরে শিকল লাগাইয়া শিবানী নিকটস্থ যমুনার ঘাটে বাসন ধুইতে গেল।

আকাশে মেঘ নাই, ঘাটের পাথর তাতিয়া উঠিয়াছে, শিবানী ধীরে ধীরে রৌদ্রতপ্ত সোপান বাহিয়া জলের ধারে দাঁড়াইল, তার মনটা মুসড়াইয়া আছে, কিছুই তার ভাল লাগিতেছে না। স্বামীর সহিত কয়দিন বড় একটা দেখা সাক্ষাৎই হয় না, অনেক রাত্রে বাড়ী ফেরে ভোর না হইতেই চলিয়া যায়। কোথায় যায় কিছুই সে জানে না।

ঘাট প্রায় জনশূন্য। দুই একজন ব্রজবাসিনী তাঁদের সুগৌর দেহ নীলজলে অর্দ্ধাবরিত করিয়া স্নান করিতেছিলেন। দুটী বালক কূর্ম্ম-বংশীয়গণের সহিত সৌহার্দ্দ্যবশতঃ স্থানত্যাগ করিতে পারিতেছিল না। শিবানী বাসন মাজিয়া জলে নামিল, বানরের ভয়ে, মার্জ্জিত বাসনের উপর দৃষ্টি রাখিয়া শীতল কালো জলে গলা ডুবাইয়া বসিয়া রহিল।

"হ্যাঁলা শিবি, তোর কেমন ধারা আক্কেল বল্ দেখি? গেলি তো আর ফিরতেই চাস্‌নে যে, কচ্ছিলি কি? যেখানে যাবি, যেন বাঘের মাসি, রায়েদের বউটো বুঝি এসেছিলো?"

শিবানী ভিজা কাপড় নিঙড়াইতে নিঙড়াইতে উত্তর দিল—"কেউ তো আসে নি, মা! আমার কি বেশী দেরী হয়ে গেছে?"

"কি জানি বাছা? নীরদ তো চটে-মটে এই বেরিয়ে গেলো, চাবি খুঁজ্‌লে—পেলে না, পান চাইলে, তা' কে' এখন তাঁর জন্যে পান সাজতে যায়—বল্লাম—'একটা লাগিয়ে নাও না, নয় তো সে এসে দেবেখুনি,

একটু দাঁড়াও, এতো তাড়া কিসের, টেরেন ফেল্ তো আর হবে না।' তা শোনা হলো না, বল্লেন, 'থাক পান আর খাবো না!' এমন মানোয়ারি গোরার মত মেজাজ নিয়ে কি বাপু পরের ঘরে কখন চলে? আমি যাই মানুষ, সাতেও নেই, পাঁচেও নেই, তাই—হুঁ হুঁ—আর কেউ হলে টেরটি পেতেন! চাকরী নেই, বাকরী নেই, বারটা মাস ঘরে বসে কুঁড়ো পাথর ঠাস্‌বেন, আর পান থেকে চূণ খস্‌লেই নবাবপুত্তুর হাঁক পাড়বেন, 'শির লে আও'—তবু যদি না পরদোয়ারী হতেন! কথায় বলে 'পরভাতি' ভাল তো 'পরঘরি' ভাল নয়!"

শিবানী আর্দ্র বস্ত্রাঞ্চলে অসংবরণীয় দুই বিন্দু অশ্রু গোপনে মুছিয়া ফেলিল। এ প্রাত্যহিক ব্যাপারে ইহার চেয়ে বেশী খরচ করা চলে না। কণ্ঠোত্থিত দীর্ঘনিশ্বাস বুকের মধ্যে চাপিয়া ফেলিয়া সে মায়ের কাছে আসিয়া বসিল। মা তুলার চুপড়িটা কন্যার দিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন —"গোটাকতো পাঁজ পাকিয়ে দে'তো, মা, আর গুলের কৌটটা এগিয়ে দিস্, সেই অবধি বকে বকে জিভ শুকিয়ে উঠলো। হরি হে, দয়াময়।"

মাতা-পুত্রী নীরবে আপনাদের কার্য্য করিয়া যাইতে লাগিলেন। শিবানী অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিল। সিদ্ধেশ্বরীর আজ মনটা ভার হইয়া আছে। সকাল হইতে কাহারো সহিত সাক্ষাৎ হইল না, মনের ভিতর মনের কথাগুলা তাল পাকাইয়া উঠিতেছে, দিনটাই আজ বৃথা গেল।

"কৈ গো শিবুর মা, কি কচ্চো?" বলিয়া মাতঙ্গিনী ঠাকুরাণী দেখা দিলেন।—"এসো দিদি, এসো ভাই, এই তোমারি কথা মনে কচ্ছিলাম।"

"তবে আমি অনেকদিন বাঁচবো!" বলিয়া মাতঙ্গিনী তামাক-পোড়া-রঞ্জিত দশন-পংক্তি বিকাশ করিয়া সৌজন্যের হাসি হাসিয়া শিবানীদত্ত

কুশাসনে বিপুল দেহার্দ্ধ স্থাপন করিলেন—"আঃ,—রোদটার আজ তেজ দেখেচো, একটুখানি আসতে পায়ে যেন ফোস্কা পড়ে গেছে! হ্যাঁগা, শিবুর মা, আজ চান কত্তে যাও নি, যাত্রা করো নি কেন গা?"

সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরাণী তৈয়ারী সূতাটুকু লাটাইয়ে জড়াইয়া লইয়া সনিশ্বাসে উত্তর করিলেন—"আর, দিদি, সংসারের কাজের জ্বালায় তো দুদণ্ড ঠাকুর দেবতাকে ডাকবার অবসর নেই, চিরজন্ম ওই-ই কর্ব্বো, না কোথাও যাব আস্‌বো?"

মাতঙ্গিনী মাথা নাড়িয়া সায় দিয়া গেলেন—"তাই তো! সংসারের কথা আর বলো না দিদি?"

মাতঙ্গিনী ঠাকুরাণী যে বর্ত্তমানের কথা না বলিয়া অতীত জ্বালার উল্লেখ করিলেন, তার কারণ বর্ত্তমানে তাঁর ঘাড় হইতে জ্বালা-যন্ত্রণার দায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। শিবানী ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল।

"শিবু। তোমায় আর দেখতেই পাই নে' যে, মা? আহা, বাছা যেন রোগা কাঠিটি হয়ে গেছে, মুখটি শুকনো, সোনার বর্ণ কালি পারা—কেন গা, শিবুর মা?"

শিবানীর মাতা একবার কন্যার দিকে তাচ্ছিল্যভাবে চাহিয়া দেখিলেন—"আর দিদি, ওর কি মনে সুখ আছে? যে কশায়ের হাতে পড়েচে, তাড়নায় তাড়নায় অমন দশা হচ্চে, নইলে খাবার তো আমার ঘরে দুক্ষু নেই, অমন চেহারাই বা হয় কেন? জামাই যে দিন দিন মাথায় উঠে বসচে।—কি আকাট মুখ্যুর হাতেই মেয়ে দিইচি! হরি হে দীনবন্ধু।"

মাতঙ্গিনী শিবানীর হাত ধরিয়া কাছে বসাইলেন—"আয়, মাসি, দু গাছা পাকা চুল তুলে দে। তা, শিবুর মা, জামাই চাকরী বাকরী করে না কেন গা? অক্ষয়দিদির নাতি সেদিন বলছিলো, তোমার জামাই নাকি ভারী বিদ্বান, সে শশীর ছেলের ফাষ্ট বুকের মানে বলে দেয়, কলেজের

পণ্ডিত-মশাই সেদিন নাকি সট্‌কে না নামতা কি জেনে নিচ্ছিল, মুক্ষু তো নয়!"

সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরাণী দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন—"আমার কপাল! চাকরী করলে যে ছুতো ধরবার সময় কমে যায়! করে কি করে? এই আজই দেখ না—মেয়েটা একবার ঘাটে গিয়েছে, কোথাও তো যায় না। না হয় আসুকই—তা নয় রেগে টং হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন! জামাই নিয়ে হাড়মাস জ্বলে গেলো, বোন, জ্বলে গেলো। কোথাকার একটা হাড় হাবাতে লক্ষ্মীছাড়া এসে জুটেছে, মেয়েটাকে হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিয়েছি। বলে 'চাল না চুলো, ঢেঁকি না কুলো—পরের বাড়ী হবিষ্যি'—এক্কেবারে ঠিক তাই!"

মাতঙ্গিনী শিবানীকে একটু ভালবাসিতেন, তার ব্যথা অনুভব করিয়া এ প্রসঙ্গ চাপা দিবার অভিপ্রায়ে প্রস্তাব করিলেন—"আজ গোবিন্দজীর মন্দিরে আরতি দেখ্‌তে যাবে গা—মাসি?

শিবানী মৃদুস্বরে উত্তর করিল—"না।"

"কেন যা'না? কোথাও কি যেতে নেই নাকি? এতই কি ভয়, শালে দেবে, না শূলে দেবে?"

শিবানীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, সে কহিল—"সে ভয় আমি করি না, যেতে ইচ্ছে নেই।"

"এমন জিদী মেয়ে কখনো দেখি নি বোন, একগুঁয়ে মন গুমুরে, মনের কথাটী পাবার যোটী নেই! ঠাকুর দেবতা সব গেল, কেবল স্বোয়ামি আর স্বোয়ামি,—দেবতার অপমান করে স্বোয়ামি-ভক্তি দেখান, ও তাই না, স্বোয়ামির অত ছেদ্দা।"

শিবানী দাঁড়াইয়া উঠিল, খোলা চুল দুহাতে জড়াইয়া ধীরপদে রান্নাঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল, একটি কথাও কহিল না।

প্রৌঢ়াদ্বয় অবাক হইয়া গেলেন, কিছুক্ষণ বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না, তার পর সিদ্ধেশ্বরী গালে হাত দিয়া স্তম্ভিত ভাবে কহিলেন—"দেখলে, দিদি! ওইতেই তো সে এতোটা আস্কারা পেয়েচে! বলি, এতটাই কি ভাল? আমি মা, আমার পরামর্শো নে, আমি তো তোরি ভালর জন্য বলি, আমার কি কর্ব্বি তোরা? আমি কারু পিত্যেশী নই!"

"তা' বোন, এ যে কলিকাল! এখন কি আর মা মাসির উপদেশ চলে, নিজেরাই আইনকর্ত্তা।"

"মরুক গে, নিজেই ভুগবেন, যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে, চোর! তোরি ভালর জন্যে বকে মরি, না শুনিস যা খুসী কর গে যা! তবে এও বলি মেয়েমানুষের একটু তেজ থাকা ভাল, তোরি খেয়ে তোকেই যে পায় থেঁতলায় তোর বরদাস্তই. বা হয় কেমন করে? চাকরী করুক, হ্যাঁ, ধরে মাল্লেও সইবি। বলে, 'বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই কুলোপানা চক্কোর!" চলো গো, দিদি আমরা যাই চলো। বেইমানি বেআক্কেলি মেয়ের কথায় আর থাকতে চাই নি, বোন, উনি নিজে যা বোঝেন তাই করুন।"

সমুন্নত মন্দিরচূড়াশালিনী সুষুপ্তা নগরীর পদধৌত করিয়া নির্ম্মল-সলিলা যমুনা বহিয়া চলিয়াছে। জ্যোৎস্নায় কালো জলে মাণিক জ্বলিতেছে। কোথাও প্রকাণ্ড মন্দির বা প্রাসাদের ছায়া নদীবক্ষে আরো অন্ধকার ঢালিয়া রাখিয়াছে, কোথাও বা পুরাতন বটবৃক্ষের পত্রান্তরালে জ্যোৎস্নালোক জোনাকির মত মিটি মিটি জ্বলিতেছে।

নদীর কোলাহল মুখরিত ঘাটগুলি প্রায় নিস্তব্ধ ও জনশূন্য। ক্বচিৎ দুই একটা ঘাটে পান্সি বা নৌকায় যাত্রীদের মধ্যে কাহারো সাড়া পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র গৃহের ক্ষুদ্র বাতায়নের নিকট শিবানী একা বসিয়া যমুনার দিকে চাহিয়াছিল। জ্যোৎস্নার আলো তাহার উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণটিকে আরো উজ্জ্বল করিয়াছিল, সেই মুখে আলো পড়ায়, সে মুখ আজ আরও গম্ভীর দেখাইতেছিল—সাইক্লোনের পূর্ব্বে সমুদ্রের যেমন একটা শুব্ধ ভাব হয়, তায় মুখে সেই ভীম গম্ভীর ভাব—তেমনি শুব্ধ, তেমনি কঠিন।

এক পাশে নীরদকুমারের আহার্য্য ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে। তক্তা-পোষের উপর মশারি ঢাকা বিছানা, ঘর জ্যোৎস্নালোকে আলোকিত। দূরে দেবালয়ের ঘণ্টা বাজিয়া গেল। শেঠজীর মন্দিরে দ্বিপ্রহরের নহবৎ বাজিয়া উঠিল। আবার সব নিস্তব্ধ। শিবানী স্থিরদৃষ্টিতে জলের পানে চাহিয়া রহিল। একটা দুইটা তিনটা বাজিয়া গেল, চাঁদের আলো ক্রমেই অনুজ্জ্বল হইতে লাগিল, শিবানীর মুখের উপর হইতে জ্যোৎস্নালোক সরিয়া গেল, ঘর অন্ধকারে ভরিয়া আসিল, শিবানী অন্ধকার যমুনাবক্ষে চাহিয়া রহিল।

ভোরের নহবৎ মধুর স্বরে ভৈরবী রাগিণীর আলাপে জগতে উষাগমন জানাইয়া দিল। শিবানীর ক্লান্ত চোখে ঘুম ও অবসাদ জড়াইয়া আসিল।

সে নীল জলের ধারে উষার গোলাপী শাড়ির প্রান্তটুকু হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া উঠিবামাত্র দ্বারে করাঘাত করিয়া দ্রুতকণ্ঠে কেহ ডাকিতেছে—"শিবানি! শিবানি!" শুনিতে পাইল।

শিবানী স্থির হইয়া দাঁড়াইল। একবার তার চোখে একটা আগুনের হল্কা বাহির হইয়া গেল, পরমুহূর্ত্তেই সে আত্মসংবরণ করিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিল ও দ্বার খুলিয়া ধীর পদে নীচে নামিতে লাগিল। কিন্তু তার পূর্ব্বে সিদ্ধেশ্বরীকর্ত্তৃক গৃহদ্বার মুক্ত করিবার শব্দ এবং তাঁর গম্ভীর কণ্ঠ শঙ্খধ্বনিবৎ বাজিয়া উঠিল—"শিবি, ভোরে কে এলো লা?"

শিবানী নামিল না, সিঁড়ির উপরে একটু দাঁড়াইয়া আবার উপরে উঠিয়া আসিল।

সিদ্ধেশ্বরী বকিতে বকিতে দ্বার খুলিয়া দিলেন। আগন্তুক একটি কথা না কহিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। তাহাকে সম্মুখে দেখিয়াই সিদ্ধেশ্বরী উচ্চৈঃস্বরে গর্জিয়া উঠিলেন—"কে তোমার মাইনে করা সাতটা বাঁদি সাতদিকে ঘুরে বেড়াচ্চে যে রাত চারটের সময় উঠে দোর খুলে দেবে শুনি? দিন রাত খেটে খুটে রাত্তিরে একটু নিশ্চিন্দি হবো, তার যোটী নেই! সারা রাত্তির যেথায় ছিলে, আর দু ঘণ্টা সেথায় থেকে সকালে এলেই হতো! কোথা থেকে আমার হাড় মাস পোড়াতে একটা বওয়াটে মাতাল এসে জুটলো গা!"

নীরদকুমার শ্বশ্রূর বাক্যাবলীর উত্তর করিল না। উপরে উঠিয়া ডাকিল—"শিবানি!"

শিবানী উত্তর দিল না। সে সেই জানালায় তেমনি স্তব্ধ—তেমনি স্থিরভাবে বসিয়া রহিল। নীরদ চাদরখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া গৃহমধ্যে অগ্রসর হইল—"শিবানী, শুনতে পাচ্চো? তোমার একটা কথা আমি শুনে যেতে চাই।"

কথার স্বরে জড়তা ছিল না, চলনেও মত্ততা ছিল না। শিবানী মুহূর্ত্তের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল, ঈষৎ দৃষ্টি ফিরাইয়া সে সেই আধো-আলো আধো-অন্ধকারে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তার চিত্ত গলিয়া গিয়াছে—কিন্তু বর্ষণোন্মুখ মেঘ যেমন পশ্চিমা বায়ুর সহিত যুদ্ধ করিয়া শক্তি অটুট রাখিতে প্রাণপণ চেষ্টা পায়, শিবানীও অন্তর্দৌর্ব্বল্যের সহিত সেইরূপ নির্ম্মমভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল।

নীরদ কাছে আসিয়া শিবানীর হাত ধরিল, কহিল—"আমি দুর্ভাগ্য, আমি অক্ষম—সব সত্য, তবু আমি তোমার কাছে এ ব্যবহার প্রত্যাশা করিনি। আমি জানি, পৃথিবী আমায় ঘৃণা করে—বুঝি তুমি ছাড়া—তাই পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক তুলে দিয়েও তোমাকে আপন করেছিলাম, আজ সেই তুমিও কি আমায় ঘৃণা কচ্চো?"

"হ্যাঁ।"

বৃষ্টির পূর্ব্বে মেঘে মেঘে ঠোকাঠুকি হইয়া যেমন বিদ্যুদগ্নি বর্ষণের সহিত গর্জ্জিয়া উঠে, শিবানীর স্তব্ধ মৌন অধর ভেদ করিয়া তেমনি এই আকস্মিক বজ্র উদ্যত হইয়া উঠিল—"হ্যাঁ!" নীরদ তার দুই হাত ধরিয়া ব্যাকুলভাবে মুখের দিকে চাহিল, পূর্ণ অবিশ্বাসে বলিয়া উঠিল—"রাগের কথা নয়, যথার্থ মনের কথা শুনতে চাই—সত্য বলো।"

শিবানী হাত সরাইয়া লইল না, স্থির দৃষ্টি উন্নত করিয়া স্বামীর মুখে স্থাপন করিল,—"কি বলবো?"

"আমায় ঘৃণা কর কি' না।"

"করি।"

নীরদ শিবানীর হাত ছাড়িয়া দিল। পাথরের পুতুলের মুখে যেমন ভাব পরিবর্ত্তন হয় না, তেমনি অপরিবর্ত্তিত মুখভাবে শিবানী দৃষ্টি ফিরাইয়া অন্ধকারমুক্ত গোলাপি আলোকে উদ্ভাসিত-বক্ষ যমুনার পানে চাহিয়া রহিল।

"শিবানী! আজ থেকে মনে করো, তুমি বিধবা,—আজ থেকে তোমাদের সব যন্ত্রণার অবসান হয়ে যাক,—আমি একবার মরেছিলাম, এ আবার দ্বিতীয় মৃত্যু! জন্মের মত চল্লাম, অনেক সয়েছি, জান না তোমার জন্যে আমি যা করেছি জগতে কারু জন্য করি নি। এই তার পুরস্কার?—ভাল!"

নীরদকুমার ঘরের বাহির হইয়া গেল। চাদরখানা ভূমে পড়িয়া রহিল; উঠাইয়া লইল না। শিবানী যথাপূর্ব্ব বসিয়া রহিল, পাথরের মত কঠিন মুখে একটিও রেখা পড়িল না।

নীরদ বাহির হইয়া গেলে সিদ্ধেশ্বরী বকিতে বকিতে উপরে উঠিয়া আসিলেন, মেয়েকে ডাকিয়া বলিলেন—"হ্যাঁলা শিবি! নীরদ এখুনি গেল কোথায়?"

শিবানী উত্তর দিল—"জানি না।"

"সকাল সকাল মুখ হাত ধুয়ে খেয়ে গেলেই তো হতো—এর দোরে তার দোরে টোক্‌লা সেধে বেড়াতে যে ভাল লাগে—বাড়ীর ভাত-বেন্নুন তো ভাল লাগে না! তা' বারণও কল্লি নি—চলে গেল?"

শিবানী এবার মুখ ফিরাইল। ফাঁসীর আসামী যেমন করিয়া জজের পানে চাহে, তেমনই করিয়া সে মায়ের পানে চাহিল, দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল—"না।"

"ধন্যি মেয়ে তুমি বাছা, কেমন বা ছেদ্দা ভক্তি, কেমনই বা মায়া-মমতা কিছু যদি বুঝি! ঢের ঢের মেয়ে দেখেছি এমন মেয়ে আমার বাপের জন্মে দেখি নি! মরুক গে যা,—যা খুসী কর গে' যা'—আমার কি?" বলিতে বলিতে নামিয়া গিয়া সংবাদটি মিতিন ও মাতঙ্গিনী ঠাকুরাণীর কর্ণগোচর করিবার উৎসাহে উদ্যমসহকারে তৈল মর্দ্দন আরম্ভ করিলেন।

লক্ষ্মীপুরের চৌধুরীরা বনিয়াদী বংশ, ক্রিয়াকাণ্ড দানধ্যানে নামার্জ্জনও করিয়াছেন, বর্ত্তমান জমিদার শ্যামাকান্ত চৌধুরীর যদিও কৃপণ অপবাদ আছে, তথাপি দোল দুর্গোৎসবে গৃহে অতিথি সেবার ত্রুটি ধরিবার মত কিছু ঘটে নাই। নাম কেনা, জমিদারীর আয় বাড়ানো, নগদ টাকা খাটাইয়া বৃদ্ধি করা, এই সব চেষ্টায় তিনি ব্যাপৃত থাকিতেন। আর তাঁর ছিল প্রধানতম আকাঙ্ক্ষা একমাত্র মাতৃহীন পুত্র বিনোদকুমারকে মনের মত গড়িয়া তোলা। পাছে আদরের বাহুল্যে ছেলে বিগড়াইয়া যায় এই ভয়ে তিনি তার জন্য লালনের চেয়ে শাসনের নীতিটাই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্যামাকান্তের একটি মাত্র সন্তান বিনোদকে স্বামীর হস্তে সমর্পণ করিয়া বিনোদের মা যখন কালের অকাল আহ্বানে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত সাধের সংসার পরিত্যাগ করিলেন, তখন বিনোদের বয়স দশ বৎসর।

'মরা হাজা' বলিয়া সে সকলকার কাছে পাওনার অধিক পাইয়া আসিয়াছে, পায়ে চোরের বেড়ি, গলায় হাতে—মাদুলী, তাগা, তাবিজ বাঘের নখ, হরিদ্বারের নুড়ি পাথর বাঁধিয়াই ভুবনমোহিনী ক্ষান্ত হইতে পারেন নাই, ধাত্রীর নিকট সাত কড়া কড়ি মূল্য দিয়া তার জন্মমুহূর্ত্তে তাকে যে কিনিয়া লইয়াছিলেন, সেই হইতে শেষ পর্য্যন্ত এক মুহূর্ত্ত তাকে কাছছাড়া করেন নাই। নিজের রোগ শোক অগ্রাহ্য করিয়া ক্ষুদ্র শিশুকে বুকে লইয়া নিদ্রাহীন রাত্রি ও বিশ্রামহীন দিন কাটাইয়া স্পন্দিত বক্ষে কালী দুর্গাকে ডাকিতে ডাকিতে এবং হাঁচিতে কাশিতে সিন্নী, হরির লুট মানিতে মানিতে যখন ভয় ভাবনার

"বিশেষ" কালটা মাত্র কাটিয়া আসিয়াছে, ঠিক সেই সময় তাঁর সকল ভাবনার সমাপ্তি ঘটিল!

মাতৃহীন পুত্র লইয়া শ্যামাকান্ত বিপদে পড়িলেন। পাতা-ঢাকা ফুলের মত যে ছেলে এতদিন মায়ের আঁচলের তলায় ঘুমাইয়াছিল, হঠাৎ এক রাত্রের ঝড়ে তাহাকে কঠিন মাটির উপর শোয়াইয়া দিয়া গেল! শ্যামাকান্ত বিষয়-কার্য্য ভুলিয়া দুই হাতে ধূলা ঝাড়িয়া ছেলে তুলিয়া লইলেন, কিন্তু সেখানে সে নিশ্চিন্ত নির্ভর পাইল না। একে জমিদারের একমাত্র পুত্র, তাহাতে মাতৃহীন—মাসি পিসিদের আদরের কোন ত্রুটি ছিল না, শ্যামাকান্তও কিছুদিন অত্যধিক আদর দিয়া তার চিত্ত হইতে মাতৃস্নেহের অভাব বেদনা মুছিয়া দিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বালক কোথায়ও সেই রত্নের সন্ধান পাইল না। অভিমানী শিশু নীরব অভিমানে অন্তরে দগ্ধ হইতে লাগিল, মুখ ফুটিয়া কোন অনুযোগ করিল না, এ অভাবের বিরুদ্ধে অভিমান করা যায় না, অভিযোগ করা চলে না। স্নানের সময় ভৃত্যের কর্কশ হস্ত গায় পড়িলে গা জ্বলিয়া উঠে, কোমল স্নেহমাখা হাতখানি মনে পড়িলে চোখে জল আসে, ভাতের থালা সম্মুখে দেখিলে দুঃখের আবেগে ঠোঁট বুজিয়া যায়, অন্নগ্রাস কণ্ঠের মধ্যে নামিতে চাহে না, রাত্রে খালি বিছানায় চোখের জল বাধা মানে না। সুগভীর অভিমানের নিগূঢ় ব্যথায় বীরের মত সে জোর করিয়া নিজের শিশুচিত্তকে জয় করিতে চাহিত। অভিমানের অশ্রু প্রাণপণে চাপিয়া ঔদাসীন্যের হাসিতে আত্ম-সংবরণ করিত।—সে যে কি চাহিত, নিজেই বুঝিত না, যাহাই পাইত ভাল লাগিত না, ক্ষোভে অভিমানে গুমরিয়া মরিত। যাহা তাহার প্রাপ্য তাহাকে না দিয়া সকলে মিলিয়া একটা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করিয়া যেন তাকে বঞ্চিত করিতেছে—এমনি মনে হইত। আসল কথাটা এই, পিতাকে সে মায়ের মত করিয়া ধরিয়া রাখিতে চাহিতেছিল, পিতৃস্নেহের

মধ্য হইতে সে তার সবটুকু তৃষ্ণা মিটাইয়া লইতে চাহিতেছিল, মাকে যেমন করিয়া পাইয়াছিল, তেমনই করিয়া পিতাকে সে নিজের হৃদয়ের মাঝখানে পাইবার জন্য আকুল হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু সে কথাটা তো খুলিয়া বলা যায় না. মনের মধ্যে দুর্জ্জয় রোষ ও অভিমানের আগুন জ্বালাইয়া লইয়া সে দূরেই সরিয়া যাইতে লাগিল।

প্রথম প্রথম শ্যামাকান্ত পুত্রকে নিজের চোখে রাখিয়া সাধ্যমত নিজেই তার দেখা শুনা করিতেন, কিন্তু পুরুষমানুষ, বিষয়ী লোক—সর্ব্বদা তাহাকে লইয়া কাটাইলে চলে না, ছেলে যত শান্ত হইতে লাগিল, তাঁরও বাহ্যিক যত্নে শিথিলতা আসিয়া পড়িতে লাগিল। বিনোদ রুদ্ধ বেদনায় জ্বলিয়া ভাবিল—"মা এমন করে আমায় ফেলে থাক্‌তেন না!" মনে পড়িল, পূজাবাড়ির শত কার্য্যের ভিতরও আরতি পূজা সারিয়া তাড়াতাড়ি তাহাকে কোলে তুলিয়া নিজের শয়নগৃহে চলিয়া আসিতেন, কেহ সে সময় বাধা দিলে বলিতেন—'আমার বিনু আগে ঘুমিয়ে পড়ুক, —তখন হবে, ও যে সময় মত ঘুমুতে না পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াবে, সে আমি সহ্য করতে পারবো না।'—হায়! সেই বিনোদ আজ দাসীর পাহারায় একা জাগিয়া—কোথায় সেই স্নেহময়ী মা?

ভুবনমোহিনীর যেটুকু বিদ্যার সংস্থান ছিল, তাহাতেই বিনোদের বর্ণপরিচয় হইয়াছিল, যথাসময়ে তাহার জন্য মাষ্টারের প্রয়োজন হইল। স্কুলের একটি বাঙলা শিক্ষক টেবিল সাজাইয়া বসিলে বাড়ীর মধ্যে সংবাদ পৌছিল। মায়ের কাপড় শক্ত করিয়া ধরিয়া বিনোদ কিন্তু গম্ভীর মুখে ঘাড় নাড়িল। মা বলিলেন—"পড়ে এসো বাবা, মাষ্টার বসে রয়েচেন।"

ছেলে দৃঢ়স্বরে বলিল—"আমি তোমার কাছে পড়ব, আর কারো কাছে না।" মা হাসিয়া কহিলেন—"তুই যে মুখ্যুর ছেলে রে! তোর

মা কি কিছু জানে যে তোকে শেখাবে? এইটুকু শিখে রাখ, বাছা! তুই বিদ্বান হলে তোর মার খুব আহ্লাদ হবে—কেমন বিদ্বান হবি তো?"

বিনোদ মার কোলে শুইয়া পড়িয়া সোৎসাহে বলিল—"খুব বিদ্বান হবো মা!"

"আচ্ছা।"

"হলে তুমি আমায় কি দেবে?"

মা পুনঃ পুনঃ তার ললাটে গণ্ডে চুম্বন করিতে করিতে হাসিয়া বলিলেন—"রাঙা বউ এনে দেব।"

"ধেৎ, তাহ'লে কিন্তু কিচ্ছু শিখব না বলে রাখচি!"

মা ছেলের কণ্ঠবেষ্টিত হাত দুইটা চাপিয়া ধরিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"কেনরে রাঙ্গা বউ চাই না?" ছেলে উত্তর দিল—"রাঙ্গা বউকে তুমি যদি বেশী ভালবাস!" "আচ্ছা রে, না হয় কালো বউ আনা যাবে—তুই এখন পড়বি চ, দেরী হয়ে যাচ্ছে, মাষ্টারমশায় যদি মনে করেন—ছেলেটি বুঝি অবাধ্য! আচ্ছা, আমি দোরের কাছে বসে বসে চুলের দড়িটা বিনিয়ে রাখব'খন, তোকে কিন্তু খুব লক্ষ্মী হয়ে পড়া বলতে হবে।"

"তা'হলে রোজ পড়ার সময় তুমি দোরের কাছে ব'সবে?"

"নিশ্চয়—তুই কেমন সব ভাল জিনিষ শিখছিস্, শুনবো না? মা শুনলে ভুল কর্ব্বার যোটী নেই, খুব শীঘ্র শীঘ্র শিখে ফেলবি, আর যেই পড়া হয়ে যাবে, অমনি আমার কাছে ছুটে আসবি, আমি অমনি কোলে নেব, চুমো খাব—"

বিনোদ উৎসাহিত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল—"হ্যাঁ মা, সেই বেশ হবে! খুউব বেশি বেশি আদর করো, খুব শীগ্‌গির পড়া শিখে ফেলবো!"

প্রথম প্রথম পড়া বলিবার সময় সে হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া দ্বারের দিকে

চাহিয়া থাকিত, কান পাতিয়া যেন কি শুনিতে চেষ্টা করিত। মাষ্টার যদি প্রশ্ন করিলেন—"The ram—মানে?—বলো।" বিনোদ চমকিয়া উঠিত—"বলচি, বলচি—ভেড়া।"

একদিন সন্ধ্যাবেলা ভুবনমোহিনী বিছানায় বসিয়া আদর করিয়া ডাকিলেন—"বিনু, ধন!"

"কি মা?"

"আচ্ছা, তুই পড়া বলতে বলতে চুপ করে, দোরের দিকে চেয়ে থাকিস্ কেন—বল্ তো?"

বিনোদ লজ্জায় মায়ের আঁচল টানিয়া মুখে ঢাকা দিল। মা হাসিয়া মুখের উপর হইতে ঢাকা খুলিয়া দিয়া আপনার বুকে তার মুখখানা টানিয়া কপোলে চুমা খাইলেন—চুপি চুপি কানের কাছে নত হইয়া কহিলেন—"আমি বলবো? আমি আছি কি না দেখিস্, না?"

বিনোদ আরও লজ্জা পাইল, মুখটা মার বুকে গুঁজিয়া হাসিয়া বলিল—"হ্যাঁ, তা'বই কি? তাই যেন—"

"ওরে পাগলা, আমায় কি তুই লুকুতে পারিস্ কিছু? আমি যে তোর মা।" গালের উপর গাল রাখিয়া আদর করিয়া কহিলেন—"ও রকম করলে হবে না তো বাবা, ওতে বরাবরের মত অমনোযোগী হয়ে যাবে যে! একটা কাজ করবো—একটা পর্দ্দা টাঙ্গিয়ে দেব, তার ভেতর থেকে আমায় একটু একটু দেখা যাবে, কি বলিস্?"

বিনোদ মার গলা জড়াইয়া সোৎসাহে উত্তর করিল—"হ্যাঁ, মা, সে খুব ভাল হবে!"

বাড়ীর পড়া সাঙ্গ হইয়া স্কুলে যাবার সময় আসিল। পূজা, হরির লুট, ব্রাহ্মণ-ভোজন প্রভৃতি মঙ্গল অনুষ্ঠান শেষ হইলে, আশীর্ব্বাদ, রক্ষা-কবচ ও গ্রামের বৃদ্ধা গোয়ালিনীর নজর-লাগার-পড়া ফুল প্রভৃতি গলায়

হাতে বাঁধিয়া নূতন কাপড় জামায় সাজিয়া বিনোদ স্কুলের জন্ম প্রস্তুত হইয়া হঠাৎ গোঁ ভরে দাঁড়াইল। ভুবনমোহিনী মুহুর্মুহুঃ চোখ মুছিতেছিলেন, তথাপি মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাগলি কেনরে ?"

বিনোদ মাথা তুলিয়া রুক্ষ স্বরে কহিল—"ইস্কুলে যাবো না—"

"ছিঃ ও কথা বলতে নাই ! ইস্কুলে না গেলে কি বিদ্যে হয় ? তুমি যে বলেছ বিদ্বান হবে ?"

বিনোদ কাঁদো কাঁদো মুখে বলিল—"সেখানে যে তুমি থাকবে না—আমার যদি ভাল না লাগে, আমি তখন কি করব ?"

ভুবনমোহিনীর কণ্ঠ এবার রুদ্ধ হইয়া আসিল ; ধীরে ধীরে চোখ মুছিয়া কহিলেন—"মনে করো, তোমার মা তোমার পাশে আছে। দেবতারা স্বর্গে থাকেন, তাঁদের তো কেউ দেখতে পায় না, তবু তাঁরা রাগ কর্বেন বলে লোকে দোষ করতে ভয় পায়। তোমার মাকে তুমি খুব ভালবাস তো ? যেখানেই যাও মনে ক'রো, মা সব দেখতে পাচ্চেন, অন্যায় দেখলে অমনোযোগ দেখলে মার দুঃখ হবে।"

বিনোদ মাকে প্রণাম করিয়া চুম্বন লইয়া চলিয়া গেল।

সে মা আর নাই ! স্কুল হইতে ফিরিলেই ব্যাকুল আগ্রহে কেহ বুকে টানিয়া লয় না। বাড়ীতে ফিরিবার জন্য সে আগ্রহই বা কোথায় ? বিনোদ প্রথমে ভাবিয়াছিল, পড়া ছাড়িয়া চুপ করিয়া মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকিবে, পড়াশুনা করিবে সে আর—কার জন্য ? কিন্তু হঠাৎ মনে পড়িল, মা বলিয়াছিলেন, মাকে যেন সে মনের মধ্যে রাখে ! তার অন্যায় অমনোযোগে মাকে বেদনা দেয় যদি ? না ! মার কাছে সে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তাহা পালন করিতেই হইবে, বিদ্বান হইতেই হইবে।

শ্যামাকান্ত দেখিলেন পুত্র পড়াশুনায় বেশ উন্নতি করিতেছে বটে কিন্তু বৈষয়িক বুদ্ধির ধার দিয়া চলিতে শিখিতেছে না। সে গরীব

প্রজাদের ঘরে ঘরে, তাঁতি জোলাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া তাদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বেড়ায়, পাইক-পেয়াদার দ্বারা কড়ারকমে খাজনা আদায় করিতে দেখিলে নায়েবের কাছে গিয়া তীব্র প্রতিবাদ করে, অনেক সময়ে নিজের টাকায় প্রজাদের বাকি খাজনা শোধ দিয়া তাদের প্রশ্রয়ের সীমা রাখে না! যাহাকে তাহাকে দান করা, ধার দেওয়া উড়নচণ্ডে রোগগুলি বাড়িয়া উঠিতেছে। বিষয়ী লোক শ্যামাকান্ত প্রমাদ গণিলেন। চিরদিনের সাধ পুত্র তাঁরই মত বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন হইবে, বেশির ভাগ সে বিদ্যা-বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ হইয়া তাঁর ত্রুটিটুকু সংশোধন করিবে। দেওয়ান বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"হবেই তো! ঐ সবই ইংরেজী পড়ার গরম! ইংরেজী পড়লে মাথা কখন ঠিক থাকে না। তবে যার যেদিকে বুদ্ধিটা যায়! ছোটবাবু বলছিলেন, এবার কলকেতায় পড়তে যাবেন, তা'হলে তো একেবারেই সর্ব্বনাশ!"

শ্যামাকান্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"কে ওকে কলকেতায় পড়তে যেতে দিচ্চে? তুমিও যেমন!"

বিনোদ আসিয়া বলিল—"আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে চাই—"

শ্যামাকান্ত ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"না বাপু! সে সব হ'বে টবে না, ও সব মতলব মন থেকে ঝেড়ে ফেল!" বিনোদের ললাট কুঞ্চিত হইল, বুকের মধ্যে আঘাতের বেদনা সুপ্ত অভিমানকে এক মুহূর্ত্তে জাগ্রত করিয়া তুলিল। জিজ্ঞাসা করিল—"কেন?"

"কলকেতায় পাঠালে ছেলেরা ক্রিয়াকাণ্ডহীন হয়ে পড়ে, নাস্তিক হয়ে যায়, তা ছাড়া এবার থেকে তোমাকে কিছু কিছু বিষয়কর্ম্মও তো শিখতে হবে? শুধু কেতাবের বিদ্যে শিখলে তো তোমার চলবে না বাপু! ঘরে একজন মাষ্টার রেখে কিছু ইংরেজী পড়, আর একজন মুন্সী রেখে এদিককার হিসেব-টিসেব গুলো শেখ।"

বিনোদের চোখ চকচকে হইয়া উঠিল, কপালের শিরা ঈষৎ স্ফীত দেখাইল। সে দৃঢ়স্বরে বলিল—"মার ইচ্ছা ছিল আমি বিদ্বান হই—" তার পর সহসা মুখ ফিরাইয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"খরচ আমি বেশি করব না, সামান্য অবস্থার লোকের মতন—বেশ, আপনার যদি মত না থাকে, তবে থাক্—তৎক্ষণাৎ সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছিল, আহত স্বরে শ্যামাকান্ত ডাকিলেন—"বিনু!" বিনোদ ফিরিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু মুখ নিচু করিয়াই রহিল। মাকে মনে পড়ায় অশ্রুসম্বরণ দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। শ্যামাকান্ত কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিলেন, তার পর ধীরে ধীরে বলিলেন—"বসো।"

বিনোদ বসিলে তিনি বলিলেন—"বেশি লেখাপড়া করলে আজ-কালকার ছেলেদের মাথার ঠিক থাকে না, সেইজন্যই পাশের পড়ার উপর আমার ঝোঁক ছিল না, আমাদের ঘরে বিষয়বুদ্ধিই দরকার। সেটার দেখছি তোমার মধ্যে অভাব—তোমার যখন অতই ইচ্ছে, তখন তাই হোক, কলকাতায় পাঠাব—কিন্তু আমার দিন কাটানো কঠিন হবে।"

শেষের দিকটা তাঁর কণ্ঠস্বর কম্পিত হইতেছিল। বিনোদ চকিতের মত মুখ তুলিল, তার সমস্ত হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল! শ্যামাকান্ত একটু থামিয়া আবার বলিলেন—"আজই রজনীকে চিঠি লিখচি—সে তোমার সব ব্যবস্থা করে দেবে, খপরও নেবে, আমি গিয়েও দেখে আসবো—সময় পেলে—"

বিনোদের উন্মুখ চিত্ত ঈষৎ সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। 'সময় পেলে?' ছেলের চেয়ে বিষয়কার্য্য বড়! সময়ের অভাব কি? বলিলেন না তো —"আমিও তোর সঙ্গে যাই চল্।"—মা থাকিলে কি তাকে একা ছাড়িয়া দিতেন?

কয়দিনের মধ্যেই বিনোদ কলিকাতায় পড়িতে গেল। যাইবার সময়

মায়ের অয়েলপেন্টিং ছবিকে প্রণাম করিতে গিয়া তার ব্যথিত অভিমান বাধা মানিতে চাহে না।

পিতার সাড়া পাইয়া চোখের জল মুছিয়া গম্ভীর প্রশান্ত মুখে সে বাহির হইয়া আসিল। পিতাকে প্রণাম করিলে তিনি মাথায় একবার হাতখানা রাখিয়া মৃদুস্বরে কেবল বলিলেন—"এসো।" পরক্ষণে পুরাতন হিসাবের খাতা দেখিতে লাগিলেন। বিনোদ নীরবে গিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। শ্যামাকান্ত বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন—"আজকাল-কার ছেলেগুলো কি রকম শক্ত হচ্চে! আমায় ছেড়ে চল্‌লো, একটু দুঃখও নেই!" বিনোদ কি ভাবিতেছিল, সে-ই বলিতে পারে!

কলিকাতার কোলাহলমুখরিত উৎসাহ-চঞ্চল রাজপথের পার্শ্বে সঙ্গী-হীন এক দ্বিতল কক্ষে যখন সে প্রবেশ করিল, মুহূর্ত্তের মধ্যে তার জীবনের সমুদয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও আশা আনন্দ, বিমানবিচ্যুত অট্টালিকার ন্যায় ভূমিসাৎ হইয়া গেল। এখানে কেমন করিয়া দিন কাটিবে? যেখানে একটিমাত্র চিত্তও তার জন্য এতটুকু ব্যাকুলতা লইয়া জাগিয়া থাকে না! কলেজ হইতে ফিরিয়া শ্রান্ত দেহ বিছানায় ছড়াইয়া দিয়া জানালার পানে চাহিয়া থাকে, পথে জনস্রোত নদীর মত ছুটিয়াছে। বিনোদ দেখিত, সকলকার গতিতেই কেমন একটা আগ্রহ, সকলেরই মুখে কেমন একটা উদ্দীপনার ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। সকালে সন্ধ্যায় তারা প্রতিদিনের মত ছুটিয়া চলে, বিরক্তি নাই, বিরতি নাই, কিন্তু সে—এই কিশোর জীবনেই কি পরিশ্রান্ত!

অভিমান করিয়া পিতাকে আসিবার কথা লিখিল না, ছুটির দিনে তাঁর কাছে যাইবার অনুমতিও চাহিল না। শ্যামাকান্ত ছেলেকে ছাড়িয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু অনর্থক যাওয়া আসা তাঁর পক্ষে একটা দুরূহ কার্য্যের সামিল, সে জন্য সব ঠিক করিয়াও অনেক

সময় যাওয়া ঘটিত না, এদিকে বিনোদকে সর্ব্বদা ট্রেনে চাপাইতেও সাহসে কুলায় না, ভাবিতেন—যেখানে আছে, ভালই আছে, থাক্, বড় ছুটীতেই আসিবে।

রজনীনাথ তাঁহার কলিকাতার উকীল। তাঁহাকেই সর্ব্বদা চিঠি-পত্র লিখিতেন; বয়সে নবীন হইলেও রজনীনাথের উপর তাঁহার একান্ত বিশ্বাস ছিল। তাঁহার সংস্পর্শে পুত্রের নৈতিক চরিত্রোন্নতি ও বুদ্ধি-বিবেচনার যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হইবে, এই বিশ্বাসেই তিনি রজনীনাথের হাতে বিনোদের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। রজনীর নিকট সংবাদ পাইতেন বলিয়া অনেক সময় বিনোদের চিঠির উত্তর দেওয়াও প্রয়োজন বোধ করিতেন না। বাটীতে সেই সময় 'ভাগবত কথা' হইতেছিল, ভক্তিগদ্গদচিত্তে পুরাণ শ্রবণ করিয়া এবং দেওয়ান ও নায়েবের সহিত বৈষয়িক কথাবার্ত্তা কহিয়া নিরানন্দ দিনগুলি কাটিয়া যাইতেছিল।

গ্রীষ্মের ছুটীতে বিনোদ বাড়ী আসিল কিন্তু এখানে আসিয়াও সে শান্তি পাইল না। এতদিন পরে সে ঘরে ফিরিয়া আসিল, আত্মীয়ারা চোখ মুছিতে মুছিতে গায় মাথায় হাত বুলাইয়া নানা ছন্দে জানাইলেন যে জীবন্মৃত শরীরে তাঁরা প্রাণ পাইলেন, কিন্তু পিতা তো কই একটি কথাতেও তাঁর এ কয়মাসের বেদনার কোন আভাসই দিলেন না, বরং প্রফুল্লভাবেই দেওয়ানকে বলিলেন—"পণ্ডিতটিকে নিয়ে ক'মাস বড় আনন্দেই কাটান গেছে, কি বলো হে?" হায় রে মাতৃস্নেহবঞ্চিত হতভাগা!—এ জগতে কোথায় তোর আশ্রয়?

শ্যামাকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—"সেখানে কোন কষ্ট হয় না তো?"

এ প্রশ্নে বিনোদ প্রথমটা মনে করিয়াছিল, উত্তর দিবে—"হয় বই কি" কিন্তু কথাটা বলিতে গিয়া কণ্ঠে বাধিয়া গেল, শুধু উত্তরে ঘাড় নাড়িল—"না।"

"রজনীর সঙ্গে সর্ব্বদা দেখা হয়, না ?"

"হ্যাঁ।"

"তিনি খুব যত্ন করেন, বোধ হয় ? বড় ভাল লোক, তাঁর কাছে তোমায় রেখে নিশ্চিন্ত আছি। তাঁর খুবই ইচ্ছা ছিল তাঁরই বাড়ীতে তুমি থাক। সে তো তোমার মত হলো না, সে হলে আরও ভাল হতো।"

বিনোদ মুখ নত করিয়াই বসিয়া রহিল। তাহার মা তাকে তার পিতার কাছে রাখিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না, সেই কথাই মনে পড়িতে লাগিল। যা থাকিবে না, অতখানি কেন সে পাইয়াছিল ? বুঝি—তার সব পাওনা একেবারে মা মিটাইয়া দিয়া গিয়াছেন !

শ্যামাকান্ত তার মুখের বেদনার অস্ফুট রেখা দেখিতে পান নাই, বলিলেন—"একটা ভয় করে, সহরে বড্ড গাড়ী ঘোড়া ! ট্রামোয়েতে আবার একটা মানুষ মারা কল হয়েছে, ঐগুলোর জন্যেই বড় ভাবনা হয় !"

বিনোদ বলিতে গেল—"তার জন্য ভয় কি ! আমি তো ছেলে মানুষ নই !"—কিন্তু কিছুই না বলিয়া নীরব রহিল। তবু একটা ভাবনা—একটুখানি ভয় থাক্ না।

পূজার ছুটীতে রজনীনাথের সঙ্গে বাহিরে বেড়াইতে গেল। শ্যামাকান্ত রজনীনাথের আবেদন মঞ্জুর করিলেন বটে, কিন্তু এ স্বার্থ ত্যাগ করিতে তাঁহাকে অনেকখানি ত্যাগ স্বীকার করিতে হইল—পুত্র আশা করিতেছিল, পিতা তাহাকে দূরে না পাঠাইয়া কাছেই ডাকিয়া লইবেন !

এমন করিয়া দুই বৎসর কাটিয়া গেল, সংবাদ আসিল, বিনোদ এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

পরীক্ষা দিয়া বিনোদ বাড়ী গেল না। মনের মধ্যে সে একটা নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিতেছিল। রজনীনাথের সাহায্যে এক সাহেব কোম্পানীর সহিত পরিচিত হইয়া সে তাঁদের আফিসে যাওয়া আসা করিতেছিল, মনে কি উদ্দেশ্য ছিল সেই জানে, বলিত—"সব দেখে বেড়াই, কেরাণীবাবুরা কেমন আরামে থাকেন, বোঝবার চেষ্টা করি।"

রজনীনাথ আপনার সময়ে কলেজের মধ্যে উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন, এখন তাঁর সমসাময়িক দলের মধ্যে সকল বিষয়েই উন্নতিলাভ করিয়াছেন। শ্যামাকান্তের সহিত পরিচয় তাঁর অনেক দিনের। দরিদ্রসন্তান রজনী পাঠ্যাবস্থায় দেশের জমীদার শ্যামাকান্তের নিকট সাহায্য না পাইলে এতটা উন্নতি করিতে সক্ষম হইতেন না,—এই কথা তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, এবং এই জন্যই উপকারকের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ভক্তির সীমা ছিল না। শ্যামাকান্ত চৌধুরীও তাঁর উদার চরিত্র, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অটল অধ্যবসায়ের সহিত বিনয় নম্র ব্যবহারে স্নেহ শ্রদ্ধাপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিনোদকে তাঁর তত্ত্বাবধানে রাখিয়া শ্যামাকান্ত যত নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিলেন, এমন নিজের কাছে রাখিয়াও হইতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। পুত্র বিষয়-কার্য্য শিক্ষা করিল না বলিয়া মুখে যতটা আক্ষেপ করিতেন, আন্তরিক ঠিক ততটা করিতেন না। মুখে না বলিলেও পুত্র রজনীনাথের ন্যায় উচ্চশিক্ষিত হইয়া সকলের নিকট প্রকৃত সম্মান লাভ করে—সে ইচ্ছা মনের মধ্যে ছিল। তবে ইংরাজী উচ্চশিক্ষার সঙ্গে মতিগতির পরিবর্ত্তন হইবে ভাবিয়াই আশঙ্কিত হইতেন।

শ্যামাকান্ত শুনিলেন, বিনোদ উচ্চ সম্মানের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। আনন্দে তাঁর চক্ষে জল আসিল। কত সাধনায় পাওয়া

বংশধর—ইচ্ছা করিলে সে বিলাসে আলস্যে দিন কাটাইতে পারিত, সে আজ দশের নিকটে নিজেকে পরিচিত করিতে কত কষ্ট স্বীকার করিয়াছে—ধন্য সুপুত্র! শ্যামাকান্ত মনে মনে পুত্রকে অজস্র আশীর্ব্বাদ করিলেন, কিন্তু বাহিরে কিছুই প্রকাশ পাইল না, পত্রে লিখিলেন—"অনেক দিন বাড়ী ছাড়িয়াছ, কবে আসিবে?" বিনোদ পত্র পাঠ করিয়া আকাশের পানে চাহিল। মা নাই, কার জন্য সে উন্নতির পথ চাহিয়া ফিরিতেছে? আর কেহই ত তার সাফল্য কামনা করে না! না, না, মা যে বলিয়াছেন,—তিনি সম্মুখে না থাকিলেও যে দূরে আছেন, লক্ষ্যে না থাকিলেও অলক্ষ্যে থাকিয়া আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতেছেন!

সে পিতাকে লিখিল, তাকে ইংলণ্ডে পাঠান হউক, সেখানে সে অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছুক।

পত্র পড়িয়া শ্যামাকান্ত স্তম্ভিত হইলেন। সর্ব্বনাশ! এই ভয়ই যে তিনি করিতেছিলেন! উচ্চ শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়, এমন কি রজনীনাথের উপরও তাঁর অত্যন্ত ক্রোধ জন্মিল। কি কুক্ষণেই পুত্রকে ইংরাজী শিখিতে পাঠাইয়াছিলেন। দেওয়ানকে ডাকিয়া পরামর্শ চাহিলে সে সুবিজ্ঞ ভাবে মাথা নাড়িল—অর্থাৎ সুদূর অতীতেই তো এ কথা সে বলিয়া রাখিয়াছে, এ আর এমন নূতন কি? শ্যামাকান্ত পরদিন একান্ত কাতর চিত্তে কলিকাতায় পুত্রের নিকট স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যদি সে কোনদিন লুকাইয়া চলিয়া যায়? বিনোদ পিতার আগমনের উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া মনে মনে খুসী হইয়া ভাবিল যে সে অভিমান করিয়া বাড়ী যায় নাই, তিনি তাহা বুঝিয়াছেন। শ্যামাকান্ত পুত্রকে কোন কথা উত্থাপন করিতে না দেখিয়া আগমনের উদ্দেশ্য প্রকাশ করিলেন না।

আজি-কালিকার দিনে ব্যবসায়-বাণিজ্য শিক্ষার জন্য বিলাত যাওয়া উচিত কিনা এই বিষয় লইয়া একদিন সন্ধ্যায় তাঁহাদের মধ্যে তর্ক উঠিল। শ্যামাকান্ত এই অনার্য্য মতের বিরুদ্ধে তীব্রকণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া উঠিলেন। উভয় পক্ষে বাক-যুদ্ধ বাধিয়া গেল। রজনীনাথ ধীরভাবে কহিলেন—"আপনাদের মধ্যে কেউ বোধ হয় অস্বীকার করবেন না যে, আমাদের মধ্য হ'তে বুদ্ধিমান যুবক নির্ব্বাচিত হয়ে ইউরোপ ও আমেরিকায় বিজ্ঞান-শিক্ষা করতে যাওয়া এখন অবশ্য কর্ত্তব্য।"

"কিন্তু বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্য দেশত্যাগ করবার আবশ্যক কি! দেশে থেকেও কি বিজ্ঞান-চর্চ্চা চলে না? ইউরোপ হ'তে শিক্ষিত লোক এনে যদি বড়লোকেরা কলকারখানা স্থাপন করে শিক্ষার উপায় করে দেন, তা হলে তো চলতে পারে! তবে শিক্ষার ছল করে অশাস্ত্রীয় পথ নে'বার প্রয়োজন কি?" রজনীনাথ যুক্তি দিয়া এ প্রস্তাব খণ্ডন করিলেন।

উভয় পক্ষে বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। বিনোদ আগ্রহের সহিত শুনিতে লাগিল এবং প্রস্তরে যেমন চিরস্থায়ী চিহ্ন অঙ্কিত হইয়া যায় তেমনি করিয়াই রজনীনাথের কথা তার মস্তিষ্কের মধ্যে মুদ্রিত হইয়া গেল। যথাসময়ে বিতণ্ডা শেষ হইয়া গেল, বিনোদের মন হইতে উহা নিঃশেষ হইল না, সে ভাবিল—শিল্পবিজ্ঞানশিক্ষাই আমাদের পতিত জাতির উদ্ধারের আধুনিক পথ—এ ভিন্ন এ নিরন্ন দেশের অন্নসংস্থানের দ্বিতীয় উপায় নেই।

পরদিন কোর্টের কাজ সারিয়া শ্যামাকান্ত চৌধুরী রজনীনাথের সহিত ফিরিয়া জলযোগে বসিয়াছেন, গৃহস্বামীর ছয় বৎসরের কন্যা শান্তিলতা নীলাম্বরী শাড়ির অঞ্চলে মাথা ঢাকিয়া বধূবেশে শুভ্রহস্তে পানের ডিবা লইয়া তাঁর সম্মুখীন হইল।

বালিকার অম্লান কচি মুখে স্বর্গের জ্যোতিঃ, পুষ্পপুটতুল্য অধর-প্রান্তে মধুমাখা মিষ্ট হাসি! রজনীনাথ কন্যাকে ক্রোড়ে বসাইলে সে পিতার অঙ্ক হইতে শশব্যস্তে নামিয়া পিতাকে ধমক দিল—"আমি এখন বড় মেয়ে হয়েছি, বউ হয়েছি দেখছ না?—কোলে বস্‌বো কি? কাজ কর্ব্বো না?"

শুনিয়া শ্যামাকান্ত হাসিয়া উঠিলেন—"তাই তো, মস্ত মেয়ে হয়েছে যে! বাঃ, ঘোমটাও দেওয়া হয়েছে! এস তো বুড়ি, কেমন বউ হয়েছ, দেখি।"—বালিকা স্বচ্ছন্দে অল্প পরিচিতের নিকট গিয়া দাঁড়াইল। শ্যামাকান্ত সস্নেহে বলিলেন—"রজনী তোমার মেয়েটি ভারী সুন্দরী তো! এ মেয়ে যাদের বৌ হবে, তাদের ঘর আলো কর্ব্বে। হাঁগা লক্ষ্মি! তুমি আমার বৌমা হ'বে?"

পার্শ্বোপবিষ্ট বিনোদকুমারের মুখ লজ্জায় ও বিরক্তিতে লাল হইয়া উঠিল। সে এতক্ষণ নিঃসঙ্কোচে ক্ষুদ্র বালিকাকে দেখিতেছিল, কিন্তু এখন বাধ্য হইয়াই মাথা নীচু করিল। যদিও সে জানিত, পিতার এ পরিহাসের মধ্যে একবিন্দু সত্য নাই, কারণ সে সপ্তদশ বৎসরের যুবক এবং রজনীনাথের কন্যা ছয় বৎসরের বালিকা, তবু লজ্জা বোধ হইল।

রজনীনাথ সকৌতুকে হাসিয়া বলিলেন—"বেশ তো আপনি আমার মেয়েটিকে নিয়ে আপনার ছেলেটি আমায় বদলে দিন না! আমি ওকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিখতে বিলাতে পাঠাই। এমন বুদ্ধিমান উন্নতিশীল ছেলেই তো আমাদের ভবিষ্যৎ ভরসা।"

এ পরিহাস প্রৌঢ় জমিদারের আদৌ ভাল লাগিল না। তিনি ইহাতে কান না দিবার ভাণ করিয়া শান্তির নরম হাতখানি ধরিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া লইলেন, কহিলেন—"কেমন বুড়ি আমার বৌমা হবে তো? আমার বাড়ী গিয়ে আমার পান সেজে দিতে পারবে?"

নির্লজ্জা বালিকা পিতার সাক্ষাতেই অপরিচিতের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া সাগ্রহে ঘাড় নাড়িল, "হ্যাঁঅ্যা, হবো। আমি পান সাজতে পারি, কমলানেবু ছাড়াতে পারি, কলাইস্তুটী ছাড়াতে পারি, সব পারি।"

উভয়ে হাসিয়া উঠিলেন। বিনোদও হাসিল কিন্তু তার মন তখন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে; সে ভাবিতেছিল—"রজনীবাবু যা বল্লেন, বাবা কানেও তুললেন না, বোধ হয় তামাসা বলে উড়িয়ে দিলেন কিন্তু আমি বিলেত যাবোই যাবো; ফিরে এসে দেশের কাজ করবো। আমরা কি মানুষ! পরের উপর ভাত কাপড়ের পর্য্যন্ত নির্ভর করে শেকলবাঁধা কুকুরের মত বেঁচে আছি।"

শ্যামাকান্ত বলিলেন—"রজনী! বিনোদের জন্য একটি পাত্রী স্থির করে দাও না; বিনোদের বিয়ের জন্যে ভাবনায় পড়েছি; ঘটক ব্যাটারাও বড় জ্বালাচ্চে, উপযুক্ত মেয়ে পেলেই বিয়েটা দিয়ে ফেলি। ঘরদ্বার সবই তো শূন্য—লক্ষ্মীহীন সংসার যেন শ্মশান হয়ে রয়েছে।"

রজনীনাথ একটু হতাশভাবে বলিয়া উঠিলেন—"বিয়ে! এখনি? বিনোদের মত ছেলে হ'তে অনেক উন্নতির আশা আছে, অসময়ে বিয়ে দিলে সমস্তই ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।"

"না হে না, তোমরা নব্যতন্ত্রের লোক—তোমরা সাহেবদের মত বুড়া করে ছেলেমেয়ের বে'দেওয়া ভালবাসো, সেটা বড়ই অনিষ্টকারক! আমাদের সেই সাবেক চালই আমাদের পক্ষে ভাল। আমার যখন বিবাহ হয়, তখন আমার বয়স বার বৎসর, আর বিনোদের গর্ভধারিণী সাত বৎসরের। আমি অবশ্য অত ছোট পছন্দ করি না, এগারো বারো বৎসরের একটি ভদ্র ঘরের মেয়ে চাই, কিন্তু মেয়েটি খুব সুন্দরী হওয়া দরকার।" বলিয়া ক্রোড়স্থ শান্তিকে চুম্বন করিলেন—"এই এমনি বউটি হয়?—আহা বুড়ি যদি দু' বৎসর আগে আস্‌তিস্?"

রজনীনাথ ঈষৎ স্নেহগর্ব্বে কন্যার দিকে বারেক অপাঙ্গে চাহিয়া মৃদু হাসিলেন, কহিলেন—"কেন হবে না? আচ্ছা আমি দেখ্‌বো, জগৎপুরের ভাদুড়ীরা আমার মক্কেল, তাদের বাড়ী একটি মেয়ে দেখেছিলাম, লতির চেয়েও সুন্দর।"

"কি বল তুমি!—এর চেয়ে সুন্দর আছে?"

বিনোদ পিতার এই অসময়োপযোগী প্রস্তাবে বিরক্ত হইয়াছিল, কিন্তু বালিকার প্রতি তাঁর অত্যধিক আকর্ষণে ঈষৎ কৌতূহলের সহিত তার দিকে চাহিল। ইহাকে সে অনেকবারই দেখিয়াছে; কিন্তু অতশত মনে করিয়া দেখে নাই, দেখিল, বালিকা তার পিতার কোলে বসিয়া সোনার চেনটা নাড়ানাড়ি করিতেছে, মাথার কাপড় খসিয়া পড়িয়াছে; গুচ্ছ গুচ্ছ কালো চুলের মধ্যে প্রফুল্ল সুন্দর মুখটি সবুজ পাতার মাঝখানে বসোরা গোলাপের মত আলো করিয়াছে। বিনোদের বড় ভাল লাগিল।

পথে পিতাপুত্রে কোন কথা হইল না। গাড়িতে উঠিয়া পিতা এমন স্নেহের সহিত তার হাত দুইখানা হাতের মধ্যে চাপিয়া আগ্রহ নেত্রে মুখের পানে চাহিলেন যে, বিনোদের কতদিনকার পুঞ্জীভূত হৃদয়বেদনা এক মুহূর্ত্তে সাড়া দিয়া উঠিল, চোখে জল আসিল। এই পিতা, এই স্নেহময় জনক, ইঁহারই স্নেহের প্রতি সে সন্দেহ করিয়া আসিয়াছে! সে কি ভ্রান্ত! কি মূঢ়! পিতৃস্নেহে গণ্ডী টানিয়া তার সার্ব্বভৌম অধিকারকে খর্ব্ব করা হইয়াছে, এ বিশ্বাস কোথা হইতে আসিল? আপনাকে ধিক্কার দিয়া নীরবে সে ক্ষুদ্র শিশুটির মত পিতার জানুর উপর মাথা রাখিল।

এবার গৃহে আসিয়াও শ্যামাকান্ত দুই চারিদিন নিয়মের ব্যতিক্রম করিলেন। কোন প্রকারে বিলাত যাওয়ার কথা ভুলাইয়া ফেলিবার জন্য সর্ব্বদাই তিনি পুত্রকে চোখে চোখে রাখিতেছিলেন—কিন্তু খুব বেশি দিন নিজেকে এরূপ অসহায়ভাবে একটি বালকের ক্রীড়া পুতুলে পরিণত

রাখা তাঁর পক্ষে ক্লেশকর, ক্রমে তিনি পুত্রের সম্বন্ধে কতকটা বিপন্মুক্ত বোধ করিয়া নিজের নিয়মানুযায়ী কার্য্যভার গ্রহণ করিতে লাগিলেন। বিনোদ ক্ষুণ্ণ হইল, কিন্তু কিছুই বলিল না।

এদিকে মেয়ে দেখাদেখি করিতে বৎসর ঘুরিয়া গেল। গ্রীষ্মের ছুটিতে বিনোদ বাড়ী আসিলে কথাপ্রসঙ্গে শ্যামাকান্ত বিবাহের কথা পাড়িয়া বলিলেন—রজনীনাথের দেওয়া মেয়েটি পছন্দ হইয়াছে, তাদের কথা দিয়াছেন অগ্রহায়ণ মাসে বিবাহ। একজামিনের বৎসর বলিয়া ছুটী মঞ্জুর করাইয়া লইল, কিন্তু পরীক্ষান্তে পরীক্ষার সুফল ঘোষিত হইলে আর কোন অজুহাত মিলিল না। প্রথম আষাঢ়ে বিবাহ ধার্য্য হইয়া গেল। এ সংবাদে বিনোদ চমকিয়া উঠিল। তার সকল আশা ধূলিসাৎ হইয়া গেল। শ্যামাকান্ত পুত্রের ভাব লক্ষ্য করিলেন না, তিনি দেওয়ানের দিকে ফিরিয়া পূর্ব্বালোচনার অনুসরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন—শীঘ্রই তাঁরা বিনুকে আশীর্ব্বাদ করতে আসবেন, বাড়ীটা একবার রং ফেরাতে পারলে ভাল হয়। এঁর মৃত্যুর পর বাড়ীতে কোন বড় কাজ তো হয় নি, এবার আমার উপরই তো সব ভার! আঃ, তিনি থাকতে আমাকে কি নিশ্চিন্তই রেখেছিলেন!" শ্যামাকান্ত দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। দেওয়ান বিরলকেশ মস্তক আন্দোলিত করিয়া গভীর সহানুভূতির সহিত কহিলেন—"তা আর বল্‌তে? মা আমার কি লক্ষ্মীই ছিলেন! আমাদের প্রতিই কত স্নেহ! আহা, মা থাকলে আজ কত আনন্দই না করতেন!"

বিনোদ কাঠের পুতুলের মত বসিয়া রহিল। তার মনের মধ্যে উত্তাল তরঙ্গ বহিতেছিল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া দেওয়ানের সহিত বিনোদের বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া অবশেষে শ্যামাকান্ত যখন সন্ধ্যা বন্দনার জন্য উঠিলেন—তখন হঠাৎ বিনোদের হুঁস হইল, সে কি মূঢ়ের ন্যায় এ সুযোগটুকুও

প্রত্যাখ্যান করিয়া ফেলিবে ? এখনও সে মুক্ত, এখনও সে স্বাধীন, কিন্তু লৌহ-শৃঙ্খল—শীঘ্রই কঠোর বেষ্টনে আঁটিয়া ধরিতে আর কতটুকু দেরি !

সে মৃদুস্বরে ডাকিল—"বাবা !"

শ্যামাকান্ত অন্যমনস্ক ছিলেন—প্রথম ডাক শুনিতে পান নাই। দ্বিতীয় ডাকে চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিছু বলবে ?"

বিনোদ ক্ষীণকণ্ঠে কহিল—"হ্যাঁ,"—কিন্তু আর কিছু সে বলিতে পারিল না, ঘামিয়া উঠিল। পিতাকে সে জানিত, তার প্রার্থনা যে তাঁকে সহজে টলাইতে পারিবে না, সে বিষয়ে তার সন্দেহ ছিল না। শ্যামা-কান্ত প্রশ্নের অপেক্ষা করিয়া একটু বিরক্ত হইলেন—একটা সম্ভাবনা স্মরণে আসিতে ঈষৎ ভয়ও হইল, মনের ভাব গোপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বল্‌বে ? বলো ?"

বলিবার চেষ্টা করিয়াও সঙ্কোচে কথা বাধিয়া যাইতেছিল, অবশেষে জোর করিয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল—"বিয়ে থাক, আমি বিলাত যাবো।"

শ্যামাকান্ত এই ভয়ই করিতেছিলেন—তার সাহস দেখিয়া একটু আশ্চর্য্য হইলেন, ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া ক্রোধে নৈরাশ্যে তাঁর আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। ক্রুদ্ধ স্বরে কহিলেন—"কেন, দেশের বিদ্যেয় কুলুবে না ? না—ফিরীঙ্গী হ'বার সাধ হয়েচে ? ও সব হবে না বাপু, যা কচ্চো, তাই করো, যাও, আর কথা বাড়িও না, যাও।"

বলিতে বলিতে উহাকে কথা কহিবার সময় না দিয়া তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। হতভম্ব বিনোদ দাঁড়াইয়া রহিল।

কিন্তু ঝটিকা যখন আসন্ন, তখন বায়ু আর কতক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারে ? বজ্র-বিদ্যুৎ বহিয়া দেখা দিল !

নবীন জীবনে লোকে নিরাশার অন্ধকার কল্পনা করিতে পারে না—

আশার সূর্য্যালোক প্রাণমন আলোকিত করিয়া রাখে। বিনোদ পিতাকে জানাইল, সে বিলাতে ব্যবসা শিক্ষা করিতে যাইবে এবং ফিরিয়া শিল্প-শিক্ষাশ্রম খুলিয়া দেশের যুবকদের মধ্যে শিল্পশিক্ষার বিস্তার করিবে। এখন বিবাহ করিতে চায় না। শ্যামাকান্ত বালকের খেয়াল, পরে বাতুলের প্রলাপ বলিয়া অগ্রাহ্য করিলেন, এবং শীঘ্র শীঘ্র পাকা দেখার আয়োজন করিবার আদেশ দিলেন। কিন্তু বাধাপ্রাপ্ত বিনোদ ক্রমেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিতেছিল, একদিন সে পিতার মুখের উপরেই বলিয়া বসিল—"দেশাচারের জন্য কোন সদুদ্দেশ্য ত্যাগ করা মনুষ্যত্ব নয়! যদি বিলাত যাওয়া অশাস্ত্রীয় হ'ত মানতাম। কেন আমায় যেতে দেবেন না? —আমি যা'ব।" শ্যামাকান্ত ক্রোধে অধীর হইয়া উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, —"তবে আমার বাড়ী থেকে একেবারেই দূর হয়ে যা বেল্লিক! বাঁদর, তোর জন্যে কি আমি জাত জন্ম খোয়াব? অবাধ্য ছেলে থাকার চেয়ে অপুত্রক হওয়াও ভাল! তুমি যদি ও সঙ্কল্প না ছাড়ো, আর এ জন্মে তোমার মুখ আমি দেখ্‌বো না।"

অকস্মাৎ বজ্রাঘাতে বনস্থলী যেমন নিঃশব্দে জ্বলিয়া উঠে, তেমনি করিয়া অভিমানী যুবকের সমস্ত হৃদয় মুহূর্ত্তের মধ্যে জ্বলিয়া উঠিল। একবার মাত্র সে পিতার ক্রোধোত্তেজিত মুখের পানে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, পরমুহূর্ত্তে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

প্রথম দিন শ্যামাকান্ত রাগের মাথায় পুত্রের খবর লইলেন না। পরদিন ক্রোধ একটু পড়িয়া আসিলে সন্ধান লইতে গিয়া শুনিলেন—সে পূর্ব্বদিনই চলিয়া গিয়াছে, কোথা কেহ তা জানে না।

পুত্র পিতাকে ত্যাগ করিয়া গেল—তবে পিতারই বা এমন কি প্রয়োজন যে সেই অকৃতজ্ঞের সন্ধানে ছুটিয়া বেড়াইবেন? যাক্, যে যাইতে চায় সে যা'ক!

রাগ করিয়া কয়দিন তিনি পুত্রের সংবাদ লইলেন না, পূজার্চ্চনা ও বৈষয়িক কার্য্যাদির মধ্যে অধিকতর মনোনিবেশ করিয়া সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য দেখাইতে লাগিলেন, কিন্তু তেমন করিয়া আর ক'য়দিন কাটে ? দেখিতে দেখিতে পিতৃহৃদয় একান্ত ব্যাকুল ও অস্থির হইয়া উঠিল। কি নির্লজ্জ তাঁর এই কর্ম্মচারীগুলা। তিনিই না হয় পুত্রের উপর রাগ করিয়া আছেন—সেইজন্য না হয় পুত্রের সংবাদ লইতেছেন না, কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা কি করিয়া নিশ্চিন্ত রহিল ? তাদের তো সে প্রভুপুত্র—তাদের তো সে ভবিষ্যৎ প্রভু—একটা দায়িত্বজ্ঞানও কি শরীরে কারু নাই ?

পিতা পুত্রের উপর রাগ করিবে—কেন করিবে না ? কিন্তু তাই বলিয়া তারা সকলে মিলিয়া কিসের জন্য এমন বেয়াদবি করিতে সাহস পায় ! দেওয়ান আসিলে কহিলেন—"তোমরা আজকাল ভারী নবাব হয়ে যাচ্চো, কোন্ কাজটা মন দিয়ে করো বল তো ? যদি না পারো কিছুদিন ছুটীই নাও।"

দেওয়ান পুরাতন লোক—কর্ত্তার মেজাজ জানিত, ভৎ'সিত হইয়া বিরক্ত হইল না, ভৎ'সনার কারণ বুঝিয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল এবং শ্যামাকান্ত নীরব হইলে সঙ্কুচিতভাবে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল—"আমি খোকাবাবুর সঙ্গে ইষ্টিশান পর্য্যন্ত গেছলুম, তিনি কিছুতেই ফিরলেন না—তা'র পর তাঁ'র বাসাতেও—"

"ওঃ, তা'হ'লে সে-বাসাতেই গেছে ? আচ্ছা যাও, হতভাগা ছেলে তেজ করে বাড়ী থেকে চলে গেলে, বাপের কাছে থাক্‌তে অপমান বোধ হলো, সেও কি আমারই বাড়ী নয়—"

দেওয়ান ভীত ভাবে বাধা দিল—"তিনি সেখানেও নেই। আমি তাঁকে অনেক বোঝালুম, বাড়ী ফেরাবার ঢের চেষ্টা করলুম, কানে তুললেন না, বল্লেন—"বাবা আমার মুখ দেখবেন না বলেছেন, আমিও এ মুখ

তাঁকে আর দেখাব না, তোমরা মনে করো তোমাদের বিনোদ—' বড় একটা বিশ্রী কথা বলে ফেল্লেন, ওঁদের মুখে তো কিছু আটক খায় না !" জড়িত কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া পুনশ্চ কহিল—"আরো বল্লেন—'আমার মা থাকলে কি বাবা এমন করে আমায় দূর হয়ে যেতে বলতে পারতেন, কাকামশাই ? যা'র মা নেই, তার কেউ নেই !"

দুইজনে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। অবশেষে সেই গভীর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া শ্যামাকান্তের বিরক্ত কণ্ঠ স্তব্ধ কক্ষে ধ্বনিত হইয়া উঠিল—"তুমি অমনি ফিরে চলে এলে ? কি সুন্দর কর্ত্তব্যজ্ঞান। আশ্চর্য্য—"

"না, আমি কিছুতেই তাঁর সঙ্গ ছাড়ি নি, রাত্রেও সারারাত্তির জেগে রইলুম, পরদিন সকাল বেলা খোকাবাবু বল্লেন—'শরীরটা বড় খারাপ বোধ হচ্ছে, একজন ডাক্তার ডাক্‌লে হয় না ? আর দুটো সোডা ওয়াটারও আন্‌তে দিন্, অমনি।' কপালে হাত দিয়ে দেখলুম, গা বিলক্ষণ গরম ! হরেকে কার্ত্তিকবাবুর ডিস্‌পেন্সারিতে পাঠিয়ে নিজেই হরিশ ডাক্তারকে ডাকতে গেলুম। আধ ঘণ্টাও হয় নি, ফিরে এসে দেখি, তিনি আমাদের ছুতোকরে সরিয়ে দিয়ে বাড়ী থেকে চলে গেছেন ! কাল পর্য্যন্ত সেখানে তন্ন তন্ন খুঁজে হায়রাণ হয়ে আজ এইমাত্র ফিরে আস্‌ছি—"

এতক্ষণ শ্যামাকান্ত স্তব্ধভাবে থাকিয়া শুনিতেছিলেন। কথা শেষ হইলে তাকিয়ার উপর উপুড় হইয়া পড়িলেন।—সে সত্যই চলিয়া গিয়াছে !

—চলিয়া গিয়াছে ! আর ফিরিয়া আসিবে না ?—তবে আর তাঁর কি রহিল ? কে রহিল ? তবে আর কিসের মান, কিসের সম্ভ্রম, কিসের কীর্ত্তি ? সেইই যদি ছাড়িয়া গেল, তবে আর কিসের জন্য, এ সব ? এই বংশ গৌরব, তবে আর কার জন্য ? না, না, সে আসিবে, আসিবে, আবার আসিবে—সে কি তা'র বাপের কোল

ছাড়িয়া দূরে থাকিতে পারে? নিশ্চয় আসিবে। কোথায় যাইবে? বিলাত? আমেরিকা? হা রে অকৃতজ্ঞ ছেলে! এই মন লইয়া তুই দেশের কাজ করিবি? নিজের বাপের কষ্ট বুঝিলি না, বাপের উপর কর্ত্তব্য ভাবিলি না, বিদেশে চলিলি দেশের প্রতি কর্ত্তব্য শিখিতে? যা, তোর বিবেচনা হয়, তাই কর্ তবে। কিন্তু—ওরে বিনু আমার! রাগ করিয়া চলিয়া গেলি! ওরে সত্যই কি আমি তোকে দূর হইয়া যাইতে বলিয়াছিলাম? ছেলে অবাধ্য হইলে বাপ কি তাকে শাসন করে না? কিন্তু কেমন করিয়াই বা তুই বুঝিবি, কখনও তো কিছু বলি নাই, হঠাৎ একেবারে বড় নিষ্ঠুর কথা বলিয়া ফেলিয়াছি! অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া দেওয়ানের পানে চাহিলেন। বৃদ্ধ কর্ম্মচারী মৌন বিষাদে বিষণ্ণ-মুখে চাহিয়াছিল, সান্ত্বনা দিবার ভাষা সে বোধকরি খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

"বিপিন! জ্বরটা কি বেশী হয়েছিল? গা কি বড্ড গরম ছিল?" সন্ত-পুত্র-শোকাতুরের সেই আর্ত্ত কণ্ঠস্বর প্রভুভক্ত ভৃত্যের বুকে আঘাতের মত বাজিল! সজল নেত্র মার্জ্জনা করিয়া উত্তর দিল—"না খুব বেশী নয়, বোধ করি সামান্যই জ্বর।"

"হুঁ, আচ্ছা, যাও।"

বিপিন গমনোদ্যত হইয়া আবার ফিরিল—"কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে হয় না?"

শ্যামাকান্ত নিদারুণ নৈরাশ্যহত দৃষ্টি মেলিয়া ছাড়া ছাড়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন—"বিজ্ঞাপন?—কেন? তা'তেই কি সে ফিরবে? সে তো বলে গেছে, আর আস্‌বে না, তবে?"

দেওয়ান মাথা চুলকাইয়া কাশিয়া গলাটা পরিষ্কার করিল, খানিকক্ষণ ইতঃস্তত করিয়া বলিল—"তবু চেষ্টা করা উচিত!"

"উচিত তো কর নি কেন? আমায় যন্ত্রণা দে'বার জন্যে? যে' যা

উচিত জানো করতে পার নি এতক্ষণ? কেন, আমার কি লোকজন কেউ নেই? না টাকার কিছু অনটন পড়েছে? যা কিছু উচিত, সব আমার ঘাড়ে চাপাবার জন্যে জমা করে কেন রাখা হয়? যাও—তুমি এবং আর যার যা ইচ্ছে হবে—উচিত বোধ হবে—সেই মত কাজ সব্বাই মিলে করো গে'। নিজেদের বুদ্ধিতে কুলিয়ে না ওঠে, শ্রীশবাবুর কাছে যাও। হ্যাঁ কলকাতায় রজনীর কাছেও যেতে পারো! যাও—যাও—আমায় তোমরা একটুখানি ছুটী দাও।"

দেখিতে দেখিতে লোকের মুখে মুখে সংবাদটা শাখায় পল্লবে গজাইয়া উঠিল। বাড়ীতে মাসী-পিসি-মামী-দিদি প্রভৃতির উচ্চ ক্রন্দনের রোলে পাড়ার লোক তটস্থ হইয়া পড়িল এবং চৌধুরীদের জ্ঞাতিরা হরির লুটের বন্দোবস্ত করিয়াছিল কিনা সুস্পষ্ট জানা না গেলেও কি যেন একটা অস্পষ্ট গুজব শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল।

শ্যামাকান্ত রজনীনাথের প্রতিও অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। বিনোদের বিলাত যাইবার সংকল্পের মূলে রজনীনাথের পরামর্শ অনেকখানি সহায়তা করিয়াছিল। তিনি বিশ্বাস করিয়া তাঁহার হস্তে পুত্রের ভার নিশ্চিন্তচিত্তে ফেলিয়া দিয়াছিলেন, তা'র পরিবর্ত্তে তাঁরই অনভিপ্রেত কার্য্যে তাহাকে উৎসাহিত করা কি রজনীনাথের উচিত হইয়াছে? শ্যামাকান্ত জানিতেন, বিনোদ রজনীনাথের কথায় নিজের সমস্তই অকুণ্ঠিত চিত্তে সমর্পণ করিয়া দিতে পারে। তিনি যদি প্রশ্রয় না দিতেন, তবে সে এমন বিকৃত বুদ্ধি হইত না।

বিনোদের পলায়নের পূর্ব্বদিন লেখা রজনীনাথের পত্র দেওয়ানের নিকট হইতে পাইয়া তাঁ'র সে সন্দেহ দূর হইয়া গেল। রজনীনাথ এজন্য অংশতঃ দোষী হইলেও সম্পূর্ণ দোষী ন'ন। বিনোদকে পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিতে তিনি পুনঃপুনঃ নিষেধ করিয়াই

পত্র লিখিয়াছেন, পিতৃনির্দ্দিষ্ট পথে থাকিয়া সদিচ্ছা পূর্ণ করিতেই উপদেশ দিয়াছেন।

অনুতপ্ত শ্যামাকান্ত তাঁহারই উপর পুত্রের অনুসন্ধান ভার প্রদান করিয়া লিখিলেন—"তুমি তা'কে ফিরাইয়া আনো রজনী, আমি তোমার হাতে তা'কে, তুলে দেব। তাকে এই কথা জানিয়ে দিয়ো!" রজনীনাথ যথাসাধ্য বিনোদের অনুসন্ধান ইতিমধ্যে করিতেছিলেন, কিন্তু ফল কিছুই হইল না। ইংলণ্ড, সমগ্র ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান সর্ব্বত্র পুলিশ বিজ্ঞাপন ও পরিচিত লোকের সাহায্যে সন্ধান লওয়া হইল, কিন্তু কোনখানের কোন ছাত্রাবাসে তার উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

দেশের লোক অন্তরালে বিনোদের মৃত্যুসম্বন্ধে কানাকানি করিল। মর্ম্মাহত পিতা বিদ্ধপক্ষ বিহঙ্গের মত ছটফট্ করিতে করিতে লুটাইয়া যন্ত্রণাক্লিষ্ট বুক চাপিয়া ধরিলেন। ট্রেনে কাটাপড়ার একটা সন্দিগ্ধ প্রমাণ ইতিমধ্যে পাওয়া গেল, ঐ বয়সেরই তরুণ ছেলে, গায়ে তার বিনোদেরই কোট, চেহারা চেনার কোন উপায় ছিল না।

দিনের পর দিন কাটিয়া গেল। প্রথমে দেশের লোক, পরে তার নিজের গৃহে নিরুদ্দিষ্ট বিনোদের স্মৃতি অল্পে অল্পে লুপ্ত হইয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু তাঁর পিতৃবক্ষে সে স্মৃতি কেবল অগ্নিময় অক্ষরে লিখিত রহিল না, অসহ্য দাহ-জ্বালায় দগ্ধ করিতে লাগিল। কতবার ভাবিতেন—যে তাঁর মুখ চাহিল না, এ বৃদ্ধ বয়সে তাঁর প্রতি বিন্দুমাত্র মমতা করিল না—যে সামান্য একটা ভর্ৎসনা সহ্য করিতে না পারিয়া অনায়াসে তাঁকে ছাড়িয়া গেল—সেই অকৃতজ্ঞ সন্তানের প্রতি তাঁরই বা কিসের এত মমতা? নারীর মত এ অন্ধ অনুরাগ কি শ্যামাকান্ত চৌধুরীর সাজে?

কিন্তু আজ কৈ সে আত্মদমনশক্তি? থাকিয়া থাকিয়া শুষ্ক জ্বালাময় চক্ষু আর্দ্র হইয়া আসে যে! সে অকৃতজ্ঞের কথা মনে হইবামাত্র সমস্ত

শরীরের রক্ত যে হিম হইয়া যায়, হস্তপদ অসাড় হইয়া পড়ে? এ দুর্ব্বলতার হস্ত হইতে কেমন করিয়া আত্মরক্ষা করিবেন?

এ যেন লক্ষ্মীপুরের পরাক্রান্ত জমিদার সেই শ্যামাকান্ত চৌধুরী নয়! সে শ্যামাকান্ত, সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী, বিষয়-তৃষ্ণা-পরায়ণ শ্যামাকান্ত আজ বাঁচিয়া নাই!—নিষ্ঠুর কাল নির্ম্মম কষাঘাতে শ্যামাকান্ত চৌধুরীকে বিচূর্ণ করিয়া তাহার স্থলে এক পুত্রহারা শোকবিহ্বল স্নেহময় পিতার প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছে। কেমন করিয়া ভুলিবেন সেই নিরুদ্দিষ্ট অকৃতজ্ঞ তাঁর ইহ-জীবনের একমাত্র আশা-জ্যোতিঃ, অন্ধ নয়নের একমাত্র ধ্রুবতারা এবং পরলোকের সমস্ত ভরসা!

৫

বৃষ্টিধৌত গাছপালার উপর দিয়া ফুরফুরে হাল্কা হাওয়া বহিতেছিল, রজনীনাথের উদ্যানে যুঁইকুঁড়িগুলি ফুটিয়া উঠিল—ম্লান ফুলগুলি ঝরিয়া পড়িল। প্রাচীরের ধারে আম গাছে কাঁচা আম, লিচুর ঝাড়ে রাঙ্গা লিচু এবং প্রশস্ত উদ্যানে প্রস্ফুটিত অর্দ্ধস্ফুটিত পুষ্প-শোভা ও মধ্যে মধ্যে কঙ্করময় আলোহিত পথরেখা দুই ধারে তার এক জাতীয় ছোট গাছের পাড় দুএকটী লতাকুঞ্জ এবং স্থানে স্থানে লৌহ মর্ম্মরাসন।

উদ্যানের মধ্যে শ্বেতবর্ণের সুন্দর অট্টালিকা সৌন্দর্য্যে ঐশ্বর্য্যে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে।

গাড়ীবারান্দার থাম লতাজড়িত। তার উপরকার পরী-শিশু-বাহন পক্ষী-রাজ শিল্পীর নিপুণ হস্তে রজনীনাথের বাড়ী সব লইয়া সুচিত্রিত ছবির মত।

উদ্যানের লৌহ-বেঞ্চে গৃহস্বামী ও অপর একব্যক্তি বসিয়া কথোপ-কথন করিতেছিলেন।

অদূরে লৌহ রেইল্ বেষ্টিত শ্যামল তৃণাস্তৃত ভূমে দুইটি চঞ্চল-হরিণশাবক খেলিয়া বেড়াইতেছিল, আর তাদেরই মত কৃষ্ণোজ্জ্বল-নয়না একটি বালিকা তার চঞ্চল-গতি ভাইটির সহিত তাদের ক্রীড়া দেখিতেছিল। বালক দিদির হাত হইতে কোমল হরিৎ দুর্ব্বা লইয়া তাদের মুখে ধরিতেছে, তাদের সহিত উল্লাসে লাফাইতেছে ছুটিতেছে, আবার আসিয়া দিদির কাছে দাঁড়াইয়া খেলা দেখিতেছে। কিছুক্ষণ পরে বালকের আর ঐ খেলা ভালো লাগিল না, সে দিদির হাত ধরিয়া টানিল।

"বেশ! পায়রাগুলোকে বুঝি খেতে দিতে হবে না? তুমি তরু নিরুকে সব্বার চেয়ে বেশি ভালবাসো!" ছোট ভাইটির কোমল গাল দুটি সস্নেহে টিপিয়া দিদি হাসিয়া বলিল—"শুধু সুকু ছাড়া!"

ভাই ভগিনী তাদের কুশের ডালা দুইখানি উল্টাইয়া পায়ারার খোপের নিকট গিয়া আহার্য্য বিতরণ আরম্ভ করিল।

দেখা গেল শস্যকণিকার লোভে দলে দলে ঘুঙুর পরা সাদা কালো পাটল বিবিধ বর্ণে চিত্রিত সুন্দর পারাবতগুলি খোপ ছাড়িয়া উড়িয়া আসিয়া চারিদিক হইতে দুটি ভাই বোনকে ঘেরিয়া ফেলিয়াছে।

"দিদি! দিদি! নতুন লক্কাটা তোমার কাঁধে গিয়ে বস্‌লো, দেখো! ঐ যাঃ উড়ে গেল! দিদি! গ্রাবাজটা তোমার হাত থেকে কেমন খায়, আর আমি ধর্‌তে গেলে ও কিন্তু পালিয়ে যায়, কেন?—বাঃ! বাঃ! বেশ মজা হয়েছে, মুক্ষিটা বাবার কাছে উড়ে গেছে!"

বালক সুপ্রকাশ এইরূপে পক্ষীদের প্রীতি ভোজের আনন্দ আরও বর্দ্ধন করিতেছিল। দিদি মধ্যে মধ্যে হাসিমাখা কালো চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি তার দিকে ফিরাইয়া তার উৎসাহোৎফুল্ল মুখের মিষ্ট হাসি দেখিতেছিল, আবার কর্ত্তব্যপরায়ণা জননীর মত গম্ভীরমুখে নিবিষ্টচিত্তে পালিত সন্তানগুলিকে আহার্য্য প্রদান করিতেছিল।

রজনীনাথ ও তাঁর অতিথি নানা আলোচনায় গাঢ় নিমগ্ন চিত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর আলোচ্য বিষয়ের মীমাংসা হইয়া গেলে প্রবীণ অভ্যাগত নবীন গৃহস্বামীকে বলিলেন—"তা হ'লে এ মাস থেকেই ওটা আরম্ভ করা যাক্—কি বলো ?"

"হাঁ বৃথা সময় নষ্ট করে লাভ কি—এবার যেদিন কেউ আস্‌বে সেই দলিলখানা সঙ্গে করে আন্‌তে বলবেন—একবার দেখে নেওয়া দরকার।"

এই প্রবীণ লোকটি তাঁর অন্নদাতা লক্ষ্মীপুরের জমিদার সেই শ্যামাকান্ত চৌধুরী।

কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া রজনীনাথ সহসা ঈষৎ সঙ্কোচের সহিত ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওর খবর তো পাওয়া গেল না, সম্পত্তির একটা ব্যবস্থা করে রাখলে ভাল হতো।"

শ্যামাকান্ত অন্যমনস্কভাবে গোধূলির আরক্ত ও ধূসর বর্ণে মিশ্রিত পশ্চিমাকাশের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছিলেন, রজনীনাথের প্রশ্নে অকস্মাৎ যেন চমকিয়া উঠিলেন। তাঁর অকালবার্দ্ধক্য রেখাঙ্কিত ললাট আরও কুঞ্চিত হইল; দৃষ্টি ফিরাইয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া অস্ফুটস্বরে উত্তর দিলেন—"থাকগে!" রজনীনাথ আর কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন না, তাঁরও কণ্ঠমধ্য হইতে একটা ব্যথিত নিশ্বাস সন্তর্পণে বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যার নির্ম্মল আকাশে দুই একটি নক্ষত্র নববধূর সরম রাগজড়িত অর্দ্ধ নিমীলিত চাহনীর মত নীল ঘোমটার মাঝখান হইতে সুধীরে চাহিয়া দেখিতেছে, মর্ম্মর আসনের উপর বসিয়া ভাই বোনে ঊর্দ্ধে তাদের গণিতেছিল।

"আমি একটা বই দেখ্‌তে পাচ্ছি নে ?"

"ঐ যে আর একটা ঠিক ঝাউগাছের মাথায়, ঐ যে, খুব ছোট্ট!"

"কৈ দিদি? আমি দেখতে পাচ্ছি নে, কই?"

দিদি একটু বিষণ্ণ হইয়া বলিল—"তা' হলে আর কি হবে—বল তোমার আমার ক' চোখ?"

রজনীনাথের কানে হঠাৎ তাদের হাসির শব্দ বাজিয়া উঠিল; তিনি শব্দানুসরণ করিয়া মুখ ফিরাইলেন, ডাকিলেন—"শান্তি।"

"কি বাবা?" বলিয়া শান্তি ও সুপ্রকাশ হাত ধরাধরি করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

রজনীনাথ শান্তির দিকে চাহিয়া কহিলেন—"তোমার জ্যেঠামশায়কে প্রণাম করো, সুকু! তুমি করলে না?' প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলে শ্যামাকান্ত বালক বালিকার ললাটে চুম্বন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাঁর ক্লান্ত হৃদয় স্নেহরে পুতুল দুটিকে স্পর্শ করিয়া যেন অনেকটা সবল হইয়া উঠিল। রজনীনাথ তাহা বুঝিলেন।

শ্যামাকান্ত স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তাদের পানে চাহিয়া রজনীনাথকে কহিলেন—"এদের তো সেবারে এসে দেখি নি, কোথা গেছলো?"

"তখন ওরা এখানে ছিল না, শান্তির মায়ের অসুখের জন্য ওদের দার্জ্জিলিং পাঠিয়েছিলুম। শান্তি যখন ছোট, আপনি ওকে কতবারই তো দেখেছেন—মনে নেই, আপনার?"

শ্যামাকান্ত কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া ধীরে ধীরে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"মনে আছে বই কি! সেই সেবার বিলেত যা'বার কথা ওঠে—বিনোও আমার সঙ্গে ছিল, শান্তি তখন ছোট্টটী ছিল—সেও তো প্রায় চার বছর হতে গ্যাল!" শ্যামাকান্ত আবার একটা দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। রজনীনাথ ক্ষোভে নিরুত্তর রহিলেন। পুত্রহারা পিতার নিকট নিজেকে অপরাধী বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

শ্যামাকান্ত আত্মসংবরণ করিলেন। নিজের গভীর দুঃখের ঘনছায়া

অপরের মুখের আলো নষ্ট করিতেছে দেখিয়া ঈষৎ লজ্জিত হইলেন। শান্তি ও সুপ্রকাশ পিতার গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া বিস্ময়ের সহিত অপরিচিতকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। তাঁর প্রচুর শুভ্র কেশ, কুঞ্চিত ললাট, বিশাল দেহ, সুগৌর বর্ণ, শান্তির মনে জ্যেঠামহাশয় সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সংশয় উপস্থিত করে নাই; কিন্তু সুপ্রকাশ কিছু গোলে পড়িয়াছিল, কারণ ব্যাকুলার জ্যেঠামহাশয়ের মস্ত সাদা দাড়ি আছে, ইনি যদি জ্যেঠামহাশয়, তা হ'লে এঁর দাড়ি কোথা?

শ্যামাকান্ত সস্নেহে শান্তির হাত ধরিয়া টানিয়া কাছে বসাইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার পুরো নাম কি মা—শান্তিসুধা?"

শান্তি তার কাল চোখের তারা ভূমিলগ্ন করিয়া ধীরে ধীরে উত্তর দিল—"শান্তিলতা।"

"সত্যি তুমি শান্তিলতা! তোমার নামটি কি বাবা?" সুপ্রকাশ পিতার জানুর উপর কনুইয়ের ভর রাখিয়া তাঁর কোলের উপর শুইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তার চঞ্চল চোখের বিস্মিত দৃষ্টি বরাবরই অপরিচিতের প্রতি সংবদ্ধ ছিল। সে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া গম্ভীর মুখে উত্তর দিল— "শ্রীসুপ্রকাশচন্দ্র মৈত্র।"

"সুপ্রকাশ! বেশ নামতো! এসো আমার কাছে এসো।— শান্তিলতা! তুমি পড়তে জানো?"

শান্তি নীরবে পিতার দিকে চাহিল। রজনীনাথ এই মৌন আবেদন মঞ্জুর করিয়া বলিলেন—"ও মহাকালী পাঠশালায় পড়ে, তা ছাড়া বাড়ীতেও মাষ্টারমশায় ইংরেজি পড়ান। শান্তি সেদিন স্কুলে যে স্তবটা শিখেছ জ্যেঠামশায়কে শোনাও।"

শান্তি সঙ্কুচিতভাবে সুপ্রকাশের দিকে চাহিল, আবার পিতার দিকে ফিরিয়া বলিল—"সুকুও জানে বাবা, ও বলবে?"

শ্যামাকান্ত বলিলেন—"তোমরা দু'জনেই বলো।"

সুপ্রকাশ সমধিক গম্ভীর হইয়া দিদির পাশে আসিয়া দাঁড়াইল; শান্তির কণ্ঠের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া শ্লোক আবৃত্তি করিল। বলা শেষ হইলে বহুক্ষণ মুগ্ধ শ্রোতা ভাববিভোর হইয়া রহিলেন, তা'রপর সজল নেত্র রজনীনাথের মুখের উপর স্থাপন করিয়া বলিলেন—"পরের সুখে হিংসা করা উচিত নয়, আমি হিংসা করিনি, কিন্তু বাস্তবিক তুমি সুখী! আমার যদি এমন একটি মেয়েও থাক্‌তো!" শোকের অগ্নি যার বুকের মধ্যে অনির্ব্বাণ জ্বলিতেছে, সান্ত্বনা সে অনলে ইন্ধনস্বরূপই হইয়া উঠে! সবই যার অন্ধকার, তাকে এতটুকু আলো দেখাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা।

শ্যামাকান্ত বলিতে লাগিলেন—"সেই একজন হ'তেই আমি সব পেতে পারতাম। অকৃতজ্ঞ—আমার দিকে চাইলে না! বৃদ্ধ বয়সে আমায় একা ফেলে চলে গেলো!—যাক্, আমার যতদিন কর্ম্মভোগ আছে, যক্ষের ধন আগ্‌লাই, তা'রপর যে দিন ডাক আসবে, আমিও চলে যা'ব।" গভীর হইতে গভীরতর বেদনায় তাঁর ক্ষীণ স্বর ক্ষীণতর হইয়া আসিল। বহুক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তা'রপর শুষ্ক ওষ্ঠে একটু শুষ্ক হাসি আনিয়া কহিলেন—"শান্তিলতা! তুমি গল্প বল্‌তে পার মা? রাজার গল্প জানো? খ্যাঁকশিয়ালের গল্প জান?"

গল্পের কথায় সুপ্রকাশের উৎসাহ সমস্ত বাধা বিপত্তি কাটাইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া সাগ্রহে বলিয়া উঠিল—"দিদি রাজা—আর 'দো'-'সো' দু' রাণীর—আর বাঘের শেয়ালের গল্প সবই জানে—জ্যেঠামশায়! আমিও ঢেঁকি চিংড়ির পিঠে খাওয়ার গল্পটা বামুনদির কাছে শিখেছি।"

উভয়েই হাসিলেন। শ্যামাকান্ত বালকের সুগোল বাহু দুইটি ধারণ করিয়া তাহাকে কোলের উপর টানিয়া বসাইলেন।

"তুমি আর কি জানো স্নকু ?"

"আমি আর কিছু জানি নে, এখনও ছেলেমানুষ আছি কি না তাই বেশি কিছু শিখিনি। তুমি কিসের গল্প জান, জ্যেঠামশাই ? আমায় একটা বলবে ?"

শ্যামাকান্ত বিপন্ন হইলেন। পুরাকালের শ্রুত কাহিনী এক আধটা এখনও এই দীর্ণ জীর্ণ বিষয় বাসনা জর্জ্জরিত বক্ষের কোন এক প্রান্তে পড়িয়া আছে কি না এ পর্য্যন্ত সে সংবাদ লওয়ার প্রয়োজন তো ঘটিয়া উঠে নাই, উত্তর দিতে বিলম্ব হইল, বলিলেন—"আমি গল্প তো জানি নে বাবা, তোমরা আমায় শিখিয়ে দিও।"

এই মূঢ় বৃদ্ধটির প্রতি শান্তির অত্যন্ত করুণা হইল। প্রথম কোন্ গল্প দিয়া কার্য্যারম্ভ করিলে কৃপার্হ অনভিজ্ঞটির শিক্ষার সুবিধা হইবে সে তাই গম্ভীর মুখে ভাবিতে লাগিল।

স্নকু যদিও সর্ব্বপ্রথম শৃগালের-চাতুর্য্য কাহিনীটি শিক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু সকলের এক জিনিষ তো ভাল লাগে না। মুখ তুলিয়া উজ্জ্বল চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি তাঁর মুখে স্থাপন করিয়া প্রশ্ন করিল—"আপনি ফিঙ্গে পাখীর গল্প শুন্‌বেন ?"

শ্যামাকান্ত প্রলুব্ধভাবে উত্তর করিলেন—"হ্যাঁ মা, শুন্‌বো !"

জ্যেঠামহাশয় গল্প বলিতে অক্ষম শুনিয়া সুপ্রকাশ তাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া পিতার নিকট আশ্রয় লইয়াছিল।

যে কয়দিন বৈষয়িক কর্ম্মোপলক্ষে শ্যামাকান্ত চৌধুরীকে কলিকাতায় থাকিতে হইল, সেই কয়টী দিনে তাঁর ভাঁটা-পড়া জীবন-নদীতে যেন একটা বর্ষার বন্যা, একটা উচ্ছ্বাসের জোয়ার আসিয়াছিল।

বৈকালে কোর্ট হইতে ফিরিয়া লুব্ধচিত্তে দ্বারের দিকে চাহিয়া থাকিতেন—কতক্ষণে দুইগাছি সরু বালা-পরা দুখানি ক্ষুদ্র হাত সাবধানে

একখানি সাদা পাথরের রেকাবী বহন করিয়া আনিবে! মনে পড়িত—সেই কোন ছেলেবেলা স্কুল হইতে ফিরিয়া এমনি আগ্রহে খাবারের অপেক্ষা করিতেন! সেও এক স্নেহময়ী নারী ক্ষুধিত বালকের আহার্য্য আনিয়া এমনি স্নেহে কাছে বসিয়া খাওয়াইতেন—এমনি স্নেহে নিজের আঁচল দিয়া কপালের ঘাম মুছাইয়া দিতেন, এমনি আগ্রহে সারা দিবসের সংবাদ লইতেন। তা'রপর বালক শ্যামাকান্ত বড় হইলেন। নূতন লোক আসিল, জীবনে নূতন স্রোত বহিল—প্রভাত মধ্যাহ্নে পরিণত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির মত অন্তরে বাহিরে কি বিপুল পরিবর্ত্তনই না ঘটিয়া গিয়াছে; সে যে যুগ-যুগান্তরের কাহিনী!

কিন্তু আবার এই শ্যামা সন্ধ্যায় জীবনের অপরাহ্নে এ কি মায়ামন্ত্রে অতীত তার বিলীয়মান স্বপ্ন লইয়া ধীরে ধীরে মুদ্রিতপ্রায় হৃদয় প্রান্তে সোণালী আলোক জ্বালাইয়া তুলিতেছে? সারা মধ্যাহ্নের ধূলিরৌদ্রমাখা আশা নিরাশার অবিরত সংঘর্ষে ক্ষত বিক্ষত শ্রান্ত হৃদয়ে এ কি নূতন মোহ, নবীন আকাঙ্ক্ষা! অস্তোন্মুখ সূর্য্য যেমন আর একবার দাহকারী শক্তি সংবরণ করিয়া প্রভাত কিরণেরই মত স্নিগ্ধ নির্ম্মল আলোক প্রদান করিয়া যায়, তাঁর ভাগ্যও কি সেইরূপ আর একবার এই মরণ-নদীর কূলে আনিয়া শৈশবের সেই স্বপ্ন দেখাইতেছে নাকি? এ কি নিভিবার পূর্ব্বক্ষণে দীপ-শিখার ক্ষণিক হাসি? বিদ্যুতের চপল খেলা!

বৃদ্ধ শ্যামাকান্ত এই ক্ষুদ্র বালিকার মধ্যে তাঁর বহুদিনগত প্রৌঢ়া জননীর স্নেহময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেন, স্নেহপূর্ণ কালো চোখে, হাসি-ভরা রাঙা ঠোঁটে কোমল বাহুলতায় অপূর্ব্ব মাতৃস্নেহ অনুভব করিতেন। মনে মনে এই ক্ষুদ্র বালিকা জননীটিকে একটু শ্রদ্ধা করিতেন, প্রকাশ্যে তাকে একটু ভয়ও করিতেন। যখন সে গম্ভীর হইয়া তাঁকে খাওয়াইতে

বসিত ঈষৎ ভৎ´সনার সহিত অনুযোগ করিত—'জ্যেঠামশায়, তুমি কিছু খাচ্চো না!' তখন শ্যামাকান্তকে ক্ষুদ্র মায়ের মনোরঞ্জন জন্য আবার মাছের ঝোল আর অম্বলের বাটি টানিয়া দু'টি ভাত ভাঙ্গিতেই হইত, অন্ততঃ দুধের বাটিতে ভাত না তুলিলে রক্ষা থাকিত না। বৈকালে উদ্যানে সেই লৌহ বেঞ্চে দু'জনে আসিয়া বসিতেন, রজনীনাথ সেই সময় বৈষয়িক কাজকর্ম্মের কথা তুলিতে চেষ্টা পাইলে, শ্যামাকান্ত ব্যস্ত হইয়া বাধা দিতেন—"থামো রজনী! এখন আর ও সব নয়! এখন আমি আমার ছোট মা'র কাকাতুয়ার বুলি শুনবো, হরিণের খেলা আর পাখীদের নাচ দেখবো—কেমন না? মা-মণি!"

শান্তি বড় বড় চোখ দুটি মেলিয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণ আগ্রহে বলিয়া উঠিত —"হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই চলুন!"

পরিবর্ত্তনশীল জগতে প্রতি ব্যক্তি পলে পলে নিজেরও অজ্ঞাতে প্রতিদিন পরিবর্ত্তিত হইতেছে, কিন্তু সে পরিবর্ত্তন যখন সময়-সিন্ধুর ঘাত-প্রতিঘাতে মৃদু তালে সম্পন্ন না হইয়া প্রতিঘাতের নির্ম্মম আঘাতে এক মুহূর্ত্তে সম্পন্ন হইয়া যায়, তখনই শুধু লোকে সহজে সেটা উপলব্ধি করিতে পারে।

শ্যামাকান্ত চৌধুরীর উপর দিয়া যে ভীষণ ঝটিকা বহিয়া গিয়াছিল, তাঁহাকে উহা অন্তরে বাহিরে পরিবর্ত্তিত করিয়া সম্পূর্ণ নূতন মানুষে পরিণত করিয়াছিল। আজ আর সে বিষয়-তৃষ্ণা নাই! সে ঐশ্বর্য্য গৌরবও নাই! সংসার-সুখানুসন্ধিৎসু করুণার্হ ক্লান্তচিত্ত বৃদ্ধ অপরিতৃপ্ত শুষ্ক হৃদয়ের বিপুল তৃষ্ণা লইয়া একাকী হাহাকার করিতেছিলেন, রজনীনাথের কন্যা আজ তাঁর সেই স্নেহ-বিক্ষুব্ধ আর্ত্ত চিত্তের সমস্ত সুষুপ্ত আগ্রহ জাগাইয়া তুলিল।

সন্ধ্যায় যখন রজনীনাথ মক্কেল-বেষ্টিত হইয়া আইন-চর্চ্চায় ব্যস্ত থাকিতেন, তখন এই তিনটি প্রাণী মিলিয়া তাদের সমস্ত অভিজ্ঞতা

খরচ করিয়া সন্ধ্যাটীকে মধুরতর করিয়া তুলিত। বাঘের গল্পে, শিয়ালের গল্পে, রাখালের গল্পে তাদের আসরটি গম গম করিত—সরল প্রাণের নিরবচ্ছিন্ন উৎসারিত কলহাস্য পোষা পাখীর বুলির মত মিষ্ট কথা সংসার তাপ জর্জ্জরিত বৃদ্ধের মসীমলিন চিত্ত হইতে সমস্ত কালীর রেখা যেন নিঃশেষে মুছাইয়া দিত। তাদের সহিত তিনি যে হাসি হাসিতেন, তা' সত্যই তাঁর সেই শুষ্ক হৃদয় হইতে উৎসারিত হইয়া উঠিত। তার মধ্যে কোথাও একটু বিষাদের সুর ঝঙ্কার দিত না। শ্যামাকান্ত তাঁর আজীবনের গৃহবাসের সহিত তুলনায় এই পরগৃহবাসের দিন কয়টা বড় আনন্দেই যাপন করিতেছিলেন!

মেঘমুক্ত জ্যোৎস্নায় পাটিপাতা বিছানায় বসিয়া তিনটি বন্ধুতে গল্প চলিতেছিল। তখন তাদের রাখালের গল্প শেষ হইয়া আসিয়াছে, রাখাল তখন রাক্ষসী-বধূর কাপড় গহনায় সজ্জিত হইয়া বধূ-বেশে নিমন্ত্রিতদিগকে পরিবেশন করিতেছিল। বহুবার শ্রুত হইলেও গল্পটি সুপ্রকাশের বড়ই প্রিয়; সে রুদ্ধ নিশ্বাসে শুনিতেছিল। গল্প শেষে আজও আনন্দে করতালি দিয়া হাসিয়া উঠিল—"কেমন মজা হলো! জ্যেঠামশাই, বুড়িটা খুব জব্দ হয়ে গেছে না? যেমন দুষ্টু!"

শান্তি হাসিয়া বলিল—"জান, জ্যেঠামশায়! সুকু ভাবে গল্পগুলো যেন সত্যি! তা'ই রাখালের মত পিঠে-গাছ করবার জন্যে ও মাটিতে একটা পিঠে পুঁতে তা'তে রোজ জল দিত।"

শ্যামাকান্ত হাসিলেন। সুপ্রকাশ অপ্রতিভ হইল, কিন্তু হাস্যাস্পদ হওয়ায় রাগিয়াও গেল। বড় বড় চোখ বিস্তৃত করিয়া বলিল—"হ্যাঁ আমার বেলা! আর তুমি বুঝি সত্য ভাব না? হরিশ্চন্দ্র রাজার ছেলে মরে গেল, তুমি খুব কাঁদো নি? মা বল্লেন, গল্প শুনে কাঁদতে নেই, তবু বুঝি চুপ করে ছিলে?"

শান্তি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"আহা, রুহিদাস যে মরে গিছলো, মানুষ মরে গেলে কান্না পাবে না জ্যেঠামশায় ? তখন তো জানি নে' যে, সে আবার বাঁচবে।"

শ্যামাকান্ত বালিসের উপর ভর দিয়া উঠিয়া বসিলেন, প্রস্ফুট জ্যোৎস্নায় শান্তির মুখের দিকে চাহিলেন। মৃদুস্বরে কহিলেন—"মা ! পরের জন্যে কাঁদতে শেখো, সংসারে পরের কথা ভাবতে সবাই শেখে না মা !"

তিনি একটি সুগভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। শান্তি নিজের মনেই বলিয়া যাইতে লাগিল—"সুকু—জানো জ্যেঠামশাই, ছোট্ট-বেলায় চাঁদ ধরবার জন্যে কাঁদতো ! চাঁদকে 'আয় আয়' বলে' হাত নেড়ে ডাকতো ; আর চাঁদ যেই আসতো না, অমনি ও কেঁদে রেগে ভুঁয়ে শুয়ে পড়তো। ছোট-বেলায় সুকু বড্ড বোকা ছিল, মাটির হাতির মুণ্ড ভেঙ্গে খেয়েছিল, তা'ই বাবা ওকে মাটির পুতুল দিতে বারণ করে দিয়েছিলেন। কানাই কম্বল মুড়ি দিয়ে জুজুবুড়ি সেজে ওকে ভয় দেখাতো, আর ও চুপ করে দুধ খেয়ে নিতো, একটু কাঁদতো না। আমি কিন্তু ওরকম ভয় পেতাম না ! হ্যাঁ, জ্যেঠামশায়, জুজুবুড়ি বুঝি আবার থাকে ?"

সুপ্রকাশ অবিশ্বাসে মাথা দোলাইয়া সাগ্রহে বলিল—"আছে, জুজুবুড়ি আছে।—কল্‌কাতায় নেই—কিন্তু মোক্ষদার দেশের পুকুরে জুজুবুড়ি আছে—"

শান্তি তৎক্ষণাৎ তাহার নির্ব্বোধ ভাইটির ভুল সংশোধন করিয়া বলিয়া উঠিল—"তুই কি'যে বলিস ! সে তো জুজুবুড়ি নয়, সে তো জটে-বুড়ি।—হ্যাঁ জ্যেঠামশায়, তুমি জটেবুড়ি দেখেছো ? তা'দের পায় কি শেকল বাঁধা থাকে ? তা'রা ছেলেদের ধরে সেই শেকলে বেঁধে পুকুরের মধ্যে কি টেনে নিয়ে যায় ?"

শ্যামাকান্ত হাসিয়া বলিলেন—"না মা, আমি কেবল আকাশবুড়ি

দেখেছি ; আর আমাদের বাড়ী একজন বুড়ি ঝি আছে, তাকে দেখেছি, তা'ছাড়া অন্য কোন বুড়ির সঙ্গে আমার জানা নেই। হ্যাঁ, আর এই একটি ছোট্ট 'লতি-বুড়িকে' দেখছি। তোমার বাবা তোমায় মাঝে মাঝে 'লতি-বুড়ি' বলে ডাকেন না ?"

আকাশবুড়ি—যে চাঁদের মধ্যে বসে সুতো কাটে ? তাকে আমিও দেখেছি ! আবার এক একদিন সে তুলো পিঁজে আকাশময় ছড়িয়ে দেয় ? আচ্ছা—ও যে রোজ অত অত তুলোর সুতো তৈরি করে, সে সুতোগুলো কি হয় ?"

শ্যামাকান্ত একটু ভাবিয়া বলিলেন—"কাপড় হয়।"

"কাপড় কা'রা পরে ? দেবতারা বুঝি ? আচ্ছা নক্ষত্রগুলো কি চাঁদের ছেলে মেয়ে ? তবে সূর্য্যির কেন নক্ষত্র থাকে না ? বাবা বলেন, নক্ষত্রগুলো নাকি এক একটা পৃথিবী ! হ্যাঁ জ্যেঠামশায় ? তা হ'লে গরুড় চাঁদ থেকে কি করে সুধা চুরি করলে, সেই জন্যেই তো ইন্দ্রের সঙ্গে তা'র যুদ্ধ হলো ! আচ্ছা, জ্যেঠামশায়, অশ্বত্থামা, হনুমান আর বিভীষণ এখন কোথায় আছে ? তা'রা তো অমর ?"

শ্যামাকান্ত উত্তর খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না, কিন্তু তাঁর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই আবার প্রশ্ন উঠিল—"হ্যাঁ জ্যেঠামশায়, মহাভারতে সাত সমুদ্দুরের কথা আছে, সাত সমুদ্দুর কোথায় ? আচ্ছা ক্ষীর সাগরটা কি সত্যিকারের দুধের ক্ষীর ? সে জলে তা হ'লে জাহাজ চলে কি করে ? সেখানকার লোকেরা বুঝি ভাত রাঁধে না, খালি ক্ষীর খায় ?"

সুপ্রকাশ মুখ গম্ভীর করিয়া মত প্রকাশ করিল—"আর হয় তো পায়েস খায় ! ক্ষীর দিয়ে ভাত রাঁধলেই তো পায়েস হয়ে যা'বে। আমি বড় হ'লে সেই দেশে চাকরী কর্ত্তে যাবো ; দিদি, তুমিও ভাই আমার সঙ্গে যেও—কেমন ?"

এমন সময় সহাস্য মুখে রজনীনাথ আসিয়া দাঁড়াইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হচ্চে ?"

শান্তি ও সুপ্রকাশ সমস্বরে প্রশ্ন করিয়া উঠিল—"হ্যাঁ বাবা, ক্ষীর সমুদ্দুর কোন্ দেশে ? আমরা দেখবো, বাবা !"

রজনীনাথ বসিলেন। সুপ্রকাশ পিতার নিকট উঠিয়া আসিল। শান্তি শ্বশুরের কথায় ঈষৎ লজ্জিতা হইল। শ্যামাকান্ত চুপ করিয়া আছেন দেখিয়া রজনীনাথ তাঁর দিকে চাহিলেন—অল্প আলোকে তাঁর মুখ দেখিতে পাইলেন না, একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন—"আপনাদের আজ কিসের গল্প হচ্ছিল ? বাঘের না রাজার ?"

শ্যামাকান্ত ঈষৎ হাসিবার চেষ্টা করিয়া উত্তর দিলেন—"শুধু গল্প ? আমাদের দর্শন বিজ্ঞান কত কি আলোচনা হয়, তোমার তো আইন বই কিছুই জোটে না। মোদ্দা তোমার কাজটা যত সহজ মনে হ'ত দেখচি তা নয়। বাইরে থেকে দেখতে বেশ, খাটতে হয়।"

"সহজ ?—অতি কঠিন কাজ, এখন তো এক রকম দাঁড়িয়ে গেছে। আইন টাইনগুলোও অনেকটা দুরস্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে, মক্কেলগুলোকেও চিনে ফেলা গেছে,—প্রথম প্রথম কোর্টের ব্যাপার দেখে, বড় বড় বক্তৃতা শুনে, মহা মহা বাগ্মীদের মধ্যে দাঁড়িয়ে টিম টিম করে দুটো কথা বলতে গিয়ে এক গা ঘেমে উঠে ফিট হবার জোগাড় হ'ত, সে এক দুর্দ্দশার কালই গেছে !"

"প্রথমে ধৈর্য্য না রাখলে, শেষে সুবিধা হ'বে কেন ? সে সব কাজেই—"

"নিশ্চয়ই। আবার একটু উন্নতি হ'তে আরম্ভ হ'লে কেমন একটা উৎ-সাহ আপনি জম্মাতে থাকে, সঙ্কোচ কাটতে আরম্ভ হয়, ঝোঁক পড়ে আসে।

শান্তি চলিয়া গেলে শ্যামাকান্ত একটা প্রচণ্ড শ্বাসকে নিরোধ করার চেষ্টা করিয়া ডাকিলেন—"রজনী—"

"আজ্ঞে"—বলিয়া রজনীনাথ উৎসুক হইয়া রহিলেন, শ্যামাকান্ত কহিলেন—"একটি ভিক্ষা আছে!"

রজনীনাথ চকিতে বাধা দিলেন—জোড়হাতে কহিলেন—"অপরাধী করবেন না, আদেশ করুন, রজনী তা'র অন্নদাতার আদেশ পালনে কুণ্ঠিত হ'বে না।"

"অনেক করছো, আর একটি উপকার কর—শান্তির তুমি কিছু দিন বিয়ে দিও না।"

রজনীনাথ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। শ্যামাকান্ত আবার মৃদু স্বরে কহিলেন—"সে আমার কাছে ফিরে আসবে—এ আশা এখনও আমার যায় নি। যদি আসে, যদি তা'কে ফিরে পাই, তা'হলে তোমার শান্তিকে যদি চাই, আমায় দিও।" এ প্রার্থনার অসঙ্গতি দেখাইয়া আহতকে পুনরাহত করিতে রজনীনাথের ক্লেশ বোধ হইল, শুধু বলিলেন—"ঈশ্বর সে দিন যদি দেন, শান্তি আপনার বৌ হবে—সে ওর ভাগ্য! আমি ওর বিয়ের কথা এখনও ভাবিইনি, ও সবে এই দশ বছরের।"

শ্যামাকান্ত কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাঁর পানে চাহিলেন—কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই একটা গভীর হতাশায় হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। হায়! তাঁর হারান রতন কি আর তিনি খুঁজিয়া পাইবেন? যদিই বা বনবাসী রামচন্দ্র কোন দিন ঘরে ফিরিয়া আসে, দুর্ভাগ্য দশরথ কি তখনও বাঁচিয়া থাকিবে?

যে দিন কলিকাতা হইতে শ্যামাকান্ত লক্ষ্মীপুরে ফিরিয়া আসিলেন, সে দিন আবার নূতন করিয়া তিনি যেন পুত্রশোক অনুভব করিতে লাগিলেন। দেওয়ানের সহিত বৈষয়িক কার্য্যালোচনার পর যখন তিনি জাজিম পাড়া বিছানা ছাড়িয়া বাহিরের বাতাসে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন সবে মাত্র সন্ধ্যার ধূসর আকাশে বাজারে বিক্রি কুমড়ার ফালিটুকুর মত ক্ষীণ অর্দ্ধচন্দ্র দেখা দিয়াছে। গন্ধরাজ ফুলের গাছ হইতে অজস্র গন্ধ উত্থিত হইয়া চারিধার সুরভিময় করিয়া তুলিয়াছিল। গাছভরা ফুটন্ত শাদা ফুলের মত আকাশভরা নক্ষত্রগুলা ঝিকমিক করিয়া জ্বলিতেছিল।

শ্যামাকান্ত ধীরে ধীরে সোপানের উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন। পুষ্পগন্ধভরা সন্ধ্যার বাতাস তাঁর চিন্তারেখাঙ্কিত ঘর্ম্মাক্ত ললাট স্পর্শ করিয়া ঈষৎ শীতল করিয়া দিল। সোপান পার্শ্বস্থ শেফালি বৃক্ষ হইতে টুপটাপ করিয়া কয়েকটা ফুল বৃক্ষতলে খসিয়া পড়িল, ক্ষীণ চন্দ্র একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। শ্যামাকান্তের মনে হইল, যেন সেই স্নিগ্ধ স্পর্শ শান্তির হাতের, সেই মিষ্ট গন্ধ শান্তির অঙ্গের, সেই উজ্জ্বলতা—সেও শান্তির নেত্রেরই! ভাবিতেই সেই মৃদু স্নিগ্ধ স্পর্শ তাঁর সমস্ত শরীরকে কণ্টকিত করিয়া তুলিল। সেই অস্বস্তি দেহে মনে বহুক্ষণ অনুভব করিবার লোভে সেইখানে বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

বাটীর দেবালয়ে সন্ধ্যারতির কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। অনতিদূরস্থ নদী সেই একঘেয়ে কলধ্বনিতেই বহিয়া যাইতে লাগিল, কল্পনা-বিহ্বল বৃদ্ধের কর্ণে সেই চিরপরিচিত শব্দ যেন আজ অন্যরূপ শুনাইতেছিল। জাগ্রত স্বপ্নবিভোর চিত্তে দুইটি প্রীতিকোমল বাহুস্পর্শ সর্ব্বাঙ্গে অনুভব করিতে করিতে তার মধুর কণ্ঠের অস্ফুট কলকাকলী তিনি যেন শুনিতে লাগিলেন। সেই আগড়ম বাগড়ম ছাই-পাঁশ, যাহা তাঁর মুগ্ধচিত্তে

বেদ-বেদান্ত শ্রুতিস্মৃতির অপেক্ষাও মূল্যবান মনে হইত, সেই সকল শুনিতে শুনিতে সর্ব্বশরীর পুনঃ পুনঃ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতে লাগিল। শ্যামাকান্ত বহুক্ষণ কল্পনাস্বর্গে স্তব্ধ-স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। একবার হস্তদ্বারা বুকটা চাপিয়া ধরিলেন—কল্পনায় বুকের উপর শান্তির ছোট্ট সুন্দর মুখখানা পূর্ব্বের মত যেমন চাপিয়া ধরিতে গেলেন, অমনি স্বপ্ন টুটিয়া গেল—কল্পনার ইন্দ্রজাল ফুরাইল!

শ্যামাকান্ত চমকিয়া চারিদিকে চাহিলেন—কই। কে' কোথায়? কেহ নাই—কেহ নাই! বাতাসে মাথা দুলাইয়া গাছগুলা বিদ্রূপচ্ছলে হাসিয়া উঠিল, প্রতারক বায়ু তীব্র ব্যঙ্গস্বরে হাসিয়া হাসিয়া বলিতে লাগিল—'কেহ নাই! কেহ নাই!' ব্যাকুল হইয়া আকাশের চাঁদের দিকে চাহিলেন, খণ্ডচন্দ্র যেন উহাদের কথারই পোষকতা করিয়া বলিল—'কেহ নাই! কেহ নাই!'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শ্যামাকান্ত উভয় জানুর মধ্যে অবসন্ন মস্তক রক্ষা করিলেন! সত্য—এত বড় পৃথিবীতে তাঁর জন্য কোথাও কেহ নাই! এত বড় জগতের মধ্যে তিনি একেবারে একা—অসহায়, নিঃস্ব!

কি লজ্জা! এই সুবিস্তৃত অসীম নীলাকাশ, এই সুবর্ণোজ্জ্বল চন্দ্রমা, এই অগণ্য নক্ষত্র, এই সমুন্নতশীর্ষ বৃক্ষশ্রেণী, এই ফুলেভরা গন্ধামোদিত তরুলতা, এই ইতস্ততঃ-সঞ্চারী গর্ব্বিত পবন, সকলেই যেন তাঁর দিকে দয়ার্দ্র নেত্রে চাহিয়া দেখিতেছে, সকলেই যেন তাঁর নিঃসঙ্গ অসহায় অবস্থায় সঙ্গদান করিতে ব্যগ্র হইয়া অনুগৃহীত করিতে চাহিতেছে, সকলেই যেন তাঁর অন্তরের দৈন্য বুঝিয়া ব্যথিত ভাবে সান্ত্বনা বর্ষণ করিতেছে। ওরে নিষ্ঠুর বিনোদ! দেখিয়া যা! তুই তোর বাপের কি শোচনীয় অবস্থা করিয়া গিয়াছিস্, একবার দেখিয়া যা, রে! শুধু তোর জন্য সে আজ জড় প্রকৃতির নিকটেও দয়ার পাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আয়! আয়! দেখিয়া যা! শুধু তোরই জন্য রে—শুধু তোরই জন্য আজ তার শূন্য বুকে কি হাহাকার!

সে রাত্রে শ্যামাকান্ত নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। যেমন ঘুম আসে, অমনই কানের মধ্যে সঙ্গীতের সুরে বাজিয়া উঠে—"জ্যেঠামশায়!" অনেক-বার তিনি চমকিয়া—"কেন মা?" বলিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়াছেন, অনেকবার ব্যাকুল নেত্রে চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়াছেন, অবশেষে বিছানার মধ্যে থাকা অসহ্য হওয়ায়, উঠিয়া জানালার নিকট কৌচখানায় বসিয়া পড়িলেন। নীচেই পুষ্পোদ্যান, তা'র পর জ্যোৎস্নালোকে উজ্জ্বল নদীর জল। জ্যোৎস্না রাত্রে ঘুমন্ত নদীবক্ষ আলোড়িত করিয়া ছোট ডিঙ্গি বাহিয়া ধীবরেরা মাছ ধরিতে চলিয়াছে। তীরে দু একখানা বালী চূণ বোঝাই মগাজনী নৌকা বাঁধা, তাদের কোন একখানা হইতে বিনিদ্র মাঝির চট্টগ্রামী সুরের গান ভাসিয়া আসিতেছে আর কোন সাড়া নাই।

পুত্র কন্যা আরও জন্মিয়াছিল, সকলেই শৈশবে চলিয়া গিয়াছে, বহু বৎসর তাদের কথা বড় একটা মনেও আনিতেন না, সবার মুখও বোধ করি স্মরণ নাই, আজ আবার তাদের মনে পড়িতে লাগিল! যদি আজ একজনও বাঁচিয়া থাকিত, তা হইলে হয় তো তিনি এই স্তব্ধ মধ্য-রাত্রে নিদ্রাহীন চক্ষে বসিয়া পরের মেয়ের জন্য ব্যাকুল হইতেন না! তাহা হইলে এই শূন্য বুকের মধ্যে একটাও অবলম্বন থাকিত! সেই মেয়েটি—যে সবে তিন মাসের হইয়াছিল, বিনোদের মত চোখ-দুটি, শান্তির মত সুন্দর বর্ণ—সে থাকিলে বোধ করি এ মুখখানা বুকের মধ্যে এত জোর করিয়া বসিতে পারিত না! তাহা হইলে হয় তো তিনি তার ছোট্ট হাত দুইখানি তেমন করিয়া বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া স্বস্তি বোধ করিতেন না! না, না, তাহা হইলে পরের মেয়ে শান্তি বুকের মধ্যে এ নূতন আগুন জ্বালিতে পারিত না।

শ্যামাকান্ত জোর করিয়া উঠিয়া বসিলেন—"যখন তা'কে ছেড়ে বেঁচে আছি, তখন আর কেন? কিসের মায়া?"

এই যুক্তিকে স্থির করিয়া লইয়া শয্যায় পড়িয়া প্রাণ-পণে চক্ষু মুদিলেন—বুঝি চোখ চাহিলে প্রতিজ্ঞা রক্ষা কঠিন হইবে—কিন্তু এ কি! আবার সেই কণ্ঠ কানের কাছে মধুর স্বরে বাজিয়া উঠে—"জ্যেঠামশাই!"

শ্যামাকান্তের মুদ্রিত চক্ষের সম্মুখে সেই মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিল। মায়াবিনী যেন দুই কোমল বাহুদ্বারা তাঁর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া মুখের কাছে প্রফুল্ল পদ্মের মত মুখ আনিয়া বীণাস্বরে ডাকিল—"জ্যেঠামশাই!"

প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল না। সবেগে উঠিয়া বসিলেন, রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন—"হরি! এ কি মায়ায় আবদ্ধ করলে, দয়াময়? মাগো জগদম্বে! আমায় নিয়ে কি খেলা খেলছিস্ মা!"

তখন প্রভাত হইতে বিলম্ব ছিল না। পাণ্ডুবর্ণে খণ্ডিত চন্দ্র অস্ত যাইতেছিল, নদীর ছায়ানিবিড় বক্ষে খেয়া-নৌকা আরোহী পার করিতেছিল, জোয়ারের মুখে মহাজনী নৌকার মাঝি গান গাহিয়া নৌকা খুলিয়াছিল, "পাঁচপীরের সিন্নী দেবা বদর বদর—"

গৃহ-বিগ্রহ শ্যামসুন্দরের পুরোহিত হরিনারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রাতঃস্নান সারিয়া সাজি হস্তে পুষ্পচয়ন করিতে করিতে মৃদুস্বরে গাহিতেছিলেন—

"সকলই তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি,—
তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা; লোকে বলে করি আমি।"

ভক্ত শ্যামাকান্ত মুগ্ধচিত্তে দৈববাণীর মত সেই প্রভাত-সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে উচ্ছ্বসিতভাবে বলিয়া উঠিলেন—"ঠিক কথা! মাগো! আমি কে? আমি কি করতে পারি? আমার সাধ্য কি—তারা! তোর খেলা তুইই খেলাচ্ছিস—আমি খেলে যাচ্চি! তবে খেলা মা! আরও কি খেলা খেলাবি, খেলা!

সন্ধ্যার ধূসর ছায়া আসে পাশে লুকাইয়া ফিরিতেছিল। মন্দিরের পাষাণ-চত্বর ও নাটমন্দির আলোকাকীর্ণ! দেওয়ালগিরি ও ঝাড়ের আলোকে আলোকিত, পুষ্পমাল্যে সুরভিত, ধূপধুনার গন্ধে আমোদিত, নহবতের কল্যাণময় সুমিষ্ট রাগিণীতে পরিপূর্ণ; সব জড়াইয়া দেবভূমি স্বর্গভূমির মতই প্রতীয়মান হইতেছে! দালানের প্রত্যেক থিলানে, থিলানে, প্রতি প্রস্তরখণ্ডের গাত্রে, গাত্রে, মন্দিরের দ্বারে দ্বারে বিবিধ বর্ণের পুষ্পমাল্য বাতাসে দুলিতেছে। ফুলের গন্ধের সহিত ধূনা গুগ্‌গুল-মিশ্রিত একটা স্নিগ্ধ পবিত্র গন্ধ উঠিয়া চারিদিকের ভক্তজনের মনে প্রাণে কি এক অপূর্ব্ব আনন্দ সঞ্চারিত করিতেছে।

দর্শনার্থীরা মন্দিরের মুক্তদ্বারের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। প্রতি-দিন যাহারা দর্শন করিতে আইসে, তাহারাও নূতন দর্শনার্থিগণের মত আগ্রহান্বিত! দেবদর্শনে বিলম্ব করিতে কেহই প্রস্তুত নয়, সেজন্য মন্দিরদ্বারের জনতার মধ্যে ধাক্কাধাক্কি, সোর-গোল পড়িয়া গেল। দ্বারের একপার্শ্বে একজন প্রৌঢ়ার হাত ধরিয়া একটি তরুণী দাঁড়াইয়াছিল! জনতা বাড়িতেছে দেখিয়া তাহারা দ্বারসান্নিধ্য ছাড়িয়া সরিয়া গেল। প্রৌঢ়া দক্ষিণহস্তে সঙ্গিনীর বাম হস্ত দৃঢ় করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে, জনতারণ্য ভেদ করিয়া দুজনে প্রকাণ্ড দালানের একপ্রান্তে গিয়া দাঁড়াইল। ইচ্ছা ভিড় কমিলে দেবদর্শন করিবে। আরতি আরম্ভ হইল, রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি ভক্তের আরাধনায় যেন সজীব হইয়া তাহাদের প্রতি চাহিয়া যেন হাসিতে লাগিলেন! লোকের ভিড় কমিয়া আসিলে নারী দুজন মন্দিরদ্বারে

ফিরিয়া আসিল। প্রৌঢ়া সঙ্গিনীর হাত ছাড়িয়া গললগ্নবস্ত্রে চৌকাটের উপর সুদীর্ঘ প্রণাম করিল, কিন্তু তার সঙ্গিনী পলকহীন নেত্রে দেবপ্রতিমার দিকে চাহিয়া দেবপ্রতিমারই মত শুদ্ধ স্থির হইয়া রহিল। আরতি তখন শেষ হইয়া গিয়াছে, আরতি প্রদীপ নির্ব্বাপিত, শঙ্খ ঘণ্টার মঙ্গলবাদ্য থামিয়াছে, দেব-সেবকগণ ব্যস্তভাবে মন্দির সংস্কার করিয়া প্রস্থানোদ্যম করিতেছিল। অপর্য্যাপ্ত পুষ্পমাল্য বিভূষণের মধ্য হইতে দেবতা সহাস্য করুণদৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন, আর দ্বারে মলিনবসনা বিষাদিনী নারী স্থির নেত্র তাঁর মুখে স্থাপিত করিয়া নীরব নিথর। চারিদিকে জয়ধ্বনি ও বন্দনা গানের মধ্যে তার ভাষাহীন নীরব প্রার্থনা কোথায় যেন ডুবিয়া গিয়াছিল, তার দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধর একবারও কম্পিত হয় নাই, তার নীরব কামনা নীরবেই কি সর্ব্বান্তর্য্যামীর পদতলে পৌঁছাইতেছিল না? অথবা এ জগতে এই বয়সেই সকল কামনাই কি তার ফুরাইয়া গিয়াছে, কিছুই কি চাহিবার নাই?—কে' জানে!

একে একে আলোক নির্ব্বাপিত হইতে লাগিল, দর্শনার্থিগণ চলিয়া যাইতে লাগিল দেখিয়া প্রৌঢ়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তরুণী তবু নড়িল না, অঞ্জলিবদ্ধ করে স্থির চক্ষে চাহিয়া রহিল। সঙ্গিনী বলিল—"রাত হ'লো যে শিবু! পেরণাম করে নাও না, মা!"

ধ্যানমগ্না শিবানীর ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। একবার পূর্ণদৃষ্টিতে যুগল-মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া সে গলায় আঁচল দিয়া প্রণতা হইল। পূজারী ঠাকুর দুইখানি চন্দনচর্চ্চিত তুলসী পত্র ও কিছু প্রসাদ তাদের হাতে দিয়া প্রণামী কুড়াইয়া লইলেন। মর্ম্মরমণ্ডিত বহির্চত্বরে তখনও বড় ধূম।—সেখানে আলোক অনির্ব্বাপিত, পুষ্প অম্লান ও কোলাহল অপ্রতিহত। বড় বড় ওস্তাদ বাঁয়াতবলায় চাঁটি দিয়া মিঠে কড়া আওয়াজ বাহির করিয়াছেন, তানপুরায় বাঁয়াতবলায় ঝঙ্কার উঠিয়াছে, সুশিক্ষিত কণ্ঠ হইতে

—"নন্দ নন্দন যশোদা কুয়ঁার, বংশীবটতটচারী"—গানও গীত হইতেছে। উহারা পাশ কাটাইয়া বাহিরে আসিল।

পথে কেহ কোন কথা কহিল না। বৃন্দাবনের রাজপথ তখনও জনাকীর্ণ। উভয় পার্শ্বস্থ ঠাকুর বাড়ীর মধ্যে কয়েকটিতে আরতির বাদ্য তখনও থামে নাই। কোথাও সংকীর্ত্তনের করতালধ্বনির সহিত বহুকণ্ঠ মিলিত সঙ্গীত দূর হইতে বায়ুস্রোতে ভাসিয়া আসিতেছে, কোথাও পানোল্লাসিত মাতালের চীৎকার পথিকদিগকে সহসা চকিত করিতেছে।

বড় রাস্তা ছাড়াইয়া গলির মধ্যে মাতঙ্গিনী ও শিবানীর কাছাকাছি বাসা। ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকে গলির খানিক দূর পর্য্যন্ত একধারের বাড়ী-গুলির ছায়া পড়িয়াছিল। রুদ্ধদ্বার কৃষ্ণবর্ণ পুরাতন বাড়ীগুলা অপরিস্ফুট ক্ষীণ আলোকে ক্ষুদ্র পর্ব্বত-শ্রেণীর মত দুই পার্শ্বে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। মনুষ্য-বাসের চিহ্ন মিলে না এত নিস্তব্ধ! মাতঙ্গিনী শিবানীকে বাড়ী পৌছাইয়া দিয়া নিজের ঘরে গেল।

নীচের ঘরে মা'র কাছে খোকা ঘুমাইয়াছিল। সিদ্ধেশ্বরী বসিয়া বসিয়া পাখার বাতাস দিতেছিলেন। শিবানী সন্তর্পণে শিশুকে উপরে লইয়া গেল। তাহাকে শয্যায় শোয়াইয়া পুনরায় নীচে আসিলে, সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন—"দুটো মুড়ি নিয়ে খা'না, গাছের বেশ ঝাল ঝাল লঙ্কা আছে।"

শিবানী মায়ের মসারিটা বাতাস দিয়া ফেলিতে ফেলিতে সংক্ষেপে কহিল—"না, মা!"

"ঐ তো তোর রোগ, ঐ জন্যেই তো রোগে ধরে! তেল নুন মেখে নে' দেখি, আলস্ নি বাপু, কথা শোন্!"

শিবানী কথা কহিল না, ঘাড় নাড়িল—"না।"

সিদ্ধেশ্বরী কন্যার অবাধ্যতায় রাগিয়া গেলেন, কিন্তু রাগ হইলেও

সময় বিশেষে এখন একটু আত্মসংযম করিবার চেষ্টা করিতেন, বলিলেন—"নিত্যি নিত্যি রাত-উপোসি থাকিস্ নি, মা! কচি ছেলের মা, এতে ছেলের অকল্যাণ হয়। লক্ষ্মি মা আমার! কথা শোন্।"

শিবানী এ বিষয়ে সাধারণতঃ মার আজ্ঞা পালন করে না, কিন্তু তাঁর অনুরোধ সে এড়াইতে পারিল না। আহার্য্য লইয়া বলিল—"উপরে যাই, খোকা যদি কাঁদে।"

সিদ্ধেশ্বরী কহিলেন—"তা' যা, কিন্তু মুড়ি ক'টা খেয়ে ফেলিস্, ফেলে রাখিস্ নে।"

ক্ষুদ্র কক্ষের এক পার্শ্বে ক্ষুদ্র শিশু অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। এক পার্শ্বে মৃন্ময় প্রদীপ তৈল অভাবে নির্ব্বাণোন্মুখ। শিবানী ঘরে ঢুকিয়া প্রথমে শিশুর নিকট গেল। তার সুপ্ত স্থির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সরিয়া আসিল।

নির্ব্বাপিতপ্রায় দীপের ক্ষীণ প্রাণটুকু বারকয়েক শেষ ঔজ্জ্বল্য দেখাইয়া চির অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। শিবানী দাঁড়াইয়া দীপশিখার সেই অকাল-মৃত্যু সন্দর্শন করিল, বাধা দিল না—রক্ষা করিল না! শেষ অগ্নিকণিকা অদৃশ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পলকহীন চক্ষে চাহিয়া রহিল। জানালা খোলাই ছিল, ক্ষীণ জ্যোৎস্না ও মৃদু বাতাস ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। জানালার নিকট আসিতেই নদীতীরস্থ বকুল গাছের পুষ্পখচিত একটা শাখা নাড়া দিয়া সুরভি ছড়াইয়া বাতাস ছুটিয়া আসিল। বাতাসে আন্দোলিত শাখা হইতে কয়েকটা শুষ্ক পত্র সর সর করিয়া খসিয়া পড়িল। যমুনার স্থির জলে নক্ষত্রের ছায়া ঈষৎ তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল।

মুড়ির ডালা এক পার্শ্বে রাখিয়া অঞ্চলে স্বেদসিক্ত ললাট মুছিয়া শিবানী জানালার নিকট বসিল। এমন সে প্রতিদিনই বসে। ঘরে অন্ধকার, বাহিরে অন্ধকার, নদীবক্ষেও অন্ধকার, ওপারে অন্ধকার আরও

নিবিড়তর, ঘনবিন্যস্ত বৃক্ষশ্রেণী সেই সুনিবিড় অন্ধকারের মধ্যে দুর্ভেদ্য দুর্গপ্রাকারের মতই সুদূর বিস্তৃত ! দুই একটা তালগাছ সেই বৃক্ষপ্রাকারের মধ্য হইতে অন্ধকারময় সুদীর্ঘ মস্তক ঊর্দ্ধে উত্তোলন পূর্ব্বক স্তব্ধ হইয়া আছে। মনে হয়, বুঝি কোন প্রেতলোকের প্রাণী, বুঝি ঐ অন্ধকার রাজ্যের অন্ধতমসাবৃত দুর্গের অজেয় প্রহরী।

প্রখর গ্রীষ্মতাপে ও ইংরাজ রাজের খালের কৃপায় চঞ্চলগতি-শালিনী নির্ম্মলসলিলা যমুনা শুখাইয়া গিয়াছে। তার যৌবন মাধুরী, ললিত-দেহলতা যেন বার্দ্ধক্যের অবসাদময় জরায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এখন তার সেই স্বচ্ছশীতলা কূল বিপ্লাবিতা হাস্য লাস্য কৌতুকময়ী নবীনা মূর্ত্তি আর নাই। যৌবনের সে লীলা-চঞ্চল গতি, অবিরাম কল কল হাস্যস্রোত, সে অকারণে হাসিয়া হাসিয়া ছল ছল করিয়া বৃন্দাবনের তটপ্রান্তে শ্যাম-পদরজে লুটি-পাটি খাওয়া গিয়াছে ! শীর্ণাঙ্গী সশঙ্কিতা চিন্তামগ্না প্রবীণা উভয় বালুকাতীরের মধ্যে সশঙ্কে প্রবহমানা ! অন্ধকার রাত্রে দূরের জলরেখা স্থানে স্থানে নক্ষত্র-ছায়ালোকপাতে ঈষন্মাত্র উজ্জ্বল, মৃদুমন্দ পবনে ঈষন্মাত্র স্পন্দিত, নতুবা নদীর বালুতীর হইতে পরপারে লতাগুল্ম-সমাকীর্ণ ঘন শাখাপল্লব-সমাবৃত বনাকীর্ণ তটপ্রান্ত অবধি যেন একখানা কৃষ্ণবর্ণ শাড়ী বিছানো আছে মনে হইতে পারিত। শিবানী সেই অন্ধকারের দিকে নির্ণিমেষে চাহিয়া রহিল।

কৃষ্ণা চতুর্থীর ক্ষীণ জ্যোৎস্না ডুবিয়া গিয়াছে, যে মেঘ ঈশানের কোণে পড়িয়াছিল, সে দ্রুত অগ্রসর হইয়া অর্দ্ধ আকাশ জুড়িয়া বসিল। জরীর কাজ করা কালো আঙ্গিয়া ও নীলাম্বরী শাড়ি পরিলে কৃষ্ণাঙ্গিনীকে যেমন মানায়, প্রকৃতি ঠাকুরাণীকেও তেমনি দেখাইতেছিল। গ্রীষ্মের মৃদু বাতাস এতক্ষণ রহিয়া রহিয়া থামিয়া থামিয়া, যেন মুমূর্ষুর শেষ নিশ্বাসের মত অত্যন্ত ধীরে ধীরে বহিতেছিল। সেইটুকুও থামিয়া গিয়া গুমট হইয়া উঠিল।

শিবানী বসিয়া রহিল। এই যে চারিদিকে বিরাট বিশ্বব্যাপী গাঢ় অন্ধকার, ইহার কি কোথাও সীমা পাওয়া যায় না? এই যে আকাশে বাতাসে, জলে, স্থলে, দ্যুলোকে, ভূলোকে—ভাষাহীন, শব্দহীন অনন্ত নীরবতা ব্যাপিয়া রহিয়াছে, এরও কি শেষ নাই?

অন্ধকার! তার প্রাণের মধ্যে এর চেয়ে কি কম অন্ধকার? ঐ তো ও পারের বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে কতগুলি জোনাকি সুন্দরীর কৃষ্ণকেশে হীরার ফুলের মত ঝকিয়া উঠিতেছে, ঐ তো আকাশের এক প্রান্তে দু একটি নক্ষত্র চলন্ত মেঘের অন্তরাল হইতে চিকমিক করিতেছে, কিন্তু ঐ ক্ষুদ্র নক্ষত্রের মত, ক্ষুদ্র জোনাকির মত আলোক রশ্মিও তো তার আশা-হীন সান্ত্বনাহীন অন্ধকার হৃদয়প্রান্তে স্থান পায় না। তাই না সে নিজের অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে ডুবিয়া বাহিরের দুর্ভেদ্য অন্ধকারেরই পানে চাহিয়া থাকিতে ভালবাসে। এ ক্ষণিক অন্ধকার তার অসীম অশেষ অন্ধকারের মধ্যে এক হইয়া যায়। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি আসিয়া যথা নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সমাপন করে, তার অন্তরে যে কালরাত্রি আসিয়াছে, সে তো পোহাইল না! কবে পোহাইবে? এ জীবনে কখনও কি পোহাইবে?

তার নিবিড়-কৃষ্ণ চোখের ঘন কালো তারা দুইটার মধ্য হইতে আগুন ঠিকরিয়া পড়িল। বুকখানা অন্তর্গূঢ় উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত যমুনার মত ফুলিতে লাগিল! বাহিরে, ভিতরে সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া অন্ধকারের সীমা নাই, যেন সব একাকার করিয়া চন্দ্র সূর্য্য ডুবাইয়া দিয়া, অভেদ্য অচ্ছেদ্য ভীম অন্ধকার ব্রহ্মাণ্ডটাকে আপনার বিরাট উদর গহ্বরে ভরিয়া রাখিয়াছে। এই প্রলয় সমাধির মধ্যে সে যেন একা জাগিয়া আছে, একা বাঁচিয়া আছে, কোথাও যেন কোন প্রাণী নাই। সে—শুধু যেন কার একটি ব্যগ্র আহ্বান শুনিবার আশায় এই মহাপ্রলয়ের মধ্যে উৎসুক চিত্তভার বহিয়া

মরণ-নদীর উপকূলে প্রতীক্ষা করিতেছে! সেখানের আহ্বান আসিলেই সে যেন সেই অনির্দ্দিষ্ট মহা পথে ভীমা রজনীর অদৃশ্য বৃত্তরেখা ভেদ করিয়া যাত্রারম্ভ করিবে, এবং সে মহা যাত্রারও যে শেষ কোথায় কে বলিতে পারে?

বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল। চক্ষের উপর হইতে বিদ্যুতালোক নিবারণ করিয়া সে মুখ ফিরাইল। পরপারে স্তব্ধ বিটপীর মধ্যে তালবৃক্ষশ্রেণী এতক্ষণ নিশ্চল নীরব ছিল, যেমন কোথা হইতে দুরন্ত শিশুর মত উন্মত্ত পবন চট্‌পট্‌ শব্দে লতাগুল্ম ছিঁড়িয়া উপড়াইয়া রাশি রাশি ধূলি জঞ্জাল উড়াইয়া ছুটিয়া আসিল, অমনি তারাও যেন ঘোর অট্টরোলে তাদের ঝাঁকড়া চুলে ভরা প্রকাণ্ড মাথা নাড়িয়া অভ্যর্থনা করিয়া লইল। সেই বিরাট উৎসবে জল-স্থল দ্যুলোক-ভূলোক এককালে শিহরিয়া জাগিয়া উঠিল। তারপর অকালজাগরিতা প্রকৃতির সঙ্গে যোগ দিয়া সমস্ত পৃথিবীকে লণ্ডভণ্ড করিয়া উন্মত্ত পবনের সে কি বিকট তাণ্ডব আরম্ভ হইল। যমুনার মূর্চ্ছিত তরঙ্গ সেই আঘাতে জাগিয়া আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিতে লাগিল। বৃক্ষশাখাশ্রিত নিশ্চিন্ত পাখীর দল আকস্মিক বিপৎপাতে ভীত বিস্মিত চক্ষু মেলিয়া অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। ঝড়ের বাতাস ঘরে ঢুকিয়া ধূলা বালিতে শিবানীর মুখ চোখ ভরাইয়া দিল, তথাপি শিবানীর যেন উঠিবার শক্তি ছিল না! এই রাত্রি, এই অন্ধকার-ঘন দুর্য্যোগ রাত্রি—এখন তো জগতের কোথাও একটি প্রাণীও জাগিয়া নাই—এখনও কি সে তাদের জীর্ণ দ্বারে ব্যগ্র করের আঘাতের সহিত পরিচিত ব্যগ্র কণ্ঠের আহ্বান শুনিতে পাইবে না! আজ তো বিশ্বের কোথাও কোন ফাঁক নাই—কাণায় কাণায় সবই পরিপূর্ণ, সবই প্রচুর—সবই নিবিড়? শিবানীর হৃদয়ও আজ ছাপাইয়া উঠিয়াছে, আজ কোথাও কোন বাধা নাই, এই অন্ধকারে, এই সীমা-হীন সন্ধি-হীন অনন্ত অন্ধকারে

আজ কেহ কাহারও মুখ দেখিতে পাইবে না। বাতাসেই এই ক্রোধ-হুঙ্কারের মধ্যে গভীর দীর্ঘশ্বাস ধ্বনিত হইবে না, অদম্য অশ্রুজল গোপনই থাকিয়া যাইবে—তবে কেন আজও এই ঘোর অমানিশার মধ্যে তার সেই জ্যোৎস্না যামিনীর দীর্ঘ বিরহের অবসান হইবে না?

বাতাস ক্রমেই উন্মত্ততা বাড়াইয়া তুলিয়া অধিকতর ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বন্য জন্তুর মত গভীর চীৎকারে যমুনা জলের উপর দিয়া বৃক্ষলতার মধ্য দিয়া এ পারে ও পারে ছুটিয়া ফিরিতে লাগিল। যমুনা সেই উন্মত্ত চরণস্পর্শে রুদ্ধ রোষে ফুলিতে লাগিল; অন্ধকার প্রকৃতির দীনতা দেখাইয়া আকাশের বুক চিরিয়া নূতন ইস্পাতের ছুরির ফলার মত বিদ্যুৎ শিখা খেলিয়া যাইতে লাগিল, জল স্থল কম্পিত করিয়া মেঘ গর্জ্জিয়া উঠিল।

সে স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিল।—যে দিন অপ্রত্যাশিতভাবে নীরদকুমার তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তার পর প্রায় দুই বৎসর অতীত হইয়াছে, সেই বিদায়ের পর এ পর্য্যন্ত আর কোন সংবাদ নাই, সংবাদ পাইবার উপায়ও নাই! তার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর জন্মভূমি কোথায় বা তার কেহ আছে কি না কিছুই সে জানে না। আজও গাঢ় অন্ধকারে ডুবিয়া ভাবিতেছিল—"চলে গেলে!—কেমন করে মনে করলে সত্যই আমি তোমায় ঘৃণা করি? যখন এ কথা বিশ্বাস করতে পারলে, তখন রাক্ষসীর বুকে কেন ছুরি বসিয়ে দিয়ে গেলে না? তোমার কুৎসা আমি যে সইতে পারি না, কত প্রাণের জ্বালায় লোকের উপর অভিমান করে আমি যে ও কথা বলেছিলাম, কেন, তুমি বুঝলে না? ফিরে এসো, শুধু শুনে যাও,—আমি তোমায় দেবতার চেয়েও বড় করে পূজা করি। দেখে যাও, আমার কি করে গেছ!"

বিপুলনাদে বজ্র হাঁকিয়া উঠিল, নিবিড় কৃষ্ণ মেঘে মেঘাচ্ছন্ন

আকাশখানাকে দুই অংশে বিভক্ত বিচ্ছিন্ন করিয়া পুনঃ পুনঃ বিদ্যুৎ খেলিয়া যাইতে লাগিল, ঝড়ের বেগ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল, এবং সেই ভীষণ বজ্রনাদে শিবানী ধ্যানভঙ্গে জাগিয়া উঠিল। ঐ না কে' ডাকিতেছে—"শিবানী, দোর খোল!" ঐ না কার ব্যগ্র কণ্ঠ শুনা যায়!—শিবানী উঠিয়া পড়িল। আকুলস্বরে সাড়া দিল—"যাই!"—বলিয়াই সে আপনার কণ্ঠস্বরে আপনি শিহরিয়া উঠিল—কৈ? কোথায় কা'র আহ্বান? কেহ তো কোথাও নাই! শূন্য গৃহে গভীর নীরবতার মধ্যে তারই কণ্ঠ আর্ত্তভাবে জাগিয়া উঠিয়াছে—ক্ষুদ্র এক গৃহের কোণ হইতে অন্য কোণে সে স্বর ছুটিয়া আসিয়াছে, প্রতিধ্বনিত হইয়াছে—"যাই!"—এই বিপুল অন্ধকার,—এই দুর্দ্দান্ত দানবের পিশাচ নৃত্য, প্রকৃতির এই ভীষণ সংহার মূর্ত্তির মাঝখানে অসহায়া পরিত্যক্তা বালিকার যাত্রাপথ কৈ?—কোন পথ ধরিয়া সে যাইবে? কোথায় সেই স্থান যেখানে এমন রাত্রি ভিন্ন যাওয়া যায় না?

সমস্ত রাত্রি ধরিয়া দারুণ দুর্য্যোগ। ঝড় বৃষ্টি একবার থামিল না। সমস্ত রাত্রি উৎকণ্ঠিতা শিবানী নির্জ্জন ঘরে জাগিয়া রহিল। ঝড়ের বেগে জীর্ণ দ্বার নড়িতে থাকে, সে চমকিয়া উঠে, বাতাস আর্ত্ত স্বরে কাঁপিয়া উঠে, সে শিহরিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। এই করিয়াই তার দীর্ঘ দিবসের দিন কাটিতেছিল, এমন করিয়া এ রাত্রিও শেষ হইল। ভোরবেলা বৃষ্টি থামিয়া আসিলে যমুনার বিলাপ-গান ও বাতাসের বিজয় সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে অবসন্ন শরীরে সে মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল। ক্লান্তচোখ অজ্ঞাতসারে কোন সময়ে মুদিয়া আসিল, জানিতে পারিল না।

পরদিন প্রভাতে শিশুর ক্রন্দনে শিবানীর যখন ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তখন বেলা হইয়াছে, ঝড়-ঝাপ্টা কাটিয়া পুঞ্জ পুঞ্জ শাদা মেঘের স্তর

ভেদ করিয়া চৈত্রের সূর্য্য পবনান্দোলিত তালগাছগুলার মাথায় চড়িয়া বসিয়াছে। অশোক গাছের ফুলেভরা ডালগুলা ঝড়ের আক্রমণে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যেন সদ্যোবিধবার অলঙ্কারহীন হস্তের মত সকরুণ দেখাইতেছিল। বৃষ্টির জল তখনও অশ্রুবিন্দুর মত বাতাসের দোলায় ঝরিয়া পড়িতেছিল, শিবানী উঠিয়া পুত্রকে কোলে তুলিয়া লইল।

দ্বৈপ্রহরিক আহারান্তে সিদ্ধেশ্বরী বাত-ব্যথিত জানুদ্বয়ে ধুতুরার প্রলেপ লাগাইয়া দাওয়ায় বসিয়া সূতা কাটিতেছিলেন। দৌহিত্র বসিয়া কাঠের লাল ঝুমঝুমি দুই হস্তে মুখে পুরিয়া ভোজ্যজ্ঞানে ব্যগ্রচিত্তে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিল, সুবিধা করিতে না পারিয়া এক একবার কাঁদিয়া উঠিয়া অনায়াত্ত দ্রব্যটা মাটিতে ঠুকিতেছিল, আবার কিছুক্ষণ পরে দ্বিগুণ অধ্যবসায়ের সহিত সেই লালাসিক্ত কাষ্ঠখণ্ড ভোজনের চেষ্টায় মনোনিবেশ করিতেছিল। সিদ্ধেশ্বরী মধ্যে মধ্যে মুখ তুলিয়া শিশুর দিকে চাহিয়া তাহাকে আদর করিতেছিলেন, সেও অমনই ভোজন ব্যাপার স্থগিত রাখিয়া লহর তুলিয়া হাসিয়া কত কি অশ্রুতপূর্ব্ব শব্দ উচ্চারণ করিতেছিল। শিবানী গরম দুধের বাটি ও ঝিনুক হাতে রান্নাঘরের বাহির হইতেই, বাহির হইতে একটা অপূর্ব্বশ্রুত শব্দ তার কানে ঢুকিল—"চিঠ্‌ঠি হ্যায়, মায়ি!"

শিবানীর সর্ব্বশরীর অজ্ঞানে কাঁপিয়া উঠিল। গরম দুধের বাটি যে পায়ের উপর পড়িয়া গেছে, উহা লক্ষ্য মাত্র না করিয়া সে ছুটিয়া বাহিরে আসিল। সিদ্ধেশ্বরী শব্দ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"পড়ে গেলি? মাগো! হাত পা স্থির করে তো কাজ করতে জানিস্‌নে, ফেল্লি কি? দুধ নাকি? ওমা! কি আক্কেল লো তোর—ছেলেটা খাবে কি?" সে ভর্ৎসনা শিবানীর কানেও পৌঁছিল না, "চিঠি" শব্দটা তাকে মুহূর্ত্তে স্তম্ভিত করিয়াছিল। তাহার এত বয়সে সে কখন

চিঠি পায় নাই—কেইবা তার আছে যে চিঠি লিখিবে? এ চিঠি কি তবে—?

রুদ্ধনিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল—"কা'র চিঠি?"

পিয়ন বলিল—"মায়িজী, শিবানী দেবী? শিবানী দেবীর নামে রেজিষ্টারী চিঠি আছে।"

শিবানীর শরীরের রক্তটা টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিল—কম্পিত হস্তে চিঠি লইয়া রুদ্ধস্বরে কহিল—"আমিই শিবানী।"

"মায়ী! এ রেজিষ্টারী চিঠি, এইখানে সহি করে দিতে হোবে।"

শিবানী বামহস্তে চিঠি চাপিয়া ধরিয়া দক্ষিণহস্তে পিয়নের প্রদত্ত পেন্সিল ধরিয়া লিখিবার চেষ্টা করিল, কম্পিত অঙ্গুলি হইতে বারকয়েক লেখা বাধিয়া গেল, তা'রপর কোন মতে স্বাক্ষর শেষ করিয়া যখন সে চিঠি খুলিল, তখন তার হাত এত কাঁপিতেছিল, এবং চঞ্চল হৃদয়পিণ্ড এমন জোরে আঘাত করিতেছিল যে চিঠি পড়িবার পূর্ব্বে খোলা চিঠি কোলে ফেলিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। উত্তেজনা একটু কমিয়া আসিলে চিঠি বাহির করিল। লেফাফার মধ্যে এক টুকরা চিঠি ও কয়খানা ব্যাঙ্ক নোট—দেখিয়া শিবানীর পাংশু মুখ লাল হইয়া উঠিল। চিঠিতে লেখা—

"শিবানী! বিধাতার অলঙ্ঘ্য লিপি মানুষের খণ্ডন করার সাধ্য কি! বলিয়া আসিয়াছিলাম—'আজ হইতে মনে করিও তুমি বিধবা'—বুঝি সেই অভিশাপ ফলিতে চলিয়াছে! মৃত্যুশয্যায় পত্র লিখাইতেছি। ভীষণ কলেরায় মরণ প্রতীক্ষায় পড়িয়া আছি। ডাক্তার বলিয়াছেন বাঁচিবার আশা নাই। আমার মৃত্যুর পর যখন পত্র পাইবে, তখন ঘৃণা করিয়া এ পত্র পড়িবে কিনা জানি না; কিন্তু তখন আমি ঘৃণ্য জীবন বহন করিব না, এই আমার সান্ত্বনা। সামান্য টাকা তোমার মাকে দিও, তাঁর নিকট ঋণী আছি, সামান্য কিছু সুদ দিলাম। —নীরদ।"

শিবানীর শিথিল অঙ্গুলি হইতে পত্রখানা মাটিতে পড়িয়া গেল।

সিদ্ধেশ্বরী অনেক ডাকাডাকিতেও মেয়ের সাড়া না পাইয়া বাতগ্রস্ত পা টানিয়া বিকৃতমুখে যন্ত্রণাসূচক ধ্বনি করিতে করিতে বিরক্ত চিত্তে খোঁজ লইতে আসিলেন।

প্রাঙ্গণের একপার্শ্বে পুষ্পহীন করবী গাছের কাছে প্রাচীরে ঠেস দিয়া শিবানী বসিয়া আছে দেখিয়া তাঁর রাগ বাড়িয়া গেল, বলিলেন—"ওখানে বসে কি হচ্ছে লা? এত যে ডাকছি, কাণেও যায় না? ধন্যি মেয়ে যা' হোক,"—বলিতে বলিতে থামিয়া গেলেন—"চিঠি নাকি? কে' লিখেছে! নীরদ বুঝি!—ওমা! কথা কস্‌নে কেন গো? ওমা! কি হলো গো! ওমা, আমি কোথা যাই গো! ওরে নীরদ বাবারে! ওরে আমার মাণিক রে, ওরে আমি পোড়াকপালী হতচ্ছাড়ী তোকে কেন বকেছিলুম রে! ওরে একবার আয় রে—ইত্যাদি শব্দে কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি বসিয়া পড়িলেন!

—অবশ্য নীরদ নয়—পাড়া ঝাঁটাইয়া আর আর সকলে তৎক্ষণাৎ তাঁর বাড়ীতে আসিয়া পৌছিল। কি ঘটিয়াছে জানিবার প্রয়োজন ছিল না, কান্নার বিনানী শুনিয়া নীরদকুমারের মৃত্যু সম্বন্ধে সকলেই নিঃসংশয় হইয়াছিল। সবাই সহানুভূতি প্রকাশ করিল, অনেকেই অকৃত্রিম চোখের জল ফেলিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিল—"আহা কি কপাল গো! জামাই ত নয়, যেন সোনার কার্ত্তিক! স্বভাবই বা কি মিষ্টি! এমন জামাই লোকে তপস্যায় পায় না! আহা বাছা রাগ করে গেল, কে'ই বা যত্ন আর্ত্তি করলে, মরি মরি—বিঘোরে প্রাণটাই নষ্ট করলে গা!—আহাহা!" কেহ বা বলিলেন—"কেঁদে কি কর্ব্বে বলো, শিবুর মা? সে তো তোমার গিয়েই ছিল—পিত্যেশ তো কিছুই ছিল না তবে মেয়েটার মাছ-ভাতটা বন্ধ হ'ল! তা' হ্যাঁগা—এমন কাণ্ডটা

হ'ল কোথায় ?" কিছুক্ষণ এমন ক্রন্দনাদির পর হঠাৎ প্রশ্ন উঠিল—"খপরটা দিলে কে ? কোথা হ'তে খপর এলো ?" তখন উচ্চ চীৎকার-পরায়ণা সিদ্ধেশ্বরীর হুঁস হইল—"ওমা তাই ত—তা' ত জানি নে, চিঠি দেখে আর শিবির রকমে মনটা কেমন হয়ে গেল !"

শুনিয়া সকলেরই দৃষ্টি ভূমি-পতিত পত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইল। এক জন পাঠক্ষমা যুবতী সেখানা তুলিয়া লইয়া পাঠ করিল এবং বলা বাহুল্য এর পর সিদ্ধেশ্বরীর রোদন প্রায় গগনভেদ করিবার উপক্রম করিল—কিন্তু হুঁসিয়ার মানুষ নোট কখানা আঁচলে বাঁধিতে ভুলিলেন না। এমন সময় মাতঙ্গিনী আসিয়া তাড়াতাড়ি শিবানীর নিকট ছুটিয়া গেলেন। তার স্পন্দহীন দেহ স্পর্শ করিয়াই তিনি সিদ্ধেশ্বরীকে ভৎ'সনা করিয়া কহিলেন—"পোড়ারমুখি, পরের ছেলের জন্যে চেঁচিয়ে মচ্চো, তোমার নিজের মেয়ে যে এদিকে শেষ হল ! মেয়ে বাঁচাতে চাও ত, থামো।"

'পরের ছেলের' যে কতখানি দরদ সিদ্ধেশ্বরী হাড়ে হাড়ে বুঝিয়া-ছিলেন। সখীকে দেখিয়া—"ওগো দিদি, নীরদ যে আমার রাগ করে চলে গিছল গো ! ওগো বাছা আমার সেই রাগ নিয়েই যে চলে গেল দিদি"—বলিয়া উচ্চরবে কাঁদিয়া উঠিলেন।

পাড়া পড়সী দিনের বেলা এমন বিপদের দিনে আত্মীয়তা দেখাইয়া আপ্যায়িত করিতে পারেন, কিন্তু রাত্রের প্রয়োজনে কেহই অগ্রসর হইতে চাহেন না, একা মাতঙ্গিনী দুইটি শোকার্ত্তা নারীকে লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িলেন। এর উপর একটি কচি ছেলে। বোসেদের বাড়ীর মেজ বৌ শিবানীর ছেলেকে সারাদিন দুধ খাওয়াইয়াছে, ভুলাইয়া রাখিয়াছে কিন্তু এখন শাশুড়ীর আজ্ঞায় তাহাকে গৃহে ফিরিতে হইবে, ঘুমন্ত শিশুকে মাতঙ্গিনীর নিকট দিয়া সে অনিচ্ছার সহিত চলিয়া গেল।

শিবানী যখন চোখ মেলিল, তখন তাদের প্রাঙ্গণস্থ আম্র বৃক্ষের অন্তরালে ক্ষীণ চন্দ্র ম্লানমুখে অনন্ত নীলিমার মাঝে মিলাইয়া যাইতেছিল।

ঘরের মধ্যে সিদ্ধেশ্বরী মাটীতে আঁচল বিছাইয়া শুইয়া অনুচ্চ স্বরে কাঁদিতেছিলেন, চীৎকার করিবার শক্তি হ্রাস হইয়াছিল বলিয়া নয়, নাতির ঘুম ভাঙ্গিবার ভয়ে। মাতঙ্গিনী ভূমিলুণ্ঠিতা শিবানীর মাথাটা কোলে তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে তার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিলেন, মধ্যে মধ্যে চোখের জল মুছিতে মুছিতে ডাকিতেছিলেন—"শিবু! শিবু! মারে! কথা ক' মা"—শিবানী বারেক চাহিয়া দেখিল। তখনও তাহার কথা কহিবার শক্তি ফিরে নাই। যন্ত্রণার একটা রুদ্ধ চাপে প্রাণটা কণ্ঠের কাছ অবধি ঠেলিয়া আসিতেছে। কাঁদিয়া হৃদয়ভার যে লঘু করিবে সে কান্না তার বাহির হইল না। অশ্রুপ্রবাহ চোখের প্রান্তে আসিয়া শুষ্ক হইয়া গেল। মাতঙ্গিনী কপালে চোখে জলসিক্ত শীতল হস্ত বুলাইয়া কানের কাছে নত হইয়া ডাকিলেন—"শিবু!" শিবানী সজোরে এতক্ষণে নিশ্বাস টানিয়া ক্লান্তকণ্ঠে গুমরিয়া উঠিল—"মাগো!" —সেই নিশ্বাসের সহিত বুকের পাষাণখানা যেন একটু নড়িয়া উঠিল।

মাতঙ্গিনী খোকার ঝিনুকে জল লইয়া তার শুষ্ক ওষ্ঠে প্রদান করিলেন, শিবানী চোখ মেলিল। রাত্রি তখন গভীর, চাঁদ ডুবিয়া অন্ধকার নিবিড় হইয়াছে। নদীর চরে শৃগাল ও রাস্তায় কুকুর ডাকিয়া থামিয়া গেল, শুদ্ধরাত্রি কেবলমাত্র একঘেয়ে ঝিল্লির রবে জাগ্রত রহিল। ঘরের মধ্যে সিদ্ধেশ্বরীর নিদ্রাতুর ক্লান্ত কণ্ঠ মৃদু হইতে মৃদুতর হইয়া এইমাত্র থামিয়াছে। শিবানী ডাকিল—"মাসি!"

মাতঙ্গিনী নিশ্বাস ফেলিয়া সাড়া দিলেন—"মা!" "মাসিমা—

আমি—আমি—বিধবা? যা বলে গিয়েছিলেন, সেই শাপই ফল্‌লো! আমার এতটা ব্যাকুল প্রার্থনা মদনমোহন কেমন করে অগ্রাহ্য করলেন, মাসিমা?"

মাতঙ্গিনী কাঁদিয়া ফেলিলেন—"কলিকাল যে মা!" তা'রপর উহাকে নীরব দেখিয়া দুঃখার্ত্ত কণ্ঠে ডাকিলেন—"শিবু!"

গভীর ক্লান্তকণ্ঠে শিবানী উত্তর দিল—"মাসিমা?"

মাতঙ্গিনী চালচলনে সকল দিকেই নিতান্ত সাধারণ হইলেও তাঁর নিরপত্য শূন্য বুকটার যে বৃত্তি দিয়া এই ধীর-স্বভাবা ধ্যানপরায়ণা বালিকাকে তিনি অনুভব করিতেন, তার দ্বারাই তিনি এই অদ্ভুত ধৈর্য্যের মর্ম্ম বুঝিলেন। এতটুকু আশা থাকিতে মানুষ এমন পাষাণে পরিণত হইতে পারে না। তা'ই একটু ভীত হইয়া তাহাকে বক্ষে টানিয়া কাতর কণ্ঠে বলিলেন—"একবার প্রাণ খুলে কাঁদ্ না, মা?" শিবানী বেগে মাথা নাড়িল—"আর কাঁদবো কেন মাসিমা? যতদিন একবিন্দুও আশা ছিল, কারুকে কি বলতে হয়েছে? মানুষে যত কাঁদতে পারে, তা' কেঁদেছি, শ্বাসে শ্বাসে প্রার্থনা করেছি, এ অভিশাপ যেন তাঁর পূর্ণ না হয়! কিন্তু তা' কি হয় মাসিমা? তাঁর কথা কি মিথ্যে হয়? তবে আর কেন? আর কা'র জন্য কাঁদবো মাসিমা? খোকা মায়ের হয়ে থাক—আমি ওকেও চাইনে, মাসিমাগো! আমার সব ফুরিয়েছে!" বলিতে বলিতে শিবানীর যে অশ্রু নিরুদ্ধ ছিল, সহসা তাহা বন্যার প্রবাহে উথলিয়া উঠিল। মাতঙ্গিনী বুঝিলেন, যন্ত্রণা তার সীমার মধ্যে আসিয়াছে। বাধা না দিয়া নীরব রহিলেন। আলোকের রেখা থাকিলে দেখা যাইত, তাঁর চক্ষু শুষ্ক ছিল না।

কিন্তু শিবানী জানিত না সে যখন মনে করিতেছিল তার সব ফুরাইয়াছে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই অলক্ষ্যে আবার তার জন্য নূতন চিন্তা নূতন

কার্য্য সঞ্চয় হইতেছিল। সে জানে না, এ জগতে কিছুই ফুরাইবার নয়, কিছুই ফুরায় না।

প্রত্যূষে আলোকে-আঁধারে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া বিদায় সম্ভাষণ করিতেছিল, মাতঙ্গিনী শিবানীর হাত ধরিয়া বিস্তৃত বালুতীরের মধ্য দিয়া জলের ধারে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ও পারের গাছ পালার মধ্যে অন্ধকার তখনও নিশ্চিন্তে ঘুমাইয়া আছে। পূর্ব্বদিকের খানিকটা ঈষৎ গোলাপী আভায় রঞ্জিত হইয়াছে মাত্র—যেন সেই আধ মুক্ত স্বর্গদ্বারপথে বালিকা ঊষার গোলাপী শাড়ীর আঁচলখানি পৃথিবীর পানে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, মূর্ত্তি তখনও দৃশ্য হয় নাই।

শস্যক্ষেত্রের মধ্যে জুলী পথ। ভোরের বাতাসে শির কাঁপাইয়া শস্যবৃক্ষগুলি কি যেন বলাবলি করিতেছিল—বুঝি তাদেরই কথা! তাদের পদশব্দে ত্রস্ত হইয়া সদ্যোজাগ্রত কয়েকটা উভচর প্রাণী ছুটিয়া পলাইল। তাদের অসতর্ক পাদক্ষেপে ঝড়ে উড়িয়া পড়া শুষ্ক পত্রাবলী সর সর করিয়া উঠিল। সকাল বেলার সেই ডালভাঙ্গা বকুল গাছটার মধ্য হইতে একটা নিদ্রাহীন কোকিল অকস্মাৎ ডাকিয়া উঠিল—"কু-উ!"

শিবানী বলিল—"মাসিমা, নোয়াটা কি না খুলে চলে না?" মাতঙ্গিনী বিস্মিত হইলেন। অর্থ বুঝিতে না পারিয়া অন্ধকারেই তার মুখ নিরীক্ষণ করিলেন। শিবানী সে দৃষ্টি দেখিতে না পাইলেও প্রশ্ন বুঝিয়া কহিল—"এখন মনে পড়েছে, চিঠিতে এমন কোন প্রমাণ নেই, যা'তে স্পষ্ট বুঝায় যে আমি—আমি—" জোর করিয়া উচ্চারণ করিল—"আমি—বিধবা। তিনি নিজেই তো সে চিঠি লিখেছেন।"

"তবে চল্ মা, আমরা সেখানে যাই!"

যমুনার জলে তপ্ত দেহ ডুবাইয়া সনিশ্বাসে শিবানী উত্তর করিল—"কেমন করে জান্‌বো মাসিমা, সে কোন্ দেশ? চিঠিখানা সেইখানেই

পড়ে আছে দেখলুম, কিন্তু থাম তো দেখলুম না! জানি আমার আশা নেই—তবু, মাসিমা, যদিই তাঁর অকল্যাণ করে ফেলি!"

ভোরের আলোয় সিক্তবসনা মুক্তকেশী নব বিধবা গৃহে ফিরিয়া আসিল।

৮

যে দিন শ্রাবণের অবিশ্রান্ত ধারাবর্ষণের মধ্যে ঘনঘটার ঘোর আবির্ভাবের ভিতর একজন গৃহহারা শ্রান্ত পথিক তাদের রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিয়া বলিতেছিল—"কেউ আছে? আমায় রাতের মত একটু আশ্রয় দেবে?"—সে দিন সিদ্ধেশ্বরী বাড়ী ছিলেন না, মাতঙ্গিনীর সঙ্গেই মথুরায় ঝুলন দেখিতে গিয়াছিলেন। শিবানী প্রতিবেশিনী কৈবর্ত্ত-কন্যা হারানের মার সহিত বাড়ীতে একা। সে দেখিল পথিকের জামা কাপড় ভিজিয়া গিয়াছে। সে তাঁকে মায়ের একখানা থান আনিয়া পরিতে দিল এবং তার নির্দ্দেশে হারাণের মা কর্ত্রীর বিছানা আনিয়া নীচের ঘরের তক্তপোষে পাতিয়া দিল। ঘরের গরুর দুধ আনিয়া সে অতিথিকে খাওয়াইল। তখন ক্লান্ত অতিথি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়া পড়িল। পরদিন অনেক বেলা হইলেও অতিথি শয্যাত্যাগ করিল না। প্রতীক্ষা করিতে করিতে শেঠ মন্দিরের ঘড়িতে দশটা বাজিয়া গেল। শিবানী বলিল—"হারাণের মা, দেখ দেখি মানুষটির কি অন্যায়! মা যদি এসে পড়েন ত বকুনি খেয়ে আমার প্রাণ যাবে। সকাল বেলা উঠেই ও কেন চলে গেল না?"

হারাণের মা অতিথিকে বিদায় করিতে যাইতে উদ্যত হইলে শিবানী

তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"দাঁড়াও, হারাণের মা, লোককে কি অমনি যেতে বলতে আছে? এক বাটি দুধ আর দুখানা বাতাসা নিয়ে যাও। চারটি ভাত দিতে পারলেই বেশ হ'ত, কিন্তু কি করি—মা যদি এসে পড়েন, সে আর কাজ নেই।"

হারাণের মা গিয়া দেখিল অতিথি বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছে, তার মুখ চক্ষু অত্যন্ত স্ফীত ও আরক্ত, ভাবে বোধ হয় সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না।

হারাণের মা দুধের বাটি নামাইয়া দিয়া বলিল—"উঠেছ বাছা! মুখ হাত ধুয়ে দুধটুকু খেয়ে নাও, তা'পর আপনি এখন এস্তে পার!"

অতিথি কম্পিত কণ্ঠে কহিল—"অনেকক্ষণ হ'তেই যাবার চেষ্টা করছি, কিন্তু আজ আর আমার দাঁড়াবার সাধ্য নেই! আমি চোখে দেখতে পাচ্ছিনে, যদি আজও আমায় অনুগ্রহ করে একটু স্থান দেন—"

হারাণের মা রাগিয়া বলিল—"তুমি ত লোক ভাল নও, বাপু! খেতে পেলে যে দেখচি শুতে চাও। না, না, সে সব হ'বে টবে না, গিন্নি যদি এসে পড়ে, তা হলে মেয়েটাকে তো আস্ত রাখবেই না, নিজেও না হোক অপমানটা হবে! তার চেয়ে এই বেলা পথ দেখে স্যাও!"

অতিথি মুহূর্ত্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। কম্পিত অধরে কি বলিতে গিয়া হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া লইল, পা দু'টা মাতালের পায়ের মত টলিতেছিল, দেহভার যেন তারা বহিতে পারিতেছে না!

এমন সময় শিবানী দ্রুতপদে প্রবেশ করিল, তিরস্কার-পূর্ণ স্বরে বলিল—"হারাণের মা! রোগা লোককে অমন করে কি বিদায় করে দিতে আছে?" প্রস্থানোদ্যত অতিথিকে মিনতি করিয়া কহিল—"আপনি যাবেন না, কিছু মনে করবেন না—"

অতিথি চমৎকৃত হইয়া বালিকার দিকে চাহিয়া রহিল, মৃদু কণ্ঠে কি

যেন কৃতজ্ঞতার কথা বলিতেও গেল কিন্তু তার পূর্ব্বেই হৃত চেতনের মত বিছানায় শুইয়া পড়িল। সেই যে শুইল দিন রাত্রের মধ্যে আর একবারও চোখ মেলিল না। যদিও অতিথির কণ্ঠ হইতে তার বিশেষ চেষ্টাসত্বেও কোন শব্দ বাহির হয় নাই, কিন্তু অবস্থা দেখিয়া তার অন্তরের কৃতজ্ঞতা শিবানী অতি সহজেই অনুভব করিয়াছিল। যদি অন্তরাল হইতে সে অসুখের কথাটা না শুনিতে পাইত, কি সর্ব্বনাশই হইত ? মনে করিতেও গা কাঁপিয়া উঠে !

শিবানীর মা আসিয়া যখন তাঁর স্বতঃই পঞ্চমে বাঁধা কণ্ঠ চড়াইয়া কন্যাকে বেপরোয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন, তখন শিবানীর সজল চক্ষু বারবার অচেতন অতিথির রোগযাতনা-প্রকটিত মুখের উপর ফিরিতে লাগিল। যদি সে শুনিতে পায়, যদি বুঝিতে পারে !

কিন্তু তখন আর সেই জ্ঞানশূন্য পূর্ণ বিকারের রোগীকে বিদায় করিবার উপায় নাই। অগত্যা সিদ্ধেশ্বরী রাগে গর্জ্জিয়া বোসেদের জামাইকে ডাকিতে গেলেন—যদি হাসপাতালে পাঠাইবার কোন ব্যবস্থা করিতে পারে ! শরৎ মিত্র মেডিকেল কলেজে ফোর্থ ইয়ারে পড়ে, স্ত্রীর অসুখের সংবাদে এখানে আসিয়াছে। শরৎ যত্ন করিয়া রোগীর চিকিৎসা করিল। এখনও ব্যবসাদার হয় নাই ! শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও মানব-স্বভাব-সূচক কোমলতা হৃদয়ে এখনও প্রবল। শিবানী আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বিপন্ন রোগীর সেবা করিতে লাগিল। সিদ্ধেশ্বরী হাসপাতালে পাঠাইতে চাহিলেও শেষটা পারিলেন না। এইরূপে ঐ রোগী জীবন মৃত্যুর মহাসমরে অবশেষে জয়লাভ করিল। সিদ্ধেশ্বরী যে তাহাকে গৃহে স্থান দিয়াছিলেন, তার প্রধান কারণ, শরতের কাছে শুনিয়াছিলেন তাঁদের রোগী প্রলাপের মধ্যে যেরূপ বড় বড় ইংরাজি কথা বলিতেছে, সে নিঃসন্দেহ বি এ, এম এ ক্লাসের ছাত্র এবং সে যে অসামান্য

ঘরের সন্তান, তার প্রমাণ, অঙ্গুলিস্থিত একটি সুবৃহৎ সমুজ্জল হীরক অঙ্গুরী !

সন্ধ্যার অন্ধকারে দিবসের শেষ আলো মিলাইয়া পড়িলে, রোগী সেদিন রোগশয্যা ছাড়িয়া অঙ্গনে আসিয়া বসিয়াছিল। শুক্লা চতুর্দ্দশীর চাঁদ ইহার মধ্যেই দেখা দিয়াছে। জ্যোৎস্নালোক রোগীর রক্তহীন মুখকে পাণ্ডুতর করিয়া তুলিয়াছিল। মৃদু বাতাসে নিমগাছের শাখা অল্প অল্প দুলিতেছিল সেই হাওয়া তার শুষ্ক ললাটে মায়ের হাতের স্পর্শের মত সস্নেহে স্পর্শিত হইতেছিল। সিদ্ধেশ্বরী পায়ের কাপড় একটু গুটাইয়া শুচিতা রক্ষা করিয়া মালা ফিরাইতে ফিরাইতে অনতিদূরে আসিয়া দাঁড়াইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজ কেমন আছ গা ?"

"ভাল" বলিয়া অতিথি তাঁর দিকে মুখ ফিরাইল। সিদ্ধেশ্বরী সাবধানে সেইখানেই বসিলেন, একটু থামিয়া ছোট্ট একটি নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন —"ভাল হয়েছ, তা'ই ভাল বাছা ! যে দায়ে ফেলেছিলে—ভয়ে আর বাঁচিনে ! বলি, কোথা থেকে আমার এ গেরো জুটলো গা ! যদি কিছু অ-মন্দ হয়, আমি কার সাহায্য নিয়ে কি করবো ? যা'হোক গে, টাকার ঘণ্ট করে, গতরের ছেরাদ্দ করে তোমায় বাঁচিয়ে তুলেছি, তা'ই আমার পরম ভাগ্যি ! তা' তোমার বাড়ী কোথা গা ?—একলা পথে ঘুরছিলে কেন ? তোমার আছে কে ?"

অতিথি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল—"আমার ? কে' আছে ?—আমি এদিকে বেড়াতে এসেছিলুম।"

সিদ্ধেশ্বরী কহিলেন—"আহা !" শব্দটা সহানুভূতির কিন্তু স্বরটা আগ্রহের ! একটা বড় লোককে যে :হাতের মুঠায় রাখিতে পারিবেন এটা একটা গৌরবের বিষয়—"তা' বলে কি এমন টো টো করে ফিরতে হয় ? তোমরা ব্রাহ্মণ তো বটে ! তোমার নামটি কি ?"

অতিথি একটু ভাবিয়া বলিল—“নীরদকুমার চৌধুরী।”

“চৌধুরী! তোমরা রাঢ়ী না বারেন্দ্র?”

“বারেন্দ্র!”—“কুলীন না কাপ? ক’পুরুষে? কার সন্তান?” ইত্যাদি সকল সংবাদই যখন অনুকূল দেখা গেল আনন্দে সিদ্ধেশ্বরীর চোখ তখন চকচকে হইয়া উঠিল, সাগ্রহে বলিলেন—“তা’, বাছা, তুমি কেন আমার বাড়ীতেই থাক না? আমারও ত ঐ মেয়ে বই আর কেউ নেই। আর তুমি তো শিবুকে দেখছো, সে কিছু আর অপছন্দর মেয়ে নয়! এই হয়, নয়, দেখলে ত, খামকা কি সেবাটাই না তোমার কর্‌লে! এমন মেয়ে বাছা, তুমি কোথাও খুঁজে পাবে না—তা’ জাঁক করেই বলতে পারি। বিদেশ বিভুঁয়ে থাকি; তিন পুরুষ আমরা দেশ ছাড়া; শিবুর বাপ ওর নেহাৎ কচি বেলায় মারা গ্যাছে, পুরুষ অভিভাবক কেউ দেখতে শুন্‌তে নেই, কাজেই কে’ খোঁজে, দেখে—তাই একটি ঘর-জামাই-ই চাই। নৈলে মেয়ে আমার ফেল্‌না নয় যে, যা’কে তাকে ধরে দিই। সে দিন পেসন্ন দিদি দেশ থেকে এসেছিল, সে বল্লে, চাঁদপাড়ার বাবুরা নাকি এখানে এসে শিবুকে দেখে গিয়েছিল, তা’দের ভারি সাধ, বউ করে, আমি তা’তে রাজি নই। আমার ঐ একটী মেয়ে ওখানে হলে আমি ত তাকে চক্ষে দেখব না, কাজ নেই আমার রাজ্যিভোগে।”

এত কথা শুনিয়াও নীরদকুমার হাঁ, না বলিল না।

পরদিন সিদ্ধেশ্বরী পুষ্পহীন সাজি হস্তে, নামাবলি গায় জড়াইয়া অনুচ্চ কণ্ঠে—“জয় জয় গোপাল গোবিন্দ গদাধর, কৃষ্ণচন্দ্র কর কৃপা করুণাসাগর” ইত্যাদি আওড়াইতে আওড়াইতে বাড়ী ঢুকিয়া ডাকিলেন—“ওলো শিবি! সাজিটা নে’, বেগুন ফুলের ভাজের ব্যারাম হয়েছে, একবার দেখে আসি।”

সিদ্ধেশ্বরী বাহির হইবার পূর্ব্বে নীরদ আসিয়া বিনীতভাবে বলিল—

"আপনাদের অনেক কষ্ট দিয়েছি, আজ আমায় বিদায় দিন।" একটু কুণ্ঠিতভাবে আংটিটা দিয়া বলিল—"এটার দাম ছিল, এখনও হয়ত কিছু আছে। বিক্রি করে ডাক্তারের আর ওষুধ পত্রের দাম দেবেন।"

সিদ্ধেশ্বরী আংটির ঔজ্জ্বল্যে মূল্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেন না, এই গৃহহীন যুবককে ছদ্মবেশী রাজপুত্র হইলেও হইতে পারে বলিয়া সন্দেহ করিলেন। এত সস্তায় এমন জিনিষ কেনার সুযোগ মিলে না, মনটা জলিয়া উঠিল, মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন—"আমরা কি তোমার আংটির লোভেই এতটা সেবা যত্ন করলাম? না হয়, শ' দুশ টাকাই আমার গেল, তাতে আমি ফতুর হবো না। তোমার কল্যাণে টাকার দুঃখ আমার নেই, কত্তা আমায় টাকা বিছিয়ে বসিয়ে রেখে গেছে। হরি হে, তোমারই ইচ্ছে! কলিকাল যে! হাজার করে মরো, বেইমানি করতে কেউ ছাড়েনা!"

নীরদ ব্যস্ত হইয়া বলিল—"সে কি, আপনারা আমার জন্যে কেন এত খরচ করবেন!"

"তা'ই ত, বল্‌ছি বাছা, আপনার জন হ'লেই পার! শিবু ত বাপু তোমার অযুগ্যি নয়। ভালটাই কি কম বাসে তোমায়! তাও কি চক্ষুমেলে দেখ না?"

নীরদের পাণ্ডুমুখ আরক্ত হইল, রাগ করিয়া কি যেন বলিতেও গেল, বলা হইল না, শিবানী ওষুধের শিশি ও ভিজা ছোলা, আদা ও নুন লইয়া আসিল। পাথর বাটিতে ওষুধ ঢালিয়া অচঞ্চল কালো তারা দুটি তার মুখে স্থাপিত করিয়া মৃদুস্বরে বলিল—"খেয়ে নিন্।" নীরদ একটু অপ্রতিভভাবে উহার মুখের দিকে চাহিল—সে মুখখানা সব সময় একই রকম—পাথরের কোঁদা মুখের মত, ভাব প্রকাশ হয় না। নীরদের

ঔষধ খাওয়া হইলে পাত্র হস্তে তেমনি সুধীরে চলিয়া গেল। নীরদ একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিল। সিদ্ধেশ্বরীর দিকে ফিরিয়া কহিল—"পরে বলবো!"

সমস্ত দিনটা নীরদের অস্থিরতায় কাটিল। তার নিকট শিবানী আদৌ লোভনীয় নয়। এ বিবাহ গৌরবের বা কিছুমাত্র সুখেরও নয়, বরং অপমাননাকর! যে ভয়ে সে সব খোয়াইল, এখানেও সেই ভয়! কিন্তু সে অত্যন্ত দুর্ব্বল, প্রায় চলৎশক্তিহীন, একটা আশ্রয়ের মধ্যে একটু সেবার মধ্যে নিজেকে নিক্ষেপ করিবার জন্য উৎসুক। এই দুর্ব্বল শরীর ও বেদনাহত চিত্ত আত্মমর্য্যাদাকে অটুট রাখিতে পারিতেছে না, ঠিক এমন সময় এ অযাচিত আবেদন—এইটুকুই আজ তার মূল্য। এ ছাড়া আরও একটা সন্দেহও তার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল, শিবানী কি তাকে ভালবাসে? সিদ্ধেশ্বরীর ওই মন্তব্যের পর সে বুঝিল, তার সন্দেহ মিথ্যা নয়, শিবানী তাকে সত্যই ভালবাসে! শুধু তার এ দয়া নয়, তার চেয়ে অনেক গভীর অনেক একান্ত কোন মনোবৃত্তি যা তাকে এমন প্রাণঢালা সেবায় আত্মোৎসর্গ করাইয়াছে। জীবনদাত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতামিশ্রিত করুণায় হৃদয় ভরিয়া উঠিল, এই ভাবের উচ্ছ্বাসে আপনাকে বিকাইয়া দিতেও তাই সে কুণ্ঠিত হইল না। ভালবাসা? সে ত কাহারও নিকট পায় নাই! এ যে অপার্থিব দৈবধন!

সিদ্ধেশ্বরীর মিতিন মকর ঝুমকোফুল, গঙ্গাজলরা সেই রাত্রেই জানিতে পারিল শিবানীর বিবাহ স্থির।

মানুষ ভুল করে এবং ঠকেও। সিদ্ধেশ্বরী জামাতা নির্ব্বাচনে কি ঠকাটাই না ঠকিলেন। আশা ছিল, অন্ততঃ বিবাহের পূর্ব্বক্ষণেও জানা যাইবে, হবু জামাই রাজা বা রাজপ্রতীম কেহ, হয়ত বা রাজ্যে খবর গিয়াছে, হাতি-ঘোড়া বাজি-বাজনা লোক লস্করে তাঁর ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ

ভাঙ্গিয়া পড়িবে। বাসর জাগানীরা হিংসায় ফাটিয়া দেখিবে শিবানীর দেহ হীরা মতি সোনার ভারে হেলিয়া পড়িয়াছে!

বিনা বাধায় বিবাহ হইয়া গেল, রাজবাড়ী হইতে কাকপক্ষীও আসিল না, সিদ্ধেশ্বরীর বুকখানা বিশ হাত বসিয়া গেল! সই মিতিনের কাছে ভবিষ্যৎ দর্শনের যে সব পরিচয় দিয়াছেন, সমস্তই এক মুহূর্তে ধূলিসাৎ হইল! জামাতা যে তাঁকে অন্যায় ভাবে ঠকাইয়াছে, সে বিষয়ে বিনা তর্কেই চিত্তে তাঁর সংশয় রহিল না, উহার উপর তীব্র বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিলেন।

শিবানীর হাতে হীরার বালা উঠিল না, গলায় মতির মালা দুলিল না, একখানা পাটের শাড়িও জুটিল না—অথচ বিবাহ হইয়া গেল,এবং শিবানী যেমন সুখী হইল, তেমন কোন মেয়েও হয়ত লাখ টাকার হীরা পরিয়াও হয় না। নিভৃত হৃদয়ের পূজা, ঐকান্তিক দেবতার চরণে পৌঁছিয়াছে, সেই তো চরম পুরস্কার তার।

সবশুদ্ধ জড়াইয়া কিন্তু বিবাহটা সুখের হইল না। সিদ্ধেশ্বরী যখন দেখিলেন জামাতাবাবাজী রাজা জমিদার নহেন, নেহাৎই চালচুলাহীন লক্ষ্মীছাড়া উদ্বাস্তু—এবং তাঁর ঘরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সে করিল, তখন আপাদমস্তক তাঁর জ্বলিয়া গেল। বসিয়া বসিয়া শাশুড়ীর অন্ন ধ্বংস করিতে লজ্জাও হইল না! এদিকে মিতিনের কাছে শুনিয়া গোপাললাল ব্রজবাসীর খাতা-লেখা চাকরীর কথা বলিতেই, নবাবপুত্র অহঙ্কারে মুখ ঘুরাইয়া চলিয়া গেলেন, যেন কত বড় লোক!

সিদ্ধেশ্বরী নদীর ঘাটে ও পড়শী বাড়ী প্রচার করিলেন, একটা বওয়াটে জোচ্চোরের পাল্লায় পড়িয়া শিবানীকে জলে ফেলিয়াছেন!

শাশুড়ীর চটানো চটানো ভাষায় নীরদেরও শ্রবণেন্দ্রিয় মধ্যে মধ্যে অপরিতৃপ্ত থাকে না, কিন্তু তার রাগ করিবার পূর্ব্বেই শিবানী আসিয়া

বালাপরা দুখানি নরম হাতে তার হাত দু'খানা চাপিয়া ধরিয়া বিষণ্ণ দৃষ্টিতে এমন করিয়া তার মুখের পানে চায় যে নীরদ সেই মিনতিভরা চোখের পানে চাহিয়া তাকে বুকে টানিয়া না নিয়া পারে না। কিন্তু কথা সে কমই বলে, তার নীরব ভাষায় যে গভীর আবেদন থাকে সেই অব্যক্তকে ছন্দিত করিয়া তোলে। সে ভাষার অমর্য্যাদা করা সহজ নয়। তাই তাকে অসম্ভবও সহ্য করিতে হইত।

কিন্তু তেমন করিয়া বেশী দিন চলে না, শ্বশ্রূর সুতীক্ষ্ণ রসনার ক্ষুরধারে ক্লান্ত নীরদ গৃহবাস যতই হ্রস্ব করিল, উক্ত মহিলার জিহ্বার গরল ততই তীব্রতর হইয়া উঠিল, অবশেষে এমন হইল যে, সে বিষ-জ্বালা আর শিবানীর মৌন আবেদনে প্রশমিত হওয়ার উপায় রহিল না।

শিবানীর প্রতি কৃতজ্ঞতা অপমানের পাথরে ঠুকিতে ঠুকিতে একদিন চূর্ণ হইয়া গেল।

এর ফলে যাহা ঘটিল, তাহা বলা হইয়াছে—কিন্তু নীরদ যে সুরথবাবুর লাইব্রেরীতে একজামিনের জন্য রাত জাগিয়া পাঠাভ্যাস করিত এবং এলাহাবাদ হইতে এম্-এ পরীক্ষা দিয়া ভাল করিয়া পাশও করিয়াছে সে খবর তার মৃত্যু সংবাদের পরে জানা গেল। তখনও কি কেহ বুঝিল যে, শুধু এই জন্যই সে এতখানি সহ্য করিয়া এদের দ্বারে পড়িয়াছিল!

৯

কলিকাতায় প্লেগ জোর করায় পরিবারবর্গকে রজনীনাথ অন্যত্র পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। পত্নী বসুমতী যথেষ্ট আপত্তি করিয়া অবশেষে ছেলেমেয়ের কথা ভাবিয়া সম্মত হইলেন। তবে বলিলেন— "যদি যেতেই হয়, তীর্থস্থানে যাব। স্রেফ স্যানিটোরিয়ামে যেতে ভাল লাগে না, না আছে আপন জন, না ঠাকুরদেবতা।"

ভারতবর্ষের মানচিত্র খুলিয়া বহু স্থান বাদ দিয়া পুরী যাওয়া স্থির হইল। তবু তো মহাপ্রভুর দর্শন মিলিবে!

দেবতা ও সমুদ্রের মহান দৃশ্য বসুমতীকে অনেকটা শান্ত করিলেও স্বামীর জন্য ভাবনা কি যায়! সকালে সন্ধ্যায় মন্দির—সমুদ্র, আর মধ্যাহ্নে পুত্র কন্যাদের সঙ্গে পঠন পাঠনে দিন কাটিতে লাগিল।

হঠাৎ একদিন ভ্রাতৃ-জামাতা মাদুরা-প্রবাসী যোগেন্দ্রনাথ আসিয়া উপস্থিত, বলিল—"মাদুরা চলুন!—আমরা রয়েছি।"

বসুমতী প্রথমে 'জামাইবাড়ী' যাইতে দ্বিধাগ্রস্ত হইলেও যোগেন্দ্র ছাড়িল না, দুইটা পা চাপিয়া ধরিয়া সত্যাগ্রহ করিল—"'যাবো' না বললে উঠবোও না—খাবোও না।" অগত্যা বসুমতীকে রাজী হইতেই হইল।

যোগেন্দ্র বসুমতীর পদধূলি গ্রহণ করিল এবং বিজয়-গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া হতবুদ্ধি শান্তিকে ডাকিয়া কহিল—"নতুন গিন্নী! শিগ্‌গির তৈরী হও, সতীন সম্ভাষণে যেতে হ'বে!"

শান্তি লজ্জায় লাল হইয়া পলাইয়া গেল, সমস্ত দিন সে যোগেন্দ্রের সম্মুখে আসিল না, অবশেষে যোগেন্দ্র 'ঘাট' মানিয়া অনেক কষ্টে রাগ থামাইল, সর্ত্ত হইল মাদুরায় গিয়া একটি করিয়া ডিটেক্‌টিভ বা ভূতের গল্প বলিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে। রজনীনাথ লিখিলেন—"বেশ, যাও—যোগেন তোমাদের দেখ্‌বে, আমি তবু নিশ্চিন্ত থাকবো।"

মাদুরায় আসিয়া বসুমতীর ভাল লাগিল না। ঠাকুর দেবতা অনেক কিন্তু সর্ব্ব-সন্তাপহরা আনন্দময়ের আনন্দরূপ ত এখানে নাই, সমুদ্রই যে সেখানে তাঁর সঙ্গী ছিল! জামাতা শুনিয়া অভিমান করিলেন—"পিসিমা আমাদের ভালবাসেন না, নৈলে জলজ্যান্ত আমার চাইতে সেই অঢেল জলই বেশী হ'লো?"

সেদিন যোগেন্দ্র ও সুকু যোগেন্দ্রের এক বন্ধুর বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছিল, শান্তি যোগেন্দ্রের পুত্র অনিলকে লইয়া বাগানে বেড়াইতেছে, অদূরস্থ নারিকেল কুঞ্জের অন্তরালে সূর্য্য অস্ত গেলেন।

শান্তির ইচ্ছা অনিলকে ফুল দিয়া ভুলাইয়া অর্দ্ধ পঠিত পুস্তকখানা শেষ করে। রাত্রে যোগেন্দ্র ডিটেকটিভ গল্প আরম্ভ করিবে, বই শেষ হইবে না।

অনিলের সে মতলব নয়, সে হয় ফুল নয় পাখী ধরার বায়না করিতে-ছিল। কয়েকটা প্রজাপতি উড়িতেছে দেখিয়া আব্দার ধরিল—"পেত্তাপত্তি নোব।" শান্তি ধমক দিল—"প্রজাপতি ধরলে বিয়ে হ'বে না রে বোকা! কেমন ফুল দেখ দেখি!" সহসা উদ্যানে গাড়ির আওয়াজ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিল—যে টমটমখানা কয়দিন সকাল সন্ধ্যায় এই পথে যাইতে যোগেন্দ্রনাথকে অফিসে লইয়া ও ফেরত দিয়া যায়, এক আরোহীকে লইয়া উদ্যান-পথে অগ্রসর হইতেছে। শান্তি একটু পাশ কাটাইল, অনিল ছুটিয়া আগন্তুককে জড়াইয়া ধরিল—"তুমি কেন আসনি?"

আগন্তুক তাহাকে কোলে লইয়া চুম্বন করিতেই অনিলের পূর্ব্বশোক উথলিয়া উঠিল, রাঙ্গা ঠোঁট ফুলাইয়া চোখে জল আনিয়া নালিস রুজু করিল—"আমায় পেত্তাপেত্তি দিলে না।"

"আচ্ছা আমি দোব'—বলিতে বলিতে অদূরবর্ত্তিনী শান্তির দিকে চোখ পড়িল, অনবগুণ্ঠিতা কিশোরী কৌতুকপূর্ণ সহাস্য চক্ষু মেলিয়া আছে—দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি যোগেন্দ্রের বাড়ী সর্ব্বদাই আসেন, অল্পদিন এ বাড়ীতে দুইবার গৃহিণী বদল হইল। অনিলের মার মৃত্যুর পর অনিলের পিতা বিবাহ করিয়া ঘরে নব বধূ আনিয়াছেন—কিন্তু তিনি তাঁকে এখনও চোখে দেখেন নাই—ইনিই কি সেই? হঠাৎ মনে পড়িল,

শুনিয়াছিলেন, যোগেন্দ্রের এক শাশুড়ী ও ছেলে মেয়েরা যোগেন্দ্রের বাসায় আসিয়াছেন, সেই সম্বাদে তিনি সন্ধ্যায় আসা বন্ধ করিয়াছিলেন, মেয়েটি হয়ত তাঁদেরই কেহ !

অনিল ডাকিল—"মাসিমা !" আগন্তুক বুঝিলেন, অনিলের এ বিমাতা নয়; কিন্তু বিস্ময় ঘুচিল না। তিনি জানেন, এই বয়সের মেয়েরা পুরুষ দেখিলে আধ হাত ঘোমটা টানিয়া দেয়, ফুলের রাশি অঞ্চলে অপরিচিতের সম্মুখে এমন সলজ্জ ভঙ্গীতে সে যে দাঁড়াইতে পারে, এ ধারণা তাঁর ছিল না, চমৎকৃত হইলেন।

অনিল মাসিমার সাড়া না পাইয়া রাগিয়া আছাড় খাইয়া পড়িতেছিল, শান্তি তাকে ধরিয়া ফেলিল, বলিল—"বড্ড তুমি দুষ্ট হয়েছ, চল মার কাছে চল।" অনিলের হাত ধরিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইতে আগন্তুক ভাবিলেন, মেয়েটি যখন তাঁকে লজ্জা করিল না, তখন তাকে উপেক্ষা দেখান হয়ত ভাল দেখাইবে না, সসঙ্কোচে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি বুঝি যোগেনের স্ত্রীর বোন ?

শান্তি জানিত না তার মত কিশোরী মেয়ের এ অবস্থায় কি করা উচিত। সে একটু কুণ্ঠিতভাবেই "হ্যাঁ" বলিয়া জবাব দিল। আগন্তুক একটু ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মাদুরায় এখন থাক্‌বেন ?" শান্তিকে দেখিয়া তাঁর কি যেন মনে পড়িতেছিল ! গমনোদ্যতা শান্তি দাঁড়াইয়া উত্তরে বলিল—"বল্‌তে পারিনে, বোধ হয় থাকা হ'বে। কলকেতায় প্লেগ না থামলে বাবা আমাদের নিয়ে যাবেন না, তিনি নিজে সেথানেই আছেন !" মনের দুঃখটা আচমকা প্রকাশ হইয়া পড়িল। আগন্তুক দেখিলেন, বালিকার চোখ দুইটি ছল ছল করিতেছে ! সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন—"ছোট ছেলেদের জন্যেই ভয়, তাঁ'র ভয় নেই। আপনার বাবা বুঝি চাকরি করেন, তাই আস্‌তে পারেন নি ?"

"বাবা ত চাকরি করেন না, তিনি উকিল, ইচ্ছা কর্‌লেই আস্‌তে পার্‌তেন, এলেন না।"

"উকিল! তাঁ'র নাম কি?"

"তাঁর নাম শ্রীযুক্ত রজনীনাথ মৈত্র।"

"কি, কি নাম বল্লেন?"

শান্তি নব-পরিচিতের এই অদ্ভুত আগ্রহের স্বরে বিস্মিত না হইয়া পারিল না। পুনর্ব্বার স্পষ্ট করিয়া বলিল—শ্রীযুক্ত রজনীনাথ মৈত্র!"

আগন্তুক একটা নিশ্বাস লইয়া অত্যন্ত মৃদুস্বরে কহিলেন—"আপনি রজনীবাবুর মেয়ে! হাইকোর্টের উকিল তো?"

শান্তির মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল। সে বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া ক্ষিপ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"আপনি বাবাকে চেনেন না কি? কলকেতায় বাড়ী বুঝি?

"হ্যাঁ, না—তা" নয়—চিনি—হ্যাঁ নাম শুনেছি, তেমন কিছু চিনি না।" আগন্তুক চাপিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, কহিলেন,—"রজনী-বাবুর বড় মেয়ে বুঝি যোগেনের স্ত্রী?"

শান্তির কর্ণমূল লাল হইয়া উঠিল। সে আঁচলখানা মুখের কাছ বরাবর তুলিয়া লজ্জিত ভাবটা সামলাইয়া লইল, মৃদুস্বরে উত্তর করিল—"তাঁ'র আমিই এক মেয়ে। উনি আমার মামাতো বোন।" বলিয়া অনিলের হাত ধরিয়া সে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। আগন্তুকও আর কোন প্রশ্ন করিলেন না, তাঁহাকে একান্ত বিমনা দেখাইল!

বৈশাখী পূর্ণিমায়, মাদুরার বসন্ত-মণ্ডপ মন্দিরে ঘোর সমারোহ হইয়া থাকে। সে দিন সারা মাদুরা সহরে বড়ই ধূম। সুন্দরলিঙ্গ মহাদেবের বসন্তোৎসবের আজ শেষ দিন, ভিড়ও তাই অতিরিক্ত! মণ্ডপমধ্যে পয়ঃপ্রণালীগুলি গন্ধবারিতে পরিপূর্ণ। প্রস্তরস্তম্ভে তিরুমল ও তৎপূর্ব্ব নয় পুরুষের সস্ত্রীক খোদিত মূর্ত্তির উপর সুন্দর আকারে গ্রথিত পুষ্পমাল্য দোদুল্যমান, দেবালয়ের প্রসিদ্ধ মহামূল্য আসবাবপত্র সংস্কৃত হইয়াছে। সৌন্দর্য্যে, ঐশ্বর্য্যে বসন্ত-মণ্ডপ কয়দিন অমরাবতীর শোভা ধরিয়াছে। চিরপ্রসিদ্ধ এমন উৎসব দেখিবার লোভ ছাড়িতে না পারিয়া বসুমতী একটু অসুস্থ শরীরেই বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। প্রথমে শিবতীর্থের জল স্পর্শ করিয়া দেবদর্শনে যাইতে হয়। পুষ্করিণীর নিকট আসিয়া যোগেন্দ্রের স্ত্রী মণিমালা ও শান্তি ধরিয়া বসিল, এইখানে স্নান করিবে। যোগেন্দ্রনাথ রাগিয়া নালিস করিল, "পিসিমা! শুনতে পাচ্ছেন?"

পিসিমা মৃদু হাসিয়া কেবলমাত্র বলিলেন—"ওদের কথা শোন কেন!"

মীনাক্ষিদেবী ও সুন্দরলিঙ্গের উৎসব-সমারোহ দর্শন ও পূজা সারিয়া ললাটে চন্দন ও বিভূতি-চিহ্ন ধারণ করিয়া অনেক কষ্টে ভিড় ঠেলিয়া যোগেন্দ্র যখন মেয়েদের ফাঁকা জায়গায় আনিয়া দাঁড় করাইল, তখনই মৈত্রগৃহিণীর বেদনাটা বাড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু বাড়িলে কি হয়, হিন্দুর মেয়ে এতটুকু শক্তি থাকিতে পুণ্যের লোভ দমন করিতে পারে না, তিনি যন্ত্রণা চাপিয়া সহস্র স্তম্ভ-মণ্ডপ দেখিতে চলিলেন।

আর্য্য নায়কের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি সহস্র-স্তম্ভ-মণ্ডপের এখনও নয়শত সাতানব্বইটি স্তম্ভ প্রায় অক্ষত আছে। এর নির্ম্মাণকৌশল চিত্রচাতুর্য্য

অসাধারণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভারতের সর্ব্বত্রই কত সুমহান্ কীর্ত্তি এখনও বিগত গরিমার সাক্ষ্য দিতেছে।

তেপ্পমকুলম্ বা টেপ্পা-ট্যাঙ্ক একটি বৃহৎ পুষ্করিণী, এর প্রত্যেক দিক বারশত গজ লম্বা—চারিদিকে উত্তম গ্রেনাইট প্রস্তরের সোপান এবং সর্ব্বোপরি গ্রেনাইট প্রস্তর-নির্ম্মিত এক কলস। স্থানে স্থানে দেব ঘোটক, ময়ূর এবং অন্যান্য পশুমূর্ত্তি সুশোভিত। কলসের মধ্যদিকে বেড়াইবার জন্য একটি প্রশস্ত রাস্তা আছে, তথায় সন্ধ্যাকালে অনেকে বায়ু সেবন করিতে জমা হয়। পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে উপদ্বীপ, উপদ্বীপের চতুর্দ্দিক্ প্রস্তর বাঁধানো, মধ্যস্থলে দ্বিমহল দেবালয় ও চারিদিকে কারুকার্য্য বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেব-মন্দির, মধ্যস্থলে পথ এবং পথের দুইধার নানাবর্ণের লতাগুল্ম পত্র-পুষ্প শোভিত! কয়দিন পূর্ব্বে দেবালয়ের চারিদিক লক্ষ দীপ দ্বারা সজ্জিত হইয়াছিল এবং যেদিন মীনাক্ষিদেবীর সহিত সুন্দরলিঙ্গ মহাদেব এখানে আনীত হইয়া সন্ধ্যাকালে মহাসমারোহের সহিত তেপ্পনে চড়িয়া দ্বীপের চারিদিকে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, যোগেন্দ্রের সহিত ছেলেমেয়েরা সেদিন উৎসব দেখিতে আসিয়াছিল, বসুমতী অসুস্থতার জন্য আসিতে পারেন নাই।

সাদা মার্ব্বেলে ও কষ্টি পাথরে মিলাইয়া গাঁথা প্রাচীরের ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে বসুমতী হঠাৎ বসিয়া পড়িলেন। শান্তি তাড়াতাড়ি মার কাছে ছুটিয়া আসিল—"অসুখ করেছে বুঝি, মা? সুকু সুকু শিগ্‌গির যোগেনদা'কে ডাক। বলাই! ছুটে যা, শিগ্‌গির গাড়ি আন্‌তে বল।"

যোগেন্দ্রনাথ একটু দূরে দাঁড়াইয়া সহসাদৃষ্ট এক বন্ধুর সহিত গল্প করিতেছিল, পিস্‌শাশুড়ীর অসুখের সংবাদে শশব্যস্তে ছুটিবার উপক্রম করিল, বন্ধু তার হাত ধরিয়া বাধা দিলেন—"শোন, শোন—ওঁ'কে এই

রোদে এতটা না নিয়ে গিয়ে আমার বাসাতেই নিয়ে চল, তোমার বাড়ী ত এ মুল্লুকে নয়!"

যোগেন্দ্র কহিল—"কথা মন্দ নয়—তবে কিনা তিনি কি রাজী হবেন? বলে দেখি।"

"গাড়ীটা আমি এখানে আনাই, একটু বুঝিয়ে বলগে।"

বসুমতী সম্মত হইলেন না।

যোগেন্দ্র সকলকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া বন্ধুকে আসিয়া অনুযোগ করিল—"কেন বল দেখি পায়া এত ভারী হয়েছে? বাড়ী মাড়াও না যে বড়!"

বন্ধু কহিল "তোমারই প্রতি করুণায়! ঘরে যাঁদের সঙ্গ পেয়েছ, তাঁ'দের ছেড়ে আমার মুখখানাকে পদ্মফুল বা আমার বাক্য চাঁদ থেকে খসে পড়া সুধার মত লাগ্‌বে কি?"

"না, না, সত্যি যেও, কুইনীন-খেকো ধাত, ঢকাঢক মিছরীর পানা বরদাস্ত হবে কেন? অনর্গল সন্দেশ খেলে নিম ঝোলও মধ্যে মধ্যে মুখ-রোচক হয়।"

বন্ধু হাসিয়া কহিল—"উপমাগুলো দিলে ভালই! এর পরেও যদি-না যাই, তাহ'লে আর কি গাল দেবে, খুঁজে পেলাম না!

বলাই ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"মার ব্যথাটা বড্ড বেড়ে উঠেছে, দিদি বললে ঠাণ্ডা জল আনিয়ে দিন।"

"দেখ ত অন্যায়! মেয়েরা কষ্ট সইবে, তবু জিদ ছাড়বে না।" যোগেন্দ্র বলাইকে লইয়া জলের সন্ধানে চলিয়া গেলে যোগেন্দ্রের বন্ধু বসুমতীর দাসীকে ডাকাইয়া তাঁহাকে বলাইলেন—"আমি সন্তান তুল্য আপনার, আমার বাড়ী পায়ের ধূলা না দিলে বড়ই দুঃখ পাবো।" এর পর বসুমতী আর আপত্তি করিতে পারিলেন না; বলিলেন—"চল

যাওয়াই যাক্। বিদেশে যখন বেরিয়েছি—যা' করাবে তাই করতে হবে।"

মোক্ষদা বলিল—"অ দিদিমণি দাঁড়াও নাগো! আগে জামাইবাবুকে ডেকে নে' আসি।—ওগো মা, ঐ গো, ঐ বাবুটি, ঐ যে নারকেল গাছ-গুলোর কাছে দাঁড়িয়ে, ঐ যে গোরা হেন লোকটি। আহা চেহারাখানি যেন রাজপুত্তুরের মতন না'গা মা? আহা এই লেণ্ডু-মুণ্ডুর দেশে দেশের নোক দেখ্‌লে প্রাণটা যেন জুড়িয়ে যায় গো!"

মোক্ষদার নির্দ্দিষ্ট লোকটিকে দেখিয়া শান্তি আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল—"ও মা! ও যে সেই মিঃ রায়! সেদিন যোগেনবাবুকে ওঁরই কথা ত জিজ্ঞেসা করছিলুম।" উনি বাবাকে জানেন। বসুমতী বার বার অপরিচিতকে দেখিতে লাগিলেন। তাহাকে যেন কোথায় দেখিয়াছেন মনে হইল, কিন্তু সুস্পষ্ট মনে পড়িল না।

মিঃ রায়ের বাসাটি ছিমছাম। সুরম্য ছোট্ট বাগানের মধ্যে পরিচ্ছন্ন ক্ষুদ্র বাঙ্গ্‌লো। বাড়ীতে তিনি একা—অল্প কয়টি ঘরেই সঙ্কুলান হয়। ড্রইং রুমটী পরিপাটিরূপে সাজান। দুই পাশের ঘর দুইটি শয়ন-গৃহ ও লাইব্রেরীরূপে ব্যবহৃত। সর্ব্বত্রই গৃহস্বামীর সৌখীনত্ব ও স্বদেশানুরাগের চিহ্ন প্রকটিত। টেবল-ক্লথ পর্দ্দা বিছানাপত্র হইতে ফটো ফ্রেম দোয়াত কলম নিবটি পর্য্যন্ত সমস্তই দেশী।

মিঃ রায়ের গৃহে কোন বিষয়েই তাঁদের সম্ভ্রম-আতিথ্যের ত্রুটি রহিল না।

দ্বিপ্রহরে রৌদ্রের সময় বসুমতীর বেদনাটা আরও বাড়িল। যোগেন্দ্রনাথ মহা চিন্তায় পড়িল। ডাক্তার কাছে পাওয়া যায় না। বন্ধুর কিছু কিছু হোমিঃপ্যাথি জানা ছিল, সে বলিল—"বল ত দু-এক ডোজ দিয়ে দেখতে পারি।"

যোগেন্দ্র ভাবিতে লাগিল—"পিসিমার সঙ্গে ছেলেখেলা হবে না?"

বন্ধু হাসিয়া কহিল—"জলের গুণটা একবার পরীক্ষা করতে ক্ষতি কি? যখন 'জলন্ত' কিছু পাচ্চো না।"

গৃহস্বামী হোমিওপ্যাথিক বাক্স ও বই বাহির করিল। ঔষধ নির্ব্বাচন ও প্রস্তুত করিয়া যখন ড্রইংরুমে আসিল, তখন সজোরে তাঁর নাক ডাকিতেছে। নিদ্রিতকে সে জাগাইল না। সুপ্রকাশকে ঔষধের গ্লাসটা পাঠাইয়া দিল।

সুপ্রকাশ ঔষধ রাখিয়া মিঃ রায়ের কাছে ফিরিয়া গেল। ইঁহার বন্দুক ও ব্যাটের উপর অনেকক্ষণ ধরিয়া তার লুব্ধদৃষ্টি ঘুরিতেছিল। তাই অপরিচিত হইলেও এদের অধিকারীকে সঙ্কোচ করিতে তার প্রবৃত্তি হইল না। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই তাদের আলাপ জমিয়া গেল। যেহেতু এ বিষয়ে কেহই অসমকক্ষ ছিল না। বিশেষতঃ যখন উড্ডীয়মান পাখীটি একটি অব্যর্থ গুলির আঘাতে নিঃশব্দে মাটিতে শুইয়া পড়িল, তখন সুকুর কৌতুকের সীমা রহিল না। সে লুণ্ঠিত-মস্তক বিস্তারিতপক্ষ বিগতপ্রাণ জীবটিকে ডানা ধরিয়া উঠাইল, সাগ্রহে হত জীবটিকে দেখিতে দেখিতে উহার হন্তাকে প্রশ্ন করিল—"আচ্ছা না মেরে ফেলে কি পাখা বেঁধা যায় না? দিদি তা হ'লে একে পুষতো!" হঠাৎ পাখীটা ফেলিয়া বন্দুক ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল—"আমায় বন্দুক ছুঁড়তে শিখিয়ে দিন না, আমি একটা পাখী মারবো।"

মিষ্টার রায় শশব্যস্তে বন্দুকটা তার হাত হইতে কাড়িয়া লইল—"তুমি যে ছেলে মানুষ, তুমি ত এ বন্দুক ধরতে পারবে না, তোমায় মাদ্রাজ থেকে একটা এয়ার গান্ আনিয়ে দেওয়া যাবে, কি বল? সরে এসো, ঠিক আমার পাশে থেকো, ঐ দেখ, একটা পাখী উড়ে যাচ্চে,

ঐটের উপর তাগ করতে হ'বে, ঐ পড়েছে !" সুপ্রকাশ ছুটিয়া শিকার-করা পাখীটি কুড়াইয়া আনিতে গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঘরে ফিরিয়া মিঃ রায় বলিল—"এস সুপ্রকাশ, মাকে একবার দেখে আসি।"

বাহিরে আসিতেই শুনা গেল, মোক্ষদা দাসী বলিতেছে—"ওমা, এ যে তোমার অন্যায় কান্না, দিদিমণি ! বাড়ীর বাবু পাখী মেরেছে, তা'তে তুমি যে কেঁদে হাট বাধালে ! ছিঃ, চুপ কর, তিনি জানতে পারলে কি মনে করবে—

বসুমতী বলিলেন—"তোমারই বা বাছা ও মরা পাখীগুলো আমাদের সামনে আনবার কি দরকার ছিল ? আহা ! কি সুন্দর পাখীদুটী ! কাঁদবে না ? আমারই কান্না পাচ্ছে ;—ছেলেগুলোর মনে একটু দয়া-মায়াও নেই !"

সহসা বিজয়ীর বিজয়-আনন্দ গভীর অনুতাপের লজ্জায় পর্য্যবসিত হইয়া গেল। অন্তরালবর্ত্তী একখানা বেদনাক্লিষ্ট মুখের ছায়া কল্পনানেত্রে ভাসিয়া উঠিয়া বুকের মধ্যে একটা ধাক্কা মারিল। এদিকে সুপ্রকাশের সহিত মিঃ রায়কে প্রবেশ করিতে দেখিয়া শান্তি চোখ মুছিতে মুছিতে পলাইয়া গিয়াছিল।

১১

রামেশ্বর যাত্রীর ভিড়ে সহরে অসুখ বিসুখ আরম্ভ হইল। বসুমতী সহরের বাহিরে স্বাস্থ্যকর জায়গায় বাড়ী লইয়াছিলেন, তথাপি ছেলে মেয়ে লইয়া রোগের মুখে থাকিতে সাহস হয় না। যে ভয়ে বাড়ী ছাড়িয়াছেন, কি সাহসে সেই রোগের মুখেই বসিয়া থাকিবেন ? এদিকে

রজনীনাথও লিখিলেন—"আমি তোমাদিগকে এইবার আনিতে যাইব মনে করিতেছি, সহরে আর প্লেগ নাই।"

যোগেন্দ্র সপরিবারে শাশুড়ীর অতিথি, মিঃ রায়ও আজকাল এ পরিবারে অপরিচিত নয়, এখন সে এদের মধ্যে বেশ একটি স্থান দখল করিয়াছে। সকলেই এখন প্রতি সন্ধ্যায় তার আগমন আগ্রহে প্রতীক্ষা করে, দৈবক্রমে একদিন না আসিলে সকলের প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে।

ছেলে মেয়েরা অল্পেই বশ হয়, বসুমতীও নূতন পাওয়া ছেলেটির জন্য বিকাল হইতে ছটফট করেন, যতক্ষণ না নীরদ আসিয়া তাঁর স্বহস্ত প্রস্তুত মিষ্টান্নগুলি সুপ্রকাশের সহিত কাড়াকাড়ি করিয়া খায়, তাঁর আরাম হয় না। আহার্য্যের সমালোচনায় ও মায়ের দাবী লইয়া যখন ভাই-দু'টিতে হাতাহাতির উপক্রম ঘটে, অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে তখন তিনি উভয়ের প্রতি চাহিয়া দেখেন। শান্তি ঝগড়া বিবাদ ও পাখী শিকার ছাড়া অন্য সকল সময় তাঁদের সহিত সানন্দে যোগ দেয়। মধ্যে মধ্যে বাগানে চড়িভাতির ব্যাপারে এবং বৈকালিক ভ্রমণে সত্যকালের ভগ্ন-স্তূপ, পুরাতন দেবালয়, অথবা বিশিষ্ট উদ্যান দর্শনে তারা যোগেন্দ্র অপেক্ষা মিষ্টার রায়ের সাহায্যই পছন্দ করিত। যোগেন্দ্র ভারি কড়া সমালোচক। সে মুগের ডালের ভুনী খিচুড়ীতে আঁকা গন্ধ বা নৌকা বিহারকালে তার ধারের দিকে ঝুকিয়া পড়া কোনটাই সহ্য করিতে পারে না, অথচ মিঃ রায় খিচুড়ীতে আঁকা গন্ধ ছাড়িয়া পুড়িয়া অঙ্গার হইয়া গেলেও সুপ্রসন্ন মুখে তারই মধ্যে নীর ছাড়িয়া ক্ষীরটুকুই গ্রহণ করিত! যোগেন্দ্র যখন তীব্র সমালোচনা করে—"সরস্বতি! মিথ্যা এ বিড়ম্বনা ভোগ কেন করছ? তোমার লক্ষ্মী দিদিকে কাজটা ছেড়ে দিয়ে টেনিসনের একটা কবিতা, রিসাইট করে শোনাও না, কি বল হে, রায় মহাশয়?"

মিঃ রায় তখন হাসিমুখে বলিয়া উঠে—"ও পেটুকের তো অন্নে কুলোবে না, ওর জন্যে আর একটা হাঁড়ি চড়াও তো। মতলব বুঝতে পারছ ত? রান্নার দোষ দিয়েই আর এক হাঁড়ির বন্দোবস্ত করে নিচ্চে!"

যোগেন্দ্র এ অপবাদ সহ্য করে না! রাগিয়া বলে—"ঐ তো! মিথ্যা খোসামোদে মেয়েদের বিবি বানাচ্ছ তোমরাই। তোমাদের মাথায় চড়ে সরস্বতী দিদিমণিরা মা লক্ষ্মীর সঙ্গে আড়ি দিচ্চেন।"

মিঃ রায় হাসিয়া বলে—"আহা! তুমি কার চেয়ে খোসামোদে কম যাও! গিন্নিকে লক্ষ্মীর আসন দিয়ে ফেল্লে?"

এই সব নানা কারণে শান্তি রায়কে পছন্দ করিত। বিশেষ—সম্পর্কের দোষে যোগেন্দ্র তাকে যে সব তামাসা করিত মণিমালা শুদ্ধ তাই লইয়া যেরূপ ক্ষ্যাপাইত, তাতে যোগেন্দ্রের সঙ্গে তার বনিত না। অথচ মিঃ রায়কে সময় সময় আশ্চর্য্য হইয়া দেখিত তিনি যেন তাঁর বাবার মনের কথা সমস্ত পাঠ করিয়া আসিয়াছেন,—যেন তিনি তাঁর একটি প্রিয় শিষ্য! বসুমতীও এই অপরিচিতকে স্নেহের সহিত বিশেষ একটু শ্রদ্ধা করিয়াছিলেন। বুঝিয়াছিলেন ছেলেটি তাঁর স্বামীর বিশেষ প্রীতি-পাত্র হইবার উপযুক্ত। প্রশ্ন করিয়া জানিয়াছিলেন, দেশে অনেকেই আছেন, বিষয় সম্পত্তিও কিছু আছে, তাঁর বনিবনা হয় নাই, চলিয়া আসিয়াছেন, জন্মভূমি দর্শনে যাইবার ইচ্ছা, শীঘ্রই যাইবেন। এখানের অংশীদারদের সঙ্গে সমবায়ে কারবার ভালই চলিতেছে। নাম নীরদ রায়।

বসুমতীর ও শান্তির পত্রে দূর দেশের এই অপরিচিত বন্ধু ও অজ্ঞাত ভক্তের বিষয় জানিয়া রজনীনাথের কৌতূহলের সহিত শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছিল, একলব্যের মত কে' তাঁর এই গোপন-ভক্ত!

প্রথম আষাঢ়ের আকাশ সেদিন আসন্ন বর্ষণের জন্য মেঘ বিদ্যুৎ লইয়া রমণীয় সাজে সাজিয়া আসে নাই! সেই একঘেয়ে বিস্তৃত আনীল আকাশপট অগ্নি-গোলকটাকে নদী নীরে বিসর্জ্জন দিয়া মাত্র স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছে।

এখানে অসহ্য গরম প্রায় পড়ে না। দিনের বেলা গ্রীষ্মবোধ হইলেও সন্ধ্যায় সেটা কাটিয়া যায়, আজও ফুলগাছগুলাকে নাড়াইয়া ঝিরঝিরে বাতাস বহিতে আরম্ভ করিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলেও সেদিন মিঃ রায় আসিল না। যোগেন্দ্র তার জন্য অপেক্ষা করিয়া সুপ্রকাশকে লইয়া বেড়াইতে গিয়াছে।

গাড়ী-বারান্দায় লতাবিজড়িত একটা থামের গায়ে হেলান দিয়া শান্তি দাঁড়াইয়াছিল। আজ সহসা শান্তির হাসিমুখ ম্লান হইয়া গিয়াছে। সে ভাবিতেছিল, আর কখনও মিঃ রায়ের সঙ্গে দেখাও হইবে না!—কেমন করিয়া হইবে? ভাবিতে গিয়া শান্তির মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল, আপন নির্ব্বুদ্ধিতার লজ্জায় সে যেন মরিয়া গেল! কি রকম লোক সে? বাড়ী গেলে নিজেদের বাড়ী ঘর পাখী পায়রা হরিণ বিড়াল কুকুর পাচ-কড়ি হরে বিধুর মা হরিদাসী আর তার বাবাকে দেখিতে পাইবে, এ না ভাবিয়া সে ভাবিতে বসিল, বাড়ী গেলে কোথাকার কে মিঃ রায়কে দেখিতে পাইবে না? সহসা পশ্চাৎ হইতে নীরদ ডাকিল—"শান্তি!"

"যান্ আপনার কাজ বুঝি আর শেষ হয় না? না এলেই হ'ত!"

নীরদকুমারের ললাট হইতে কর্ণমূল আরক্ত ও উত্তপ্ত হইয়া উঠিল।

আনন্দের উত্তেজনায় সবেগে বলিয়া উঠিল—"আস্‌তে আমার দেরী হয়ে গেছে শান্তি—তুমি আমার প্রতীক্ষা করছিলে ?"

"বাঃ, করি নি ? যোগেনদা'ও অনেকক্ষণ বসেছিলেন, রাগ করে এই একটু আগে বেড়াতে চলে গেলেন। সুকুও তাঁর সঙ্গে গেছে।"

মনের অদম্য হর্ষোচ্ছ্বাস গোপন করিতে না পারিয়া নীরদকুমার একটু কাছে আসিয়া পুলক-কম্পিত ব্যগ্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"আমার কৃতজ্ঞতা কেমন করে তোমায় জানাব শান্তি ?"

শান্তি তার আগ্রহাতিশয্যে লক্ষ্যমাত্র না করিয়া স্বাভাবিক মিষ্ট হাসি হাসিয়া কহিল—"ঘরে আসুন—দাঁড়িয়ে থাকবেন কতক্ষণ ?" গৃহ প্রবিষ্ট হইয়া নীরদকুমার আসন গ্রহণ করিল না, বলিল—"আজ যাই, কাল থেকে খুব সকাল সকাল আসব ? অনুমতি পেলে দুবেলাই আসতে রাজী।" —শেষের কথাগুলি পরিহাস ছলেই যেন বলিতেছে, এই ভাবেই বলিল।

শান্তি নতমুখে কহিল—"কালই আসবেন—পরশু আমরা তো চলেই যা'ব। বাবা টেলিগ্রাম করেছেন, নিতে আসছেন, কাল সকালেই পৌছুবেন।"

নীরদকুমার ঈষৎ বিস্মিত ও ব্যথিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"সে কি ? তিনি এসে দুদিনও থাকবেন না ?"

"সেই রকমই তো লিখেছেন, বাবার যে বড্ড কাজ !" বলিয়া শান্তি ক্ষুদ্র একটি নিশ্বাস ফেলিল।

সেই নিশ্বাসটুকু ক্ষুদ্র হইলে কি হয়,—নীরদকুমারের কর্ণ সে অতিক্রম করিল না। সচকিতে চাহিয়া দেখিল, তার পর কিছুক্ষণ কি ভাবিতে লাগিল। এই অবসরে শান্তি বলিল—"আপনার সঙ্গে আর হয় তো আমাদের দেখা হ'বে না।"

বলিতে বলিতে তার সপ্রতিভ দৃষ্টি লজ্জায় পাতা ঢাকা হইয়া আসিল।

কে' জানে, কোন্ অনির্দ্দেশ্য ভাবের আবেশে গাল দুটীর ঈষৎ রক্তিমা সুস্পষ্টতর হইয়া উঠিল। কেমন যেন মনে হইল কথাটা বলা হয় তো ঠিক হইল না। মিঃ রায় ঘরের উজ্জ্বল আলোকে লজ্জিতার অতি সুন্দর মুখ অতৃপ্ত নেত্রে দেখিতে ছিল, মৃদু হাসিয়া উত্তর করিল—"যদি চাও—তা হ'লে আবার দেখা হ'বে।—হ'বে কি শান্তি ?"—যে স্বরে কথাগুলা উচ্চারিত হইল, তাহাতে সংসার অনভিজ্ঞা বালিকা শান্তির সরল হৃদয়-তন্ত্রীতেও সবলে একটা ঘা' না মারিয়া পারিল না। সে কিছু না বুঝিলেও তার নত দৃষ্টি আরও নত করিয়া দিল, উত্তর দিতে পারিল না। নীরদকুমার সাগ্রহে তার লজ্জাকুণ্ঠিত মুখের দিকে চাহিয়া এবার গম্ভীর-স্বরে কহিল—"দেখা আবার হবেই—শান্তি !—নিশ্চয়—নিশ্চয়ই আমাদের দেখা হ'বেই হ'বে—না' হ'লে—আজ চল্লাম—না—মার সঙ্গে দেখা করে আসি—মাকে দর্শন করে না গেলে চোখে ঘুমই আসবে না, সারারাত জেগে ছটফট কর্ব্বো।"

সুপ্রকাশ আসিয়া দিদির কাছে শুনিল, মিষ্টার রায় আসিয়া চলিয়া গিয়াছেন। শুনিয়া সে জ্বলিয়া গেল, ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল—"যেই বাড়ী থেকে বেরিয়েছি, অমনি এলেন! তাও ছেলে একটু দাঁড়াতে পারলেন না! কাল আমি এমন ঝগড়া করবো, মিঃ রায় আমার চাইতে তোমায় ঢের বেশী ভালবাসেন, সে তুমি যা'ই বল—"

শান্তি তাড়াতাড়ি ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"ছিঃ, ও কথা বলতে নেই সুকু!" সুকু দিদির কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইল সেই সঙ্গে অত্যন্ত আমোদও বোধ করিল। চেঁচাইয়া বলিল—হ্যা বলতে নেই, খুব আছে ? আমায় তিনি জিনিষ-টিনিষ দিলে কি হয় তোমার সঙ্গে বেশী বেশী গল্প করেন না ? আমি যেন কিছু বুঝিনে ?"

শান্তি বিপদে পড়িল—মিঃ রায় তাকে ভালবাসেন! তা' বাসিলেই

বা ক্ষতি কি? এতে তার লজ্জার কি আছে?—কিন্তু আজ যে সবই নূতন!—সে'ও—তিনিও! আজই সে বুঝিয়াছে—কে' জানে ছাই পাঁশ কি-ই বা বুঝিয়াছে—তাও জানে না—শুধু বুঝিয়াছে তাঁকে ছাড়িতে মনে বড় বাজিবে! এও কিন্তু বুঝে, একজন নিঃসম্পর্ক লোকের জন্যে এ বেদনা তার পক্ষে অসঙ্গত।

সে তাঁর কেউ নয়, একথা ভাবিতে শান্তি ব্যথা পাইল। এ কথাটি মনে করিতেই বক্ষখানা যেন ভাঙ্গিয়া গেল। সত্যি, তারা একেবারেই নিঃসম্পর্ক—পর! এর পর দেখা সাক্ষাতের এতটুকু দাবীও তাদের নাই, তবে কি সাহসে তিনি অমন জোর করিয়া বলিলেন, "আবার আমাদের দেখা হবে?" আচ্ছা, নাই বা দেখা হইল? পৃথিবীতে কতই লোক আছে তিনিও তাদেরই একজন, তাঁর সঙ্গে কখনও যদি দেখা না হয় ভাবিয়া শান্তি এত অস্থির হইতেছে কেন? আপনার লোক যোগেনদা'র জন্য তো এরূপ হইতেছে না? এ কিন্তু লজ্জার কথা! শান্তি এমন এক চোখো হইল কেন? রাত্রে বিছানায় পড়িয়া জাগিয়া জাগিয়া এই সকল কথা সে ভাবিল; কিন্তু এই সব দুরূহ প্রশ্নের উত্তর তার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার মধ্যে খুঁজিয়া পাইল না—সমস্যা জটিল রহিয়া গেল।

রজনীনাথ আসিয়া বলিলেন—"কালই যেতে হবে, মাদ্রাজে দিন কয়েক থেকে ফিরব, যোগেন! তোমরাও চল।"

যোগেন্দ্র মাথা চুলকাইয়া কাশিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল—"আমি কি যেতে পার্ব্বো! ছুটী কি দেবে!

রজনীনাথ কহিলেন—"দেবে না তাই বা জানলে কি করে? আজই দরখাস্ত করে দাও, না হয় আমি আর একটা দিন অপেক্ষাই কর্ব্বো।"

শান্তি ও সুপ্রকাশ তাদের কয়মাসের অপূর্ব্ব সঞ্চয় ও অভিজ্ঞতা পিতাকে প্রদর্শন করিয়া অল্পক্ষণেই নিঃস্ব হইয়া পড়িল। রজনীনাথ পুত্রের

ফরমায়েস মত এয়ারগানটা তাহাকে দিয়া কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুই যে কিছু আন্‌তে বলিস্ নি বুড়ি? রাগ করেছিস্?

শান্তি হাসিয়া কহিল—"না, বাবা! বাড়ীই তো যাচ্চি, তা' ছাড়া আমার তো সবই আছে, কি আর আন্‌তে বলব?"

"ইস্, তুই যে মস্ত লোক হয়েছিস্ রে! এমন কথাটা তো এ পর্য্যন্ত কেউ বলে নি!—কিন্তু একটা জিনিষ যা তোর নেই, আমি কিনে রেখেছি, কি বল্ তো?"

সুপ্রকাশ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"পুতুল—আবার কি। বোধ হচ্চে খুব বড় মোমের কি কাঁচের ডল পুতুল—সে তো দিদির নেই, হ্যাঁ বাবা! তুমি যে বিলিতি জিনিস কিনলে?"

রজনীনাথ হাসিয়া উঠিলেন, হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"সুকু হেরে গেলি! না, পুতুল নয়!"

শান্তি চিন্তিতমুখে একটু হাসিয়া ভাইটির ভুল সংশোধন করিয়া লইল—"সুকু মনে করে আমি যেন এখনো বড় হই নি, তাই বল্‌চে পুতুল!—কি বল না, বাবা?"

"চরকা।"—চরকা শুনিয়া সুকুর চোখ বড় বড় হইয়া গেল। শান্তিও বিস্ময়ে চোখ মেলিয়া বলিয়া উঠিল—"চরকা কি বাবা? যাতে কাপড় বোনে?" সস্নেহে কন্যার পিঠ চাপড়াইয়া পিতা হাসিয়া কহিলেন—"চরকা কা'কে বলে তাই জানিস্ না! চরকায় কাপড় বোনে না—সূতো কাটে!—তাঁতে কাপড় বোনে। তুই সূতো কাটতে শিখবি? সেকালের সব মেয়েরাই ঘরে ঘরে সূতো কাটত, সেই সূতোয় তাঁতিরা কাপড় বুনে দিত।"

শান্তি সানন্দে মাথা হেলাইয়া সম্মতি জানাইল, সোৎসাহে বলিল—"আমিও খুব চেষ্টা করে সূতো কাটতে শিখবো—বাবা! সুকুকে ভাই-

ফোঁটায় যদি নিজের কাটা স্থতোর কাপড় পরাতে পারি—কি মজাই হয়।"

রজনীনাথ তার মস্তকে হাত রাখিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন—"তুই পারবি মা!"

১৩

নীরদকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ম রজনীনাথ বিশেষ ব্যগ্র থাকিলেও সাক্ষাৎ ঘটিল না, নীরদ আসিল না। এ ঘটনা অপ্রত্যাশিত। সকলেই আশ্চর্য্য হইল। বস্থমতী খবর লইতে পাঠাইলেন—দরওয়ান খবর দিল—"তিনি বাড়ী নেই! সকাল বেলা বেরিয়ে গেছেন, রাত্রেও হয় তো ফিরবেন না।"

বস্থমতী একান্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন—"কাল তো কিছুই বললে না! আমি যে তার পছন্দসই খাবারগুলি তৈরি করলাম।"

যোগেন্দ্র বলিল—"নিশ্চয় খুবই জরুরী কাজে যেতে বাধ্য হয়েছে। নইলে পিসেমশায়ের সঙ্গে দেখা না করে চলে যায়!"

রজনীনাথ একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন। অজ্ঞাত ভক্তটিকে দেখিবার জন্ম তিনিও অনেকদিন আগ্রহ পোষণ করিতেছিলেন। সে দিনের আনন্দটা মাত্রাহীন হইয়া রহিল।

রাত্রে শান্তির বিবাহ সম্বন্ধে আবেদন শুনিয়া চিন্তিতভাবে অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া রজনীনাথ কহিলেন—"এ হবার নয় বস্থ! অনেক আগেই আমি শ্যামাকান্ত চৌধুরীকে কথা দিয়েছি। বলতে গেলে তিনি শান্তির জন্মেই শুধু হেমকে পোষ্যপুত্র নিলেন, সে' কি আর বদলায়?"

বসুমতী বলিলেন—"সে কোন কাজের কথা নয়! সে রকম কথা তো ছেলেমেয়ে ঘরে থাকলেই হয়ে থাকে। এ ছেলেকে তুমি তো এখনও দেখ নি, একটী দিন যদি কাছে রাখ, তা'হ'লে আর কোন কথাকেই বড় মনে হবে না। ঠিক তুমি যেমনটি পছন্দ কর, ভগবান যেন তেমনইটি এনে ওর জন্যে জোড়া মিলিয়ে রেখেছেন! বাছার আমার রূপটাই কি সোজা! তা' ছাড়া এ বিয়েতে মেয়েও আমার বেশী সুখী হবে। লক্ষ্মীপুরের ওঁরা বড়লোক সত্যি, কিন্তু সেখানে পড়লে তারা মেয়ে পাঠাবে না, যেভাবে একে তুমি গড়ে তুল্লে সে সবই ওর জীবনে ব্যর্থ হবে। ছেলেও যে কেমন দাঁড়াবে কে জানে? আমি বুঝেছি দুজনেই মনে মনে দুজনকে চায়।"

রজনীনাথ বিদ্রূপের সহিত হাসিয়া উঠিলেন, কহিলেন—"ঐ একটা ফ্যাসান উঠেছে আজকাল! নভেল পড়ে পড়ে তোমরা সংসারটাকে উপন্যাসের চক্ষে দেখ্‌ছো বসু! তোমার আমার যখন বিয়ে হয়, আমাদের তো ভালবাসা হয় নি, তার এমন কি মন্দ ফল ফলেছে? শান্তির বাপ মা যে পথে চলেছে, তার পক্ষে সেই পথই ভাল। শ্যামাকান্ত চৌধুরীর একান্ত সাধ শান্তিকে ঘরে আনবেন। তাঁর ছেলে বিনোদ নিরুদ্দেশ, এ পর্য্যন্ত কোন খবর নেই, রেল লাইনে কাটা পড়া ছেলেটি যে বিনোদ সে ত আমরা প্রমাণ না পেয়ে ক্ষ্যান্ত হইনি, চৌধুরীকে সবাই লুকিয়েছিলেম, কিন্তু ছেলেটিকে স্বচক্ষেই তো দেখেছি বিনোদ ছাড়া সে আর কেউ নয়। গায়ে তার কোট, ঘড়িও তার। সেই জন্যেই চৌধুরী যখন শান্তিকে পাবার জন্যে তাঁর ভাইপো হেমেন্দ্রকে দত্তক নিলেন, আমি বাধা দিই নি। তাঁর কাছে এর পূর্ব্বেও স্বীকার করেছিলেম, যদি বিনোদ না ফিরে আসে, তা হ'লে আমি শান্তিকে তাঁ'র কন্যারূপে তাঁকে দেবো। সেটা অবশ্য খাতিরেই বলা, তবু বলেছি যখন, তখন কথা ফেরে না।

শ্যামাকান্ত চৌধুরী সেই দাবীই তুলেছেন। সে দিন তাঁ'র বর্ত্তমান পুত্রকে নিয়ে এসেছিলেন, আমিও তাঁকে ফের পাকা কথা দিয়ে ফেলেছি।"

বসুমতী অধোমুখে বসিয়া রহিলেন। কয়মাস ধরিয়া তিনি যে আশা মনের মধ্যে সুদৃঢ়ভাবে পোষণ করিতেছিলেন, বুঝিলেন, তা পূর্ণ হইবার আশা নাই। মনে অত্যন্ত আঘাত লাগিল। তিনি কি বুঝেন না সেই মাতৃহীন কি গভীর শ্রদ্ধায় তাঁকে সমস্ত হৃদয় দিয়া মা বলিয়া জড়াইয়া ধরিয়াছে? সে ভক্তি ভালবাসা যে পরের ছেলের কাছে পাওয়া উপকথার চেয়েও অদ্ভুত!

রজনীনাথ বলিতে লাগিলেন—"দুঃখ করো না বসু! ঈশ্বর যা' করেন ভালই হয়। ভেবে দেখ, শ্যামাকান্ত মা শান্তিকে কি ভালই বাসেন। আমাদের লতি যেমন আদরের, তার চাইতেও বেশী আদর সে পাবে। ছেলেটিও দেখতে শুনতে স্বভাবে সব রকমে ভাল! নিশ্চয়ই লতি এতে সুখী হ'বে। তা ছাড়া—আমি কি ভুলতে পারি, শ্যামাকান্ত চৌধুরী যাঁ'র দয়াতে আমার এই সমস্ত সুখ সম্পদ মান যশ, যাঁ'র সাহায্য না পেলে দরিদ্র রজনীনাথের আজও সেই দারিদ্র্যের মধ্যে থাকা অনিবার্য্য হ'ত—আজ আমার দু'টো টাকা হয়েচে বলে কি আমি আমার সেই অন্নদাতাকে উপেক্ষা কর্‌তে পারি? তিনি দয়া করে তাঁ'র আশ্রিতের মেয়েকে কোলে নিতে চাচ্চেন, কেমন করে না দোব? আমাদের এ অগ্নিপরীক্ষা, এই সুযোগে একটুখানি ঋণ পরিশোধ যদি না করব, তবে করব কবে?"

পরদিন সকালেও নীরদকুমার আসিল না দেখিয়া রজনীনাথ যোগেন্দ্রকে বলিলেন—"কৈ যোগেন, তোমার বন্ধু তো আজও এলেন না। আমাদের অবসরও ত সংক্ষেপ হয়ে এলো, তাঁ'র সঙ্গে আর দেখা হ'ল না!"

যোগেন্দ্র চিন্তিতমুখে গোঁফের প্রান্ত মুচড়াইতে মুচড়াইতে বলিল—"তা'ই তো! না হয় আসুন, পর্ব্বত যখন এল না, তখন মহম্মদেরই যাওয়া ভাল।"

নীরদকুমারের ভৃত্য সেদিনও কুণ্ঠিতভাবে জানাইল, তার মুনিব এখনও ফেরেন নাই। ইহাও সে জানাইতে ভুলিল না, যে সে জন্য তাঁদের চা চুরুট, এমন কি তামাক এবং মিষ্টান্ন অবধি পাইতে বিলম্ব হইবে না। যোগেন্দ্র ভ্রূকুটি করিয়া কহিল—"নিকুচী করেছে তোর চা চুরোটের।"

মাদুরার দ্রষ্টব্য স্থান দেখিয়া বাড়ী ফিরিবার সময় আর একবার মিঃ রায়ের খবর জানিয়া আসিতে ভুলিলেন না। একই ফল সেই। বিস্ময়-বিমূঢ় যোগেন্দ্র পুনঃ পুনঃ জানাইল, এমন অভাবনীয় কাণ্ড সে কল্পনাও করিতে পারে না! স্বেচ্ছায় সে এ কাজ করে নাই। রজনীনাথের সহিত সাক্ষাতের জন্য সে নিজেই বিশেষ উৎসুক ছিল এ কথা সে ভালরূপে জানে। বৎসরের অভিজ্ঞতায় বাক্যে ও কার্য্যে এমন সমান মিল রাখিয়া চলা লোক নাই। রজনীনাথ বলিলেন—"লোকটা স্বদেশভক্ত তা'তে সন্দেহ নেই! ওর সেই শিল্পবিদ্যালয় খোলবার কি হ'ল?"

যোগেন্দ্র ঔদাস্যের সহিত উত্তর দিল—"টাকা উঠল না, কেউ গ্রাহ্য করলে না। কিন্তু সে আশা ছাড়ে নি, বলছিল, শীঘ্রই একাজে সে নাকি যথেষ্ট সাহায্য পা'বে। একটা কথা বলব ভেবেছিলুম—শান্তিকে সে বিয়ে করতে ইচ্ছুক। আর আমরাও মনে করি সে ইচ্ছা তা'র অসঙ্গতও নয়! শান্তির সে যোগ্য পাত্র।"

রজনীনাথ বিষণ্ণভাবে কহিলেন—"সে হবার নয়, যোগেন! হ'লে হয় তো ভালই হ'ত—বুড়ি যে শ্যামাকান্ত চৌধুরীকে অনেকদিন থেকেই দেওয়া আছে। সেও দিব্যি ছেলে।"

যোগেন্দ্র বন্ধুর হইয়া ওকালতি করিবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু সূচনাতেই

পরাজিত হইল। তবু সে মনে মনে সহস্রবার পলাতক বন্ধুকে ‘নির্ব্বোধ’ বলিয়া গালি দিতে ছাড়িল না। সে যদি এই সঙ্গীন সময়েও রজনীনাথের নিকট আসিয়া শান্তির পাণি প্রার্থনা করিত, যোগেন্দ্রনাথের দৃঢ় বিশ্বাস তাহা হইলে শ্যামাকান্ত চৌধুরী ও তাঁর ‘দিব্যি ছেলে’ বিনা তর্কেই পরিবর্জ্জিত হইতেন।

ভাবিয়া চিন্তিয়া ঘন ঘন গোঁফে মুচড় দিয়া, ছিলিমের পর ছিলিম পুড়াইয়াও সে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। একবার ভাবিল, বোধ হয় সে শান্তিকে সত্য সত্যই ভালবাসে না, নইলে এত বড় সুযোগ কেউ ছাড়ে!

১৪

সকালবেলা ভাঁড়ারের দালানে কুটনা কুটিতে কুটিতে মণিমালা বলিল—"শান্তি ভাই! সত্য করে বল দেখি ভাই, তুই নীরদকে ভালবাসিস্ কি না?"

শান্তি বলিল—"তুমি বুঝি বাস?"

মণিমালা হাসিয়া বলিল—"আমার ভালবাসার লোক নেই নাকি, যে আমি তোর নীরদকে ভালবাস্‌তে যাবো?"

"আমারই বা কি এমন ভালবাসার লোকের অভাব ঘটেছে?"

"ওমা তোর আবার ভালবাসার লোক কি'নি হয়েছেন, শুনি?"

"কেন, বাবা মা সুকু অনিল তুমি তোমার বর, ভরু নিরু টেবি মেনি মোক্ষদা হরিদাসী—"

"পেঁচার মা, বাগ্দিবুড়ি, ময়রাবুড়ো—"

"দূর! তুমি ময়রাবুড়োকে ভালবাসগে যাও,—আমি ওকে চিনিই নে।"

হাসিয়া মণিমালা গড়াইয়া পড়িল, কহিল—"পোড়ারমুখী যেন নেকি! আমি যেন সেই ভালবাসার কথাই বলছি? এত বই পড়েছেন, আর এই কথাটা বোঝেন না, এ নাকি আমি বিশ্বাস কর্‌বো? সত্যি বল্ ওকে তোর বিয়ে করতে ইচ্ছে হয় না? আমার গায়ে হাত দিয়ে দিব্যি কর্।"

শান্তির মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। বিকশিত পুষ্পের মত সেই রাঙ্গা মুখ লইয়া সে বিপদে পড়িল। মুখ নত করিয়া জলের মধ্য হইতে ডাল্‌নার আলুগুলা থালায় তুলিতে তুলিতে জোর করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল— "তুমি বিশ্বাস না করলে ত বড় বয়েই গেল! আমি যেন তোমায় মাথার দিব্যি দিয়ে বিশ্বাস করতে বলছি?"

"আচ্ছা, তবে আমি পিসিমাকে বলিগে যাই, তুই তাঁকে বিয়ে করতে চাস্, তুই তাঁকে ভাল—" শান্তি চমকিয়া মণির হাত ধরিয়া ফেলিল। রাগ করিয়া একটু তীব্রভাবে বলিল—"মণিদি? ছি, ছি, মা কি মনে কর্বেন। ছি, ছি! আজকাল তোমরা কিই যে সব যা'তা বলতে আরম্ভ করেছ।"

মণিমালা শান্তির মুখের দিকে চাহিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সত্যই সে কিছু আর বসুমতীকে বলিতে যাইতেছিল না, আর তা'ই যদি বলে, তা'তেই বা সে এত লজ্জা পাইল কেন? ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিল— "তুই যেমন একটা পাগলী! ঐ কথায় রাগ হ'য়ে গেল? কিন্তু ভাই, যা'ই বলিস্, তিনি যে তোকে বিয়ে করতে চান—তিনি যে তোকে ভালবাসেন, তা'তে সন্দেহ নাস্তি। ইনি বলছিলেন, আজ পিসেমশাইকে বলবেন।"

সন্ধ্যা যখন বেশ ঘোর হইয়া আসিয়াছে, রজনীনাথ যোগেন্দ্রের সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন, সুকুও সঙ্গে গিয়াছে। ঘরে বসিয়া অনিলকে লইয়া শান্তি গল্প বলিতেছিল। মণিমালা আসিয়া কহিল—"কি হচ্ছে তোদের? গল্প? আমিও একটু শুনি?" শান্তি বলিতে লাগিল, মণি গল্প না শুনিয়া ভাবিতেছিল, নীরদ কাল আসে নাই, আজও আসিল না! এর অর্থ কি?

যোগেন্দ্রের কথা মণির সঙ্গত মনে হইতেছিল। সে বলিয়াছে, হয় তো কোন প্রকারে শান্তির অন্যত্র বিবাহের সংবাদ পাইয়া আত্মাভিমান-বশে দূরে সরিয়া গিয়াছে। না হয়, শান্তিকে ভালবাসে নাই। এও কি সম্ভব? চুম্বক লোহাকে কাছে পাইলে আকর্ষণ করিবে, এই তো তার ধর্ম্ম! কুমারীর প্রতি অবিবাহিত যুবকের এ আকর্ষণ কি শুধু সৌহার্দ্দ আর কিছুই নয়? নিশ্চয়ই প্রথম কারণটাই বেচারাকে নিরুদ্দিষ্ট করিয়াছে!

শান্তি মণিমালার মুখেই শুনিল, দেশে ফিরিয়া তার বিবাহ। জ্যেঠা মহাশয় তাঁর স্নেহভারাকুল নিরানন্দ হৃদয়-রাজ্যের শূন্য সিংহাসনে যাকে স্থাপন করিয়াছেন, সে তার জন্য নির্ব্বাচিতা। মণি বলিল—"শান্তি ভাই, ক্ষমা করিস্।"

শান্তি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল—"কা'কে?"

"কা'কে আবার?—আমাকে।"

"তোমাকে? কিসের জন্যে? কি করেছ?"

"তোকে অন্যায় তামাসা করেছি—তা, ভাই, আমি ত জানতুম না যে তুই অন্যের বাগ্দত্তা, তা কি কর্ব্ব বল? ওহো! তাই বুঝি বলা হচ্ছিল ভালবাসার লোকের আকাল পড়ে নি?"

"না, আমি তোমায় ক্ষমা কর্ব্বো না।" বলিয়া শান্তি হাসিতে লাগিল।

"না করলি তো বড় বয়েই গেল। ভাল মানুষের কাল নেই। যা, তোর ক্ষমা চাইনে। ইস্ কথাটা বড্ড গায়ে লেগেছে!"

শান্তি উত্তর না করিয়া বর্ণিত গল্প পুনরারম্ভ করিল—"তার পর শিয়াল করলে কি, বউটাকে নিয়ে না, একটা ছুতোরের বাড়ী গেল। গিয়ে দেখে, না—"

মণি বলিল—"এত ছেলেমানুষিও তোর আসে! তুই কি চিরকালই খুকি থাকবি?"

শান্তি হাসিয়া কহিল—"কেন ভাই, আমি কি' বুড়ো? আমি তো তোমার চেয়ে তিন বছরের ছোট, ভাই!"

"আয় না ভাই, আমায় সেই গানটা শেখাবি। তোর ভগ্নীপতি রাগ করছিলেন, বলছিলেন—"তুমি ভারি মূর্খ, কিছু শিখতে পার না। শান্তি কেমন সুন্দর বাজায়, আর তোমার হাতে বাজনা কাঁদে।"

শান্তি খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, হাসিতে হাসিতে বলিল—"তোমায় বাজনা শেখান ভাই আমার কর্ম্ম নয়! যোগেনদা নিজেই যেন শেখান।"

মণি অভিমান করিয়া ঠোঁট ফুলাইল—"কেন, বলতো আমি কি এতই মুখ্যু নাকি? তুই ভাল করে শেখাস্ না তাই তো শিখ্‌তে পারি নে, আজ মন লাগিয়ে শেখা দেখি।"

তখন বাজনা-শেখানর চেয়ে, গল্প বলার উপরই শান্তির আগ্রহ। দায়গ্রস্তভাবে বাজনার ডালা উঠাইয়াই রক্ষা পাইয়া গেল। সেই সময় জুতা পায়ের শব্দ হইল। এ শব্দ তাদের অপরিচিত নয়, মণিমালা ছুটিয়া পলাইল এবং সঙ্গে সঙ্গে পর্দ্দা সরাইয়া নীরদ প্রবেশ করিয়া প্রত্যাশাপূর্ণ নেত্রে শান্তির মুখের পানে চাহিয়া দেখিল। শান্তি এই আকস্মিক আগমনে আজ যেন বিব্রত বোধ করিল এবং লজ্জিতভাবে হারমোনিয়মের

চাবিগুলার উপর হইতে অঙ্গুলী উঠাইয়া লইল। বোধ করি, পুষ্পকোরক-তুল্য অঙ্গুলীর লীলাচঞ্চল ক্রীড়াস্পর্শে বঞ্চিত হইয়াই উহারা অকস্মাৎ মাতৃ-ক্রোড়ভ্রষ্ট শিশুর ন্যায় সকরুণে কাঁদিয়া উঠিয়াছিল।

নীরদ জিজ্ঞাসা করিল—"তোমাদের বাড়ী যাওয়ার দিন স্থির হয়েছে? কবে?"

শান্তি মুখ না তুলিয়াই উত্তর দিল—"বোধ হয়, পরশু।"

"যোগেনও যাবে?"

"বলতে পারি না, মণিদি আর অনিল যা'বে।"

নীরদ একটা চেয়ার সরাইয়া বসিল, কহিল—"আমি কাল আসতে পারি নি বলে বুঝি রাগ হয়েছে? তুমিই শুধু রাগ করেছ, না সব্বাই? না, হাসলে চলবে না—বলতে হ'বে কে' কে' রাগ করেছে?—মা, স্নকু, যোগেন, অনিল, তুমি—আচ্ছা, স্নকুর কুকুরটাও কি রাগ করেছে? সেটাকেত দেখতে পাচ্চি নে!"

শান্তি কলকণ্ঠে হাসিয়া ফেলিল—"বাঃ! কুকুর নাকি ঐ জন্যে রাগ করে, সে কিন্তু একটুও রাগ করে নি।"

নীরদও হাসিল—"আর তুমিও রাগ করনি, না?"

শান্তির ওষ্ঠপ্রান্তে যে ক্ষীণ সলজ্জ হাসিটুকু ফুটিতে ফুটিতে মিলাইয়া গেল, তাহাই প্রশ্নের পর্য্যাপ্ত উত্তর। নীরদ তার মুখের বিষাদের অস্পষ্ট ছায়াটুকু লক্ষ্য করিল না, তার সারা চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া সুন্দর মুখখানা ভাবোচ্ছ্বাসে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এমন সময় বাহিরে একটা দুপদাপ শব্দ ও চীৎকার উঠিল—"টেবি! টেবি!" পরক্ষণে সশব্দে সুপ্রকাশ প্রবেশ করিল। তার নূতন এয়ার গান্ এবং পশ্চাতে গলায় নীল ফিতা ও পায়ে ঘুমুর-পরা ক্ষুদ্রকায় কুকুর-শাবক। টেবি নূতন প্রভুর সহিত ঘরে ঢুকিয়া পুরাতন প্রভুর গলা চিনিয়া নাচিয়া

লাফাইয়া আনন্দ-ধ্বনি করিয়া উঠিল। কৃতজ্ঞ জীব এখনও তাকে ভুলে নাই। সুপ্রকাশ নীরদকে দেখিয়াই ডান হাতটা পিছনে লুকাইল। অভিমানে তার চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল, আজ সে কোন মতেই তাঁর সাথে কথা কহিবে না স্থির করিয়াছে। মিঃ রায় তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া বালকের বন্দুকশুদ্ধ হাতটা গ্রেপ্তার করিয়া বলিল—"বা বা, দিব্যি বন্দুকটি তো। সুকু, এখানে কিন্তু বেশ শিকার করা যেত ভাই! কলকাতায় তো সে সুবিধা হ'বে না। আমরা দুজনে শিকার করতে কোন্‌খানে যা'ব বল তো?"

কথাটা শুনিয়া সুকু ও শান্তি একসঙ্গে প্রশ্ন করিয়া উঠিল—"সত্যি! আপনি কলকাতায় যা'বেন?"

"যাব বলেই ত কদিন আসতে পারি নি। নানান ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে ছিল ঝেঁটিয়ে সাফ করে ফেলেছি। কাল সকালেই আমি তোমায় ছুঁড়তে শিখিয়ে দেব, কি বল ভাই শুক্রাচার্য্য!"

সুপ্রকাশের অভিমান তৎক্ষণাৎ দূর হইয়া গেল, সে সানন্দে বলিয়া উঠিল—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, কালই শেখাবেন। একটা পাখী কিন্তু আমায় মারতে দিতে হ'বে। দেবেন তো?"

শান্তি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া উঠিল—"নির্দ্দোষী জীবকে অনর্থক মেরে তোর কি সুখ হবে, সুকু? কষ্ট হবে না?"

"কেন হবে? নীরদদার কি হয়? উনিই তো বলেন, শিকার করে হাতের কৌশল না অভ্যাস করলে এরপর যদি কখনও যুদ্ধ করতে হয় তখন কি লক্ষ্মণ সেনের মত খিড়কী দোর দিয়ে পালিয়ে যাব? তুমি আমার চেয়ে নীরদদাকেই বেশী ভালবাস, কি না! তাই আমারি সব দোষ ধর ওঁর বেলায় কিছুই দেখতে পাও না!

শান্তি কাণ্ডজ্ঞানহীন ভাইয়ের মন্তব্যে লজ্জায় মরিয়া গেল! নীরদ-

কুমার প্রীতিপূর্ণ নেত্রে মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ স্নিগ্ধহাসি হাসিল। সুকু বলিল—"সত্যি সত্যি আপনি যাবেন, নীরদদা'? বেশ হ'বে কিন্তু তা হ'লে, আমরা দেশে গেলেই ত দিদির বিয়ে হ'বে, আপনিও দেখবেন। নিশ্চয়ই বাজনা বাজবে, আলো আর বাজি টাজি হ'বে। আপনি এমন করে চেয়ে রইলেন যে?—আপনি বুঝি শোনেন নি, দিদির যে এই মাসেই লক্ষ্মীপুরে বিয়ে হ'বে?"

মানুষকে আচমকা অন্ধকারে কিছু কামড়াইলে সে যেমন আকস্মিক ভয়ে বিস্ময়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে, নীরদকুমারের অবস্থা সেইরূপ হইয়াছিল। সে তেমনি করিয়াই চমকাইয়া বলিয়া উঠিল—"কোথায়? —কোথায়? বিয়ে হবে?"

সুপ্রকাশ কিছু বুঝিতে না পারিয়া দিদির দিকে চাহিয়া দেখিল, দিদি নত মুখে বসিয়া হারমোনিয়মের সুরগুলার উপর অঙ্গুলি দ্বারা মৃদু আঘাত করিতেছিল। সুপ্রকাশ ধীরে ধীরে উত্তর দিল—"লক্ষ্মীপুরে।"

নীরদ পরিত্যক্ত কেদারাখানায় বসিয়া পড়িয়া রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল—"লক্ষ্মীপুরে—কা'দের বাড়ী?—কার সঙ্গে?"

বালক একটু ভাবিয়া বলিল—"জ্যেঠামশায়দের বাড়ী, হেমবাবুর সঙ্গে। জ্যেঠামশায়কে চেনেন না? তাঁ'র মস্ত সাদা দাড়ি নেই, গল্পও জানেন না, তবু তিনি আমাদের জ্যেঠামশায়—আবার দিদির তিনি ছেলে, তাঁ'র নাম বলব? তাঁ'র নাম শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাকান্ত চৌধুরী, জানেন নীরদদা'! হেমবাবু তাঁ'র ছেলে নয়—বাবা মার কাছে বলছিলেন, তাঁর ছেলে বিনোদ যদি ফিরে আসত, তা হ'লে তার সঙ্গে দিদির বিয়ে হ'ত না, সে বাপের অবাধ্য,—এ 'দত্তদের' ছেলে না, কি, যে বল্লেন! বিনোদের চেয়েও নাকি আরও সুন্দর দেখতে। বিনোদের কিন্তু খুব অন্যায়, না, নীরদদা'? সে কি ক'রে তা'র বাবার অবাধ্য হ'ল! দিদি

তা'কে কক্ষনো বিয়ে করবে না, কক্ষনো না, দিদি বাবার অবাধ্য হয় না, আমিও হই না।"

নীরদকুমারের মুখ নীল মাড়িয়া গিয়াছিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে কথা বলিতে পারিল না। তার রক্তহীন পাংশু ওষ্ঠ গভীর হতাশায় ঈষৎ কম্পিত হইল মাত্র। সমস্ত শক্তি যেন তার চলিয়া গিয়াছে, মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। সুপ্রকাশ এর কি বুঝিবে, সে এবার দিদিকে লক্ষ্য করিয়া একটা শর সন্ধান করিয়া বসিল—"হ্যাঁ দিদি! বাবা বলছিলেন তুমি নাকি হেমবাবুকে ভালবাস? আমি কিন্তু তা' বাসতে দেব না। হ্যাঁ, যাকে তাকে ভালবেসে আমায় বাসবেনা। তার চেয়ে নীরদদা'কে ভালবাসা ভাল—আমিও ওকে ভালবাসি কি না; ঐ বুঝি বাবা আসচেন!" ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, টেবিও পায়ের ঘুমুর বাজাইয়া তাকে অনুসরণ করিতে ভুলিল না।

এই অপ্রত্যাশিত নিষ্ঠুর আঘাতে নীরদকুমার বজ্রস্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু মুহূর্ত্ত পরে সেই আকস্মিক বিহ্বলতার স্থানে একটা গভীর উত্তেজনা জাগিয়া উঠিয়া তার অসাড় মনোবৃত্তিগুলিকে পুনশ্চ সচেতন করিয়া তুলিল। অকস্মাৎ কেদারা ছাড়িয়া দ্রুতপদে সে শান্তির নিকটবর্ত্তী হইয়া উচ্চ আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"ও'কথা আমি বিশ্বাস করতে পারব না, শোন—শান্তি!—তুমি আমার এই ঘোর অন্ধকার জীবনের একমাত্র ধ্রুবতারা!—সেই কথাই আজ আমি তোমার বাবাকে বলতে এসেছি। এমন সময় এমন আঘাত দিও না, বল, শান্তি, বল শান্তি—সুকুর কথা সত্যি নয়!"

একটা অস্ফুট ধ্বনি করিয়া শান্তি দুই হাতের মধ্যে মুখ ঢাকিল। তবে তো লোকে মিথ্যা বলে না? উন্মাদের মত নীরদকুমার তার মুখের উপর হইতে হাত সরাইয়া লইতে গিয়াছিল কিন্তু সহসা ঈষৎ প্রকৃতিস্থ

হইয়া সরিয়া আসিল, কম্পিতকণ্ঠে কহিল—“জানি আমি তোমায় পা’বার যোগ্য নই, কিন্তু মানুষ সব সময় যোগ্যতা বিচার করে না, শুধু তুমি বল, তোমার আপত্তি নেই, তা’র পর আমি তোমার বাবার কাছে গিয়ে আমার যা বলবার আছে সব বলব। তিনিই আমার ভাগ্য-নির্ণয় করবেন। তুমি শুধু বল—আমার এ আশা নিতান্ত দুরাশা নয়?”

শান্তি তথাপি দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া রহিল। তার বুকের রক্ত বরফপিণ্ডের মত জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে, সে কি বলিবে? বলিবে কি, সুকু শুনিতে ভুল করিয়াছে—শান্তি সে ব্যক্তিকে কখন চোখেও দেখে নাই, কিন্তু না, কেমন করিয়া সে এ কথা আলোচনা করিবে? যদি তিনি ঠিক বুঝতে না পারেন! বাবাকে বলেন যদি?—প্রথম আঘাতে অসহ্য বেদনা সহ্যের মধ্যে ফিরিলে নীরদকুমার ঈষৎ লজ্জিত হইল। শান্তি মুখ তুলিল না। একটা অব্যক্ত ব্যথায় তার ক্ষুদ্র দেহ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল—কেন তিনি এমনভাবে ভালবাসিলেন? সেই কি তবে তাঁর চির-দুঃখের কারণ হইল? সেও তো তাঁকে ভালবাসে, কিন্তু জানিত না, অভিধানে সে ভালবাসার অর্থ কি—ভালবাসাকে সে শুধু সেই নামেই জানিত, সে দিন মাত্র সেই অজ্ঞাত-মনোবৃত্তি অস্ফুটবাক্ শিশুর প্রথম আধাবুলির মত নবজীবন লাভ করিয়া অপূর্ব্বশ্রুত অস্পষ্ট গুঞ্জন আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সে বুঝিল এ মুকুল সূর্য্যমুখী নহে, কুন্দকলি, সেই মুহূর্ত্তেই সেই আধ খোলা পাপড়ি মুদিত হইয়া আসিয়াছে। যতটুকু ক্ষুদ্রই হোক, কর্ত্তব্যপরায়ণ পিতার কন্যা, কর্ত্তব্যের বোঝা বহিতে কোন অবস্থাতেই অপারগ নয়। সে বোঝা যত ভারি হোক্, শান্তি বহন করিবে।

বহুক্ষণ একদৃষ্টে তার আনত মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আবার ধীরে ধীরে একটু অগ্রসর হইয়া অত্যন্ত কোমল, অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ স্বরে

নীরদ বলিল—"শান্তি মুখ তোল, উত্তর দাও—তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছ না? আমি তোমায় চাই। মনে করো না, এ ক্ষণিকের মোহ! যেদিন যোগেনের বাগানে বনদেবীর মত ফুলরাশির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফুলের মত তুমি দাঁড়িয়েছিলে এবং যখন জানতে পারলুম তুমি কার মেয়ে সেই মুহূর্ত্তেই আমার জীবনের স্রোত বদলে গেছে। তা'রপর এই ক'মাস ধরে অনেক চেষ্টা করেছি, তুমি আমায় পরাজিত করেছ! আমার আত্মাভিমান পরিপূর্ণ হৃদয় তোমার ওই দুটি স্বচ্ছ কালো চোখের একটু খানি করুণ দৃষ্টির মধ্যে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করেছে! আমার বর্ত্তমান, আমার ভবিষ্যৎ, সব আমি তোমার মধ্যে হারিয়ে ফেলেছি। আমার ভ্রম, আমার অহঙ্কার, সব চূর্ণ হয়ে গেছে। তোমার পবিত্রতায় সে মলিনতা দূরে ফেলে জটিল জীবনজাল সোজা পথে ফিরিয়ে নিতে চাই, বল, শান্তি, তুমি এ ভিখারীর দান দয়া করে নেবে কি?"

নীরদ উৎকণ্ঠিত নেত্রে চাহিয়া উচ্ছ্বাসভরে বলিতে লাগিল—"জীবনের কোন রহস্য কোন পাপ আমি তোমার অজ্ঞাত রাখতে চাই না, সব কথা স্পষ্ট করে বলতে অনেক দেরী হ'বে, এখন এই টুকু বলছি আমি নিষ্পাপ নই। স্বভাবজাত দুর্ব্বলতা আমায় পুনঃ পুনঃ পথভ্রষ্ট করেছে। আমার জীবনের প্রথম প্রভাতে আর একদিন আমি এমনি শুভাবসর পেয়েছিলাম, কিন্তু শান্তি! অকপটে আমি স্বীকার করছি, চেষ্টা করেও সেখানে আমি ভালবাসা আনতে পারি নি। সে জন্যে আমার দোষ দিও না;—সূর্য্যকে লোকে পূজা করতে পারে, ভয় ভক্তি করতে পারে, কিন্তু সুধাবর্ষী চাঁদকেই ভালবাসে।—শান্তি, তুমি কাঁদচো?" দারুণ সন্দেহে বিবর্ণ মুখে অবরুদ্ধপ্রায় স্বরে নীরদকুমার সহসা চমকিয়া বলিয়া উঠিল—"বুঝেছি, শান্তি! এ পৃথিবীতে আমার

কোন আশা নেই! নূতন আশায় আবার যে আকাশ-কুসুমের মালা গাঁথছিলাম, ছিঁড়ে গেল, সব ফুরিয়ে গেল।”

আহত নীরদকুমার মাতালের মত স্খলিত পদে ফিরিয়া পরিত্যক্ত আসনের উপর বসিয়া পড়িল। মনে হইল, কৌচ কেদারা সমেত সমস্ত ঘরটা নাচিতেছে।

শান্তিও কি আঘাত পায় নাই? তার অপরাধের যে সীমা হয় না? কি বিশ্বস্ত হৃদয়ে সে বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছে! অথচ দেবতা জানেন, সে কত নিরুপায়! সে তাঁকে ভক্তি শ্রদ্ধা বিশ্বাস সব দিতে পারে, কিন্তু এতটুকু সান্ত্বনা দিতে পারে না। আটটা বাজিয়া গেল। ভিতরের কক্ষ হইতে সুপ্রকাশের কণ্ঠ ভাসিয়া আসিল—“চল না, বাবা তিনি অনেকক্ষণ বসে রয়েছেন। এসে মাকে চিঠি পড়ে শুনিও। জ্যেঠামশাই সকাল বেলা কেন চিঠি লিখতে পারেন না?”

নীরদকুমার গভীর স্তব্ধতার মধ্য হইতে জাগিয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিল, শান্তি হারমোনিয়মের ডালার উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিতেছে। আবেগপূর্ণ কণ্ঠে কহিল—“তোমায় আঘাত দিয়েছি—ভাল করি নি, শান্তি! আমার বিশ্বাস ছিল, তুমিও আমায় ভালবাস তা'ই আমি এতদূর সাহস করেছিলাম! ক্ষমা কর!”

শান্তি অশ্রুপ্লাবিত করুণ নেত্র তুলিয়া কাতর কণ্ঠে বলিল—“আমাদের উপর রাগ করবেন না। আপনি বিশ্বাস করুন, আমরা চিরদিনই আপনার কথা মনে রাখবো—আমরা সকলেই আপনাকে ভক্তি করি, সম্মান করি, মা আপনাকে কত ভালবাসেন, আর বরাবরই বাসবেন—”

“ভালবাসা”—কথাটা মুখ হইতে বাহির হইল না। ছিঃ; সে কি উপন্যাসের নায়িকা? কেমন করিয়া বলিবে, সেও তাঁকে ভালবাসে! আর কি গভীর সে ভালবাসা।

নীরদকুমার কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিল। তার পাণ্ডু মুখ হইতে অবশিষ্ট শোণিতবিন্দুটুকুও কে যেন শুষিয়া লইল। বুঝি তখনও আশা ছাড়িতে পারে নাই, শেষ মুহূর্ত্তেও একটা অপ্রত্যাশিত শব্দ শুনিবার জন্ম প্রতীক্ষা করিতেছিল। ঈষৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল—"তাই ভাল, তাই ভাল, শান্তি! তুমি আমায় ইচ্ছা করে যা দেবে তা'ই মাথায় তুলে নেব। ভক্তি? সম্মান? তা'ই যথেষ্ট। আমি যে তারও যোগ্য নই!"

নীরদ আবার শান্তির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল—"বিদায়, শান্তি, জন্মের মতই বিদায়। আশীর্ব্বাদ করি, উপযুক্ত পাত্রে পড়ে সুখী হও, বাস্তবিকই আমি তোমায় পা'বার যোগ্য নই।"

সে চলিয়া গেল। রজনীনাথের সহিত পাছে সাক্ষাৎ হইয়া যায়, সেই ভয়ে দ্রুত পদেই চলিয়া গেল। শান্তি একা গভীর ভারাক্রান্ত চিত্ত লইয়া বসিয়া রহিল। এ ঘটনা সত্য, কিম্বা এতক্ষণ সে একখানা করুণ কাহিনীর একটা পৃষ্ঠা পড়িতেছিল, তাও ভাল করিয়া অনুভব করিতে পারিতেছিল না। কেবল তার মসীরেখাহীন অমল হৃদয়ে একটা নিবিড় কালির রেখা পড়িয়া গেল। হায়, এ করুণ অভিনয় অনভিনীত থাকিলেই বা কি ক্ষতি ছিল? এ অস্পষ্ট চিত্রখানাকে কেন তিনি অস্পষ্টই থাকিতে দিলেন না?

১৫

নীরদকুমারের নূতন জীবনের নবীন আশা অকস্মাৎ প্রবল ঝঞ্ঝায় ধূলিলুণ্ঠিত হইল। সে সারাদিন অংশীদারদের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া দিন কয়েকের অবসর লইয়াছিল, বাড়ী ফিরিবার পথেই স্থির করিল, তার কোন আবশ্যক নাই—দেশে ফিরিবার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে।

ঘরের জিনিষপত্র বিশৃঙ্খল, একটা অর্দ্ধসজ্জিত এবং দুইটা চামড়ার ব্যাগ সাজান পড়িয়া আছে। নীরদ বাড়ী ফিরিয়া শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল।

ভৃত্য আসিলে তাহাকে বিদায় দিল। রান্নাঘরে আহার্য্য লইয়া পাচক প্রতীক্ষা করিতেছে, আহ্বান না পাইয়া আনিতে সাহস করিল না। সবদিন আহারের প্রয়োজনও হয় না। নীরদ দ্বার রুদ্ধ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। কাপড় ছাড়াও হইল না। শারীরিক বা মানসিক শক্তির এতটুকু খরচ করা তার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। পৃথিবীর যত কিছু আবশ্যক-অনাবশ্যক আজ তার মস্ত বোঝার মত ভারি ঠেকিতেছিল। আর যেন কিছুরই প্রয়োজন নাই, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা রহিল, কি গেল, তারও খোঁজ লইবার আবশ্যক করে না। সব ফুরাইয়া গিয়াছে।

কি ফুরাইয়াছে? কি ছিল, গেলই বা কি? এ কথা অনেকবারই মনে উঠিতেছিল। কি ছিল? অনেক ছিল? অগাধ স্নেহ, অতুল সম্মান, অপ্রতিহত অধিকার, কি না ছিল? সংসারে মানুস যাহা পাইলে জীবন ধন্য মনে করে, জগতের যাহা কিছু কাম্য, সবই ছিল। কিন্তু সে সব তো অনেক দিনই গিয়াছে। তবে আজ আবার এতদিন পরে নূতন করিয়া এ শোকানুভব কেন?—সব ফুরাইল! সব ফুরাইয়াছে? হাঁ ফুরাইয়াছে সত্য কিন্তু সে কাহার জন্য? কার দোষে ফুরাইল? কে বৃথা অহঙ্কারে অন্ধ হইয়া স্বেচ্ছায় সেই সুখের সংসার ছাড়িয়া, অকৃতজ্ঞের মত চলিয়া আসিয়াছে? সে অন্ধ, তা'ই চাহিয়া দেখে নাই, সে স্বার্থপর তা'ই বুঝিতে পারে নাই, যে পিতৃহৃদয় স্নেহ-হীন ভাবিয়া সে অভিমানের আগুনে গুমিয়া গুমিয়া পুড়িয়াছে, বাস্তবিক তাহা কত স্নেহময়! স্নেহময় জনকের ভালবাসা কি সেই তুচ্ছ কারণে পরিত্যাগ করিবার? নিষ্ঠুর হৃদয়হীন একবার সে পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল না। নিজের খেয়ালে,

নিজের দর্পে, অনায়াসে সেই স্নেহ নীড় ছাড়িয়া আসিল! তা'রপর—না হয় বয়োধর্ম্মে একটা অন্যায়ই করিয়া ফেলিয়াছিল—কিন্তু ফিরিবারও তো পথ ছিল, ভুল তো বুঝিয়াছে অনেকদিনই, কিন্তু সংশোধন করিল কই? কেন—আবার সে কাঁদিয়া গিয়া পিতার বুকে পড়িল না? সে বুক তো তার জন্যই পাতা ছিল! শতবার অগ্রসর হইতে গিয়া দুরন্ত অভিমানে ফিরিয়া না আসিয়া কেন সে সকল সঙ্কোচ কাটাইয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল না?

আর—তাহাকে বিপদে আশ্রয় দিয়া, অক্লান্ত শুশ্রূষায় প্রাণপণে যে বাঁচাইয়া তুলিয়াছিল, তাকেই বা সে কি প্রতিদান দিয়াছে? এতদিন নীরদ ভাবিয়াছে অনেক। সে যে শুধু করুণা করিয়াই শিবানীকে গ্রহণ করিয়াছিল এবং ভালবাসিতে চেষ্টা করিয়াছিল, সিদ্ধেশ্বরীর কন্যার পক্ষে সে তো যথেষ্ট! স্বেচ্ছায় যখন সে সেই অধিকার পরিত্যাগ করিল, তখন সে কি করিবে? তার অপরাধ কি?—কিন্তু তা'ই কি ঠিক? সে কথা তো আজ আর সে ভাবিতে পারিল না। আজ যে কেবলই মনে হইতে লাগিল, সে পাপের ইহাই প্রায়শ্চিত্ত! সে তার প্রতিশ্রুতি মন্ত্র, অগ্নি-দেবতা এবং দেব-মানবের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করিয়া তাকে যে অপমান করিয়াছে আজ শাস্তি তারই শোধ দিল। কেন দিবে না? ঈশ্বরের নিরপেক্ষ ন্যায়বিচারে যথার্থ ই তো সে এই অপমানদণ্ড ভোগ করিতে বাধ্য। কে' বলে, কর্ম্মফল নাই? বেশ করিয়াছ, শাস্তি, ভাল করিয়াছ!

নীরদ উঠিয়া বসিল। ভাবিতে ভাবিতে নিজের জন্য সে একটা সাফাই খুঁজিতেছিল। পরাজিত-প্রায় উকীল হাল ছাড়িয়া দিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে সহসা বিপক্ষপক্ষের এতটুকু ছল পাইলে সেইটুকু লইয়াই নূতন উৎসাহে আবার যেমন চাপিয়া ধরে, নীরদকুমারও সেইরূপ হতাশার শেষ

প্রান্তে দাঁড়াইয়া নিজেকে সাফাই করিবার একটা পথ পাইয়া ঈষৎ আশ্বস্তচিত্তে উঠিয়া বসিল, ভাবিল—শিবানীর প্রতি ব্যবহার অন্যায় নয়। সে তো স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছে, সে তাহাকে ঘৃণা করে, তবে? যে স্ত্রী স্বামীকে পরের কথায় নির্ভর করিয়া ঘৃণা করে, স্বামীই বা কেন তাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না? সে মাতাল দুশ্চরিত্র কিছু প্রমাণ পাইয়াছিল? সে উপার্জ্জনে অক্ষম এ কথা সত্য; কিন্তু যখন তাঁর মা তার সঙ্গে বিবাহ দেন, তখন অসহায় পথিক ভিন্ন সে তো নিজেকে রাজপুত্র বলিয়া জাহির করে নাই, এবং ইচ্ছা করিয়াও তাকে বিবাহ করে নাই, সে বিবাহ যে কতদূর অপমানজনক সে কি বুঝিবে? তার জন্য অনর্থক তাদের বাড়ীতে অকথ্য লাঞ্ছনা সহিতে হইয়াছে, তাহাও সহিয়াছে, শেষে যার জন্য সহিল সেও ঘৃণা করিল। স্ত্রীর ইহা ধর্ম্ম নয়!

অপরাধীর পক্ষে, "অপরাধী নহি"—ভাবিতে পাওয়া কম আরামের নহে! বুকের ভারটা যেন এ চিন্তায় অনেকখানি কমিয়া যায়, কণ্ঠের কাছ অবধি যে নিশ্বাসটা রুদ্ধ হইয়া কণ্ঠনালিকে চাপিয়া রাখিয়াছে, তাহা যেন কতকটা হাল্কা হইয়া পড়ে। বৎসরখানেক হইল, কোচিনে যখন কলেরা রোগে সে মরণাপন্ন হইয়াছিল, সেই সময় একজন প্রতিবেশী দ্বারা পত্র লিখাইয়া রেজেষ্ট্রী করাইয়া নীরদ হাজার খানেক টাকা বৃন্দাবনে পাঠায়, সেটা তখন সে স্নেহ বা ভালবাসার খাতিরে করে নাই। সে তার ঋণ-পরিশোধ। তা'র পর মৃত্যু যেমন আসিয়াছিল, তেমনি রিক্ত-হস্তেই ফিরিল বরং একটু শিক্ষা দিয়াই গেল। এইটুকু বুঝাইয়া দিয়া গেল আত্মীয়ের একটু গঞ্জনা সহিতে অভ্যস্ত হইলে নিদারুণ তৃষ্ণায় শীতল জল ও প্রবল যন্ত্রণায় অক্লান্ত শুশ্রূষা অতি সহজেই মিলে। রোগ মুক্তির পর দ্বিতীয় পত্র লিখিবার একটা আগ্রহ জন্মিল, কিন্তু পরক্ষণেই

আবার সে আগ্রহ নিভিয়া গেল। আবার সেই দারিদ্র্য লইয়া তার নিকট পরিচিত হইতে ইচ্ছা হইল না, বরং তাদের সম্পর্ক মিটিয়া গিয়াছে ইহা ভালই বোধ হইল। যদি কখনও অবস্থা ফিরে, তখন পত্র লিখিবে, ইহাই সে সঙ্কল্প করিয়াছিল, কিন্তু যখন অবস্থা ফিরিল—তখন দৈবগতিকে ইচ্ছাও ফিরিয়া গেল। শান্তি আসিয়া শিবানীর আকাঙ্ক্ষিত সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিল। সেখানা শিবানীর জন্য পাতা হইয়াছিল, কিন্তু তাকে তো চাপিয়া বসিতে দেওয়া হয় নাই, শূন্যই পড়িয়াছিল, যেটুকুও সে দখল করিয়াছিল, এতদিনে তাও বুঝি তামাদি হইয়া গিয়াছে!

যেখানে দাবী বেশী, অত্যাচারও সেইখানেই অধিক। শিবানীর প্রতি ক্রোধ তো অভিমান নয়, সেজন্য তার কথা মনের চারিপাশে ভাসিয়া বেড়ায়—এমন করিয়া হৃৎপিণ্ডের মাঝখানে কাটিয়া বসে না। কখনও তুলাদণ্ডে তার অন্যায়ের দিকটা ঝুঁকিয়া পড়ে, কখনও বা নিজের দিকে ভার ঠেকে। কিন্তু আর যে পারা যায় না! কেমন করিয়া এখন একবার সে তাকে দেখিতে পাইবে? এখন তো আর সে গৃহহীন মূর্খ বা অক্ষম নয়, সম্পূর্ণ সুযোগ সত্ত্বেও সে তারই ইচ্ছার জন্য নিজের জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়াছে, অথচ এ দীর্ঘ দিন বৃথা অপব্যয়ও করে নাই। যেখান হইতে আসিয়াছিল, এখন যদি সেইখানে ফিরিয়া যায়, তাহা হইলে কেহই তার দিকে করুণার চক্ষে চাহিয়া বলিবে না—'আহা! বৃথা গর্ব্বে নিজের কি সর্ব্বনাশই করিয়া ফেলিলি!' সে বাহিরে আসিয়া নিজের পথ করিয়া লইয়াছে। স্বাবলম্বন অভ্যাস করিয়াছে, কঠোর পাঠাধ্যয়নে দুস্তর পরীক্ষা সাগর নির্ভয়ে পার হইয়া আসিয়াছে। সে আজ মানুষ! সগর্ব্বে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া বলিতে পারে, গিয়াছিল বটে, কিন্তু ব্যর্থ হইয়া ফিরে নাই। ঘরে বসিয়া যাহা না হইত তাহা সে সম্পন্ন করিয়াছে। বোধ

করি, ক্ষমার অযোগ্য হইবে না; কিন্তু ও সব তর্কের কথা, হৃদয়ের কথা নয়! নীরদ সে কথা বলিতে পারে, কিন্তু তার বক্ষের মধ্যে যে একটি অনুতপ্ত পুত্র লজ্জাকুণ্ঠিত প্রাণে ক্ষুধিত সন্তপ্ত চিত্তে স্নেহ-তৃষ্ণায় হাহাকার করিতেছিল, সে কোন্ স্পর্দ্ধায় এমন কথা বলিবে! দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিল। সঙ্কোচ ও সংশয়ের বাধা কাটিল না। যদি ক্ষমা না মিলে? এই সংশয় সংযুক্ত নিদারুণ অভিমান যে তাহার সর্ব্বনাশের মূল? এ রাক্ষসী যে মরিয়াও মরে না। এ দুরন্ত প্রবৃত্তি সে কেমন করিয়া দমন করিবে? তা'রপর বিধাতা একদিন সুবর্ণ সুযোগ মিলাইয়া দিলেন। নীরদ ভাবিল, তার অগ্নিমুখী ধূমকেতুটা বুঝি এত দিনে নামিয়া গেল। অকস্মাৎ ভারতের এই এক প্রান্তে মাদুরায় শান্তির সহিত অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতে তার সমুদয় মনঃপ্রাণ যেন সেই মুহূর্ত্তে পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে জোয়ারের জলের মত উথলিয়া উঠিল। সে ভাবিল, ইহার চেয়ে বিচিত্র ঘটনা মানব-জীবনের ইতিহাসে অল্পই ঘটিয়াছে। শান্তিকে যদি সে পায়, তাহা হইলে অনায়াসে সে নিজের অপরাধের কালিমা পুণ্যময়ী বালিকার পবিত্রতায় মুছিয়া ফেলিয়া আবার তেমনি স্নেহের দাবী লইয়াই পিতার নিকট দাঁড়াইতে সমর্থ হইবে। তবে শান্তিকে পাইবার পক্ষে তার একমাত্র বাধা—শিবানী। সে এমন কি প্রবল বাধা? কোথায় এক দরিদ্রা অনাথার অশিক্ষিতা কন্যা শিবানী—সে কি শান্তির প্রতিদ্বন্দ্বিনী হইবার যোগ্যা? এখন একথা সকলের অজ্ঞাতই থাক, যখন বিবাহের পর একদিন অত্যন্ত সাবধানে শান্তির কোমল হাতখানি হাতে তুলিয়া তার কালো চোখের দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলাইয়া পুনঃ পুনঃ ক্ষমা চাহিয়া সব কথা শান্তিকে সে খুলিয়া বলিবে, তখন শান্তি তাকে ক্ষমা না করিয়া থাকিতে পারিবে না। সে যদি ক্ষমা করে, তবে আর কে করিবে না? দুইবার বিবাহে আর কাহার ক্ষতি? রজনীনাথ? কন্যা

ক্ষমা করিলে, পিতা কি করিবেন না? তাঁর মহত্ব তো তার অজ্ঞাত নয়। নীরদ বুঝিয়াছিল একবার যদি সে লাল শাড়ি ও সোলার সিঁথি ময়ূর-পরা কল্যাণময়ী শান্তিকে রেশমী চাদরের গ্রন্থিবন্ধনে নববধূ-বেশে পাশে লইয়া দাঁড়াইতে পারে, তাহা হইলে সেই মুহূর্ত্তে দুইবাহু প্রসারণ করিয়া চারিদিক হইতেই ক্ষমা আগাইয়া আসিবে। তার কল্যাণবর্ষী স্নিগ্ধ হাসিটুকুতে তাদের কঠিন কৈফিয়ৎ মিটাইয়া দিয়া এই দীর্ঘ তাপদাহ মুহূর্ত্তে জুড়াইয়া দিবে। সে বুঝিয়াছিল শান্তির উপরই তার সমুদয় সুখ-শান্তি নির্ভর করিতেছে, তাকে পাইতেই হইবে।

এক মুহূর্ত্তে সব আশা নির্ম্মূল হইয়া গেল। নীরদ ভাবিল—সব শেষ! শুধু শান্তি নয়, শান্তির সহিত তার জীবনের সুখশান্তি সবই গেল! তা'রপর কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া ভাবিতে লাগিল এখন তার কর্ত্তব্য কি? এখন কি আর রজনীনাথকে সে বলিতে পারে, আমি শান্তিকে চাই? সুকুর মুখে সেই নিদারুণ সংবাদ শুনিবার পর? তা ভিন্ন এও একটা ভাবিবার কথা যদি রজনীনাথ পূর্ব্ব কয়বৎসরের ইতিহাস শুনিতে চাহেন? সকল কথাই তাকে প্রকাশ করিতে হইবে। সে কথা শুনিবার সময় রজনীনাথের ওষ্ঠপ্রান্ত তীব্র পরিহাসের সুতীক্ষ্ণ অথচ অস্পষ্ট হাস্যের আভাষে কি গভীর ঘৃণায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিবে তাহা কল্পনানেত্রে দর্শন করিয়াই সে যেন ক্ষোভে লজ্জায় মর্ম্মের মধ্যে মরিয়া গেল। বসুমতীর প্রবল স্নেহ কেমন করিয়া গভীর ঘৃণায় পরিবর্ত্তিত হইবে, শান্তি তাকে কি ভাবিবে সেই কথা ভাবিতে সে শিহরিয়া উঠিল। আত্ম-প্রকাশে এখন শুধু শান্তিরই সুখশান্তি নষ্ট হইবে। সে ভাবিল, যে ভাসিয়া চলিয়াছে, তাকে স্রোতের মুখে ভাসিয়া যাইতেই হইবে, কূলে উঠিবার চেষ্টা এখন বৃথা। নিজের যে স্নেহ-সিংহাসনে সে পদাঘাত করিয়া আসিয়াছে, সুখের যে নীড়ে স্বহস্তে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে, এখন সেই নষ্ট নীড়ে

ফিরিবার পথ আর নাই। সেখানকার সহিত তার সকল সম্বন্ধ ফুরাইয়া গিয়াছে। সে আর তো তাঁর কেহই নয়, তিনিও তাকে আর চাহেন না। এ মিলনে এখন আর কাহারও সুখের আশা মাত্র নাই। রজনীনাথ তাকে কন্যাদান করিবেন না, শান্তি তাকে চাহে না, আর তিনি? তিনি এখন তার চেয়ে হয় তো শান্তিকেই বেশী চান। না হইলে এত শীঘ্র তার মরণ নিশ্চিত করিয়া পোষ্যপুত্র লইতে পারিয়াছেন? হায়, আজ কোথায় তার সেই স্নেহময়ী মা যাঁর অভাবে জন্মের মত সে বঞ্চিয়া গেল! মা কখনও এমন করিতে পারিতেন না। মা কখনও সন্তানের অভাব পরকে দিয়া মিটাইতে চাহিতেন না। মা! মা! মাগো!— আজ তুমি কোথায়?

নীরদ ভাবিতে লাগিল। অনেক ভাবিয়া শেষে সে স্থির করিল, যখন পৃথিবীর মধ্যে কেহই তাহাকে চাহে না, কাহারও কোন প্রয়োজনে সে লাগিবে না, তখন তার সকল দাবী, সে নির্ব্বিবাদে পরিত্যাগ করিবে। এখনও যারা এ সংসারে তার একমাত্র আরাধ্য একমাত্র স্নেহাস্পদ তারা সুখী হোক্, সে সুখে হতভাগ্য সে বাধা দিবে না। ভাগ্য-পরীক্ষার ছলে হিংসায় পড়িয়া আর একজনের সুখের প্রদীপ সে কেন নিভাইয়া দিবে? হেমেন্দ্র দরিদ্র নিঃস্ব, লক্ষ্মীপুরের সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইলে তার পক্ষে শান্তিকে পাওয়া অসম্ভব, কিন্তু শান্তি তাকে ভালবাসে! শান্তি তারও হইবে না, হেমেন্দ্ররও হইবে না, ইহাতে তার তো কোনই লাভ নাই। শান্তি যাকে চাহে, তারই হোক, সুখী হোক।

পিতা তাকে ভুলিয়াছেন, তার স্থানে নূতন লোক নূতন স্নেহে পুষ্ট হইতেছে! যে অপ্রতিহত স্নেহাধিকার সে মূঢ়ের মত ছাড়িয়াছে, আজ তাহা চিরদিনের জন্যই স্খলিত হইয়া গিয়াছে। কতদিন—কতদিন সে তার স্থান দখল করিয়াছে? হয় তো অনেক পূর্ব্বে, হয় তো এতদিনে সে

তার একমাত্র প্রাপ্য, তাঁর স্নেহের সমস্তটাই অধিকার করিয়াছে। যে স্মৃতি তার একমাত্র আনন্দের, যাহা এখনও বিপদে বল প্রদান করে, যে স্বর্গগতা জননীর কল্যাণময় অদৃশ্য স্নেহ স্পর্শ নিদ্রাজাগরণে এখনও সে সর্ব্বাঙ্গে অনুভব করিয়া পুলকে কণ্টকিত হয়, অনুতাপে দগ্ধ হইতে থাকে, সেই স্নেহ, সেই স্পর্শ, সেই আগ্রহপূর্ণ হৃদয়ের পুণ্যস্মৃতিটুকু ছাড়া এখন আর সেখানকার কিছুই তার নিজের বলিতে নাই, সে সমস্তই এখন হেমেন্দ্রের! বেদনায় নীরদের বুক শতধা বিদীর্ণ হইতে চাহিল। এর চেয়ে পাপের শাস্তি তার আর কি হইতে পারিত?

ভোরের বেলা গাড়ী তৈয়ার করিতে বলিয়া নীরদ কাগজপত্র লৌহ-সিন্দুকে আবদ্ধ করিয়া বাহির হইয়া গেল। ভৃত্যকে বলিল—"যদি কেউ আমার সন্ধান করে তো বলিস্, বিশেষ কাজে রামনাদ যাচ্চি ফিরতে দেরী হ'বে।"

ভৃত্য বিস্মিত হইয়া বলিল—"জিনিষপত্র?"

নীরদ অধীরভাবে মাথা নাড়িল—"কিছু না—কোন দরকার নেই।" মনের বিষম উত্তেজনায় আরও একবার সে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া অকূলে জীবনতরী ভাসাইয়া দিল।

১৬

যথাসময়ে আলোকমালায় মণ্ডিত পুরপ্রাঙ্গণে বাদ্যভাণ্ড হুলুধ্বনি শঙ্খরোলের মধ্যে শান্তির বিবাহ হইয়া গেল। বর হেমেন্দ্র দেখিতে অতি সুন্দর! তেমন কান্তিমান পুরুষ সর্ব্বদা চোখে পড়ে না। জামাই দেখিয়া বসুমতীর হৃদয়ের ক্ষোভ অনেকটা নিভিয়া গেল, তথাপি আর

একটি উন্নত মহিমাময় মুখ তাঁর মনের মধ্যে উঁকি দেয় নাই, এ কথা বলা যায় না।

বিবাহের পূর্ব্বেই শান্তি অনেকখানি বদলাইয়া গিয়াছে, সে আর কারণে অকারণে হাসে না, হাসিলেও সে হাসি তার ওষ্ঠাধরের সীমা ছাড়াইয়া চোখেমুখে উথলিয়া উঠে না। সুকুর সহিত ছুটাছুটি করিয়া খেলিয়া বেড়ায় না, পিতাকে যাহা খুসী প্রশ্ন করিয়া বিব্রত করে না, বিবাহের পাত্রীর উপযুক্ত স্থির ও গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছে। বিয়ের কনের স্বাভাবিক লজ্জা ব্যতীত তার এ পরিবর্ত্তনের প্রচ্ছন্ন কারণ ছিল; সে যে নীরদের মত লোকের মনকষ্টের কারণ হইয়াছে, ইহাতে নিজের প্রতি অত্যন্ত বিরক্তি ধরিয়াছিল। নিজের কথা কখনও সে ভাবিতে শিখে নাই, তাই আজও ভাবিল না।

কিন্তু বুকের মধ্যটা কেমন যেন থাকিয়া থাকিয়া হু-হু করিয়া উঠে, আর কান্না পায়। মধ্যে মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া সে ভাবে—আর কয়দিন পরেই কোন্ অচেনা ঘরে চলিয়া যাইবে, মাকে বাবাকে দেখিতে পাইবে না, সুকুকে কেমন করিয়াই বা সে ছাড়িয়া থাকিবে? কখনও বা বালিসে মুখ গুঁজিয়া ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া বহু চেষ্টা সত্ত্বেও আত্মসংবরণ করিতে পারে না। চোখে অজস্র জল আসিয়া পড়ে। বাবার খাবার আনিয়া ম্লানমুখে বসিয়া থাকে। মার গৃহ কার্য্যে সাহায্য করিতে করিতে অন্যমনা হইয়া যায়। সকল সময় হয় তো সুকুরই সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ঘটে না। মণিমালা বিদ্রূপ করে—"একদিন সব্বারই বিয়ে হয় লো, তা বলে, আর কেউ এর মধ্যেই এত করে বরের ভাবনা ভাবে না।" সুকু রাগিয়া বলে—"যাও দিদি, তুমি যেন কি হচ্ছ! আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে যাব না, শ্বশুরবাড়ী যাবার সময় নিয়ে যেও তুমি, ঐ কুনো বেড়ালটাকে।" মা সস্নেহে অশ্রু মুছিয়া ভাবেন—"শ্বশুর

বাড়ী যাবার ভয়ে মেয়ে আমার আধখানি হয়ে গেল! মাগো, আমি আমার লতিকে ছেড়ে কেমন করে থাকব!"

বিবাহের পর যখন বালার্কচ্ছটার ন্যায় বেনারসী সাড়ী-পরা সর্ব্বাঙ্গে রত্নালঙ্কারবিভূষিতা, অশ্রুমুখী, নতাননা সুন্দরী শান্তি সঙ্গিনী-পরিবেষ্টিতা হইয়া ধীর অনিচ্ছুক গতিতে গাঁটছড়া-বাঁধা বরের সহিত পিতার পায়ের কাছে প্রণাম করিল, তখন অদম্য অশ্রুজলের প্রবাহে স্থির ধীর প্রকৃতি রজনীনাথের দৃষ্টি রোধ হইয়া গিয়াছিল। তিনি কম্পিত দক্ষিণ করে ধীরে ধীরে ধানদূর্ব্বা তুলিয়া সুগভীর স্নেহ ধারায় সিক্ত করিয়া অন্তরের আশীর্ব্বাদের সহিত স্নেহাধারদ্বয়ের মস্তকে প্রদান পূর্ব্বক উভয়ের মস্তক চুম্বন করিলেন, তারপর পুরমহিলাগণের আদেশে কন্যার স্বর্ণমণ্ডিত দক্ষিণ হস্ত বরের হস্তের সহিত একত্র করিয়া গদ্-গদ্-কণ্ঠে জামাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হেম! আমার শান্তিকে আজ আমি তোমার হাতে দিলাম। তুমি তাকে বিপদে-সম্পদে রক্ষা করো পালন করো, তা'কে মনের মত গড়ে নিও। মা আমার! চিরসুখী হও।" তাঁর দুই চক্ষু হইতে আনন্দ মিশ্রিত বেদনা ঝরিয়া পড়িল। পিতৃহৃদয়ের সেই অশ্রুসিক্ত অনন্ত আশীর্ব্বাদ, মঙ্গল বন্ধনটিকে বুঝি আরও নিবিড় করিয়া তুলিল। তীর্থ সঙ্গমের মত পবিত্র সেই সম্মিলন যেন জাহ্নবীসলিল স্পর্শে পবিত্রতর হইয়া উঠিল। সেই করুণ দৃশ্যে দর্শকবৃন্দের নেত্রও ছল ছল করিতে লাগিল। তা'র পর রজনীনাথ শ্যামাকান্তের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া অশ্রুরুদ্ধস্বরে কহিলেন—"আমার লতিকে আপনাকে দিলাম।"

শ্যামাকান্ত ব্যস্তভাবে বাধা দিলেন—"ভাই! আমি যে তোমার কাছে কত ঋণী তা শুধু মা জগদম্বাই জানেন। তুমি আমায় যা দিয়েছ, এ পৃথিবীতে কেউ তা' দেয় নি, তুমি সন্তানহীনকে সন্তান দিয়েছ। এর

বাড়া আর কোন দান কোন ব্রত বড় রজনী? মা লক্ষ্মি! বাবার কাছে যেতে কি কাঁদতে আছে, মা! তা হ'লে তোমার এই ছেলে যে দুঃখ করবে, বলবে মা বড় একচোকো।"

অশ্রুজলে ভাসিয়া নববধূ শান্তি তার আজন্মের ঘরবাড়ী চিরদিনের স্নেহ নীড় ছাড়িয়া অপরিচিত সঙ্গীর সহিত কোন্ অজানা গৃহোদ্দেশে চলিয়া গেল।

সুপ্রকাশ নূতন পোষাক পরিয়া দিদির সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, দিদির কান্নাকাটি সে একটুও পছন্দ করিতেছিল না। এমন সুন্দর জামা কাপড়, এত গহনা ফুলের মালা পরিয়া এমন উৎসব সমারোহের মধ্যে চতুরশ্বযানে চড়িয়া দেশান্তর গমন,—এর মধ্যে যে কান্না পাইবার কি আছে, সুকু তাহা বুঝিয়াই উঠিতে পারে না! আশ্চর্য্য! মা বাবা পর্য্যন্ত কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল যে! সে যেদিন বর সাজিয়া মুক্তার মালা হীরার আংটি পরিয়া এমনি ধূমধামে বধূ আনিতে যাইবে, সেদিন যদি মা বাবা দিদি এমন করিয়া কাঁদিতে বসে, তা' হইলে সে কিন্তু ভারি রাগারাগি করিবে। দিদি যে এখনও অত্যন্ত ছেলেমানুষ ও নির্ব্বোধ রহিয়া গিয়াছে ইহা মনে করিয়া দিদির প্রতি একটু করুণাও হইল। দিদির কানের কাছে মুখ আনিয়া চুপি চুপি বলিল—"দিদি, কেঁদো না ভাই! আমি কাল কিছুতেই ফিরে আসব না, আমার ট্রাঙ্কের মধ্যে গোলকধাম আর দশপঁচিশ নিয়েছি, সেখানেও আমাদের খেলা হ'বে। তা'দের বাগানে লুকোচুরি খেলতে যদি না দেয় তো ছাদে খেলব!"

শুনিয়া দিদির অশ্রুপরিপ্লুত মুখ একটা স্নেহ-করুণ হাস্যের আভাষে বর্ষাকালে মৃদু সূর্য্যালোকের ছটার মত, ঈষৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

তা'র পর আবার তেমনি সমারোহের মধ্যে সে ইন্দ্রপুরীসমতুল্য প্রাসাদে শত হুলুধ্বনি ও মঙ্গলাচারের সহিত সাদরে গৃহীতা হইল। সেই পুরাতন প্রাসাদ আজ অনেকদিন পরে আপনার শোকমলিন অঙ্গ মার্জ্জিত করিয়া নূতন শোভায় সজ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল। মাত্র একটি হৃদয় ভিন্ন আজ সর্ব্বত্রই নূতন চিন্তা।—হায় দুর্ভাগ্য বিনোদ! এ কি তোমার দুর্জ্জয় অভিমানের পরিণাম!

ফুলশয্যা বৌভাত প্রভৃতি বিবাহের আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান সকল যথা-রীতি সুসম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহের রাত্রে বেদমন্ত্র এবং গুরুজনের আশীর্ব্বাদ বালিকা শান্তির ক্লান্ত হৃদয়ে একটি নূতন রেখাপাত করিয়াছিল, কিন্তু শুভদৃষ্টির সময় সকলের পুনঃপুনঃ অনুরোধে যখন সে লজ্জা মুকুলিত নেত্র সম্মুখস্থ চক্ষে স্থাপন করিতে গেল, ঠিক সেই সময় মণিমালার একটি কথায় তার হৃদয় একটা অজ্ঞাত ব্যথায় ক্ষুব্ধ চমকিত হইয়া উঠিয়াছিল। মুহূর্ত্তে সম্মুখের দৃশ্যপট অপসারিত করিয়া একটী কাতর হতাশ দৃষ্টি ও একখানা করুণ মুখ তার দৃষ্টি সমক্ষে ভাসিয়া উঠিল। চমকিয়া সে চক্ষু নত করিল, আর সেদিকে চাহিতে পারিল না।

ফুলশয্যার রাত্রে আদর করিয়া হেমেন্দ্র যখন তার মুখের ঘোমটা খুলিবার চেষ্টা করিয়া স্বহস্তে ফুলের পাখা দ্বারা বাতাস করিয়া বলিল—"ভারি গরম, কাপড় মুড়ি দিয়ে ঘেমে উঠ্‌চ যে, খুলে ফেল।" তখন সে চকিত চক্ষে দেখিল, চকিতের মধ্যেই দেখিল, সেই মুখ অতি সুন্দর। হেমেন্দ্রও তার দিকে চাহিয়াছিল, সে দৃষ্টি যদিও তেমন করুণ, তেমন উজ্জ্বল, তেমন মর্ম্মস্পর্শী নয়, তথাপি শান্তি মনে মনে স্বীকার করিল, সুন্দর মূর্ত্তি! কাহারও সহিত সে তুলনা করিল না, করিলে কোনখানে গলদ ঘটিত বলা যায় না, সে নত মস্তকে নীরবে এই অপরিচিতকেই চিরনির্ভর করিয়া ধরিল। মনে পড়িল বাসরে একজন ঠান্‌দি বলিয়াছিলেন—

"লতির আমাদের তপস্যা ভাল, যেন মদন-রতির মিলন হয়েছে!" হেমেন্দ্রও মুগ্ধ নেত্রে নব-পরিণীতাকে দেখিতেছিল, সেও মনে মনে বলিল —কুন্দ কিংবা সূর্য্যমুখী, রেবেকা কিংবা আয়েসা এমন সুন্দর ছিল কি? হ্যাঁ স্ত্রী হয় তো এমনই হওয়াই উচিত!

১৭

দ্বিপ্রহরের প্রথম সূর্য্যতাপে চারিদিক ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। আম-গাছের শীতল ছায়ায় বসিয়া মালী ও ভৃত্যদের ছেলেরা ঘুঁটি খেলিতে-ছিল। গৃহমধ্যে তালপাতার চেটাই পাতিয়া মালিপত্নী নিদ্রামগ্না। দক্ষিণে বৃক্ষচ্ছায়া ঘেরা পুষ্করিণী, চারিপার্শ্বে বাঁধা ঘাট এখন জনশূন্য। কেবল একধারে ঘাটে বসিয়া একটা নিষ্কর্ম্মা বালক জলের মধ্যে বঁড়সি ডুবাইয়া পাষাণ মূর্ত্তির মত বসিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। জমিদারের কোলাহল-মুখরিত অট্টালিকা দ্বিপ্রহরের বিশ্রাম অবসরে প্রায় নিস্তব্ধ। শুধু উচ্ছিষ্টাভিলাষী কাকের দল কড়ায় গণ্ডায় শোধ তুলিতেছিল। একা কার্য্যশেষে বিধু ঝি ঝাঁটা আস্ফালন করিয়া কাকেদের উদ্দেশ্যে গালি পাড়িতেছিল, "মর্ মর্ হতচ্ছাড়ারা! এত যে মানুষ মরে, তোদের তো মরতেও দেখি নে!—পেলেগে তবু হতচ্ছাড়া ইঁদুরও মরে, শুনতে পাই, কাকগুলোকেই কি বিধাতা মরণও দেয় নি গা! ওমা! কি একচোখো ঠাকুর গো! ছিষ্টিতে এত মনিষ্যি, এত জন্তু থাকতে অমর হলেন কিনা ওঁরা!"

নিজের নির্জ্জন ঘরে শান্তি মণিমালার নবপ্রসূত সন্তানের জন্য ফ্রক সেলাই করিতেছিল। নিকটস্থ খোলা জানালার মধ্য দিয়া ঈষদুষ্ণ বাতাস আসিয়া সুরভিলোভে তার খোলা চুল হইতে নড়িতে পারিতেছিল

না, উড়াইয়া উড়াইয়া তার দীর্ঘতা পরীক্ষা করিতেছিল, নাচাইয়া নাচাইয়া খেলা করিতেছিল, আবার ভিজা চুল শুকাইয়াও দিতেছিল। জানালার বাহিরে কার্ণিসের উপর একটা ঘুঘু বসিয়া আকুল বিরহ-গানে জগতের কর্ম্মাবসরে ক্লান্ত বিরহীর অর্দ্ধনিমীলিত তন্দ্রাজড়িত চক্ষের সম্মুখে করুণ বিরহ চিত্র প্রতিফলিত করিতেছিল। উদ্যানে বসন্তের পদচিহ্ন অশোকশাখার লোহিত রাগে ফুটিয়া রহিয়াছে। আম্রমুকুলের মদির সুবাসে ভ্রমরের দল মাতাল হইয়া ঢলিয়া পড়িতেছে। দেখিয়া দেখিয়া পাখীগুলার আনন্দ-কলরবের শেষ নাই।

সেলাই শেষ হইল। হাতে কাটা সূতায় বোনা লেসের ঝালর ঝুলাইয়া কল বন্ধ করিয়া সলজ্জভাবে একটু হাসিয়া ভাবিল—"না, আসবেন না।"

একপাশে কাঠের চৌকির উপর একটী সুদৃশ্য চরকা কারুকার্য্য করা আস্তরণে ঢাকা ছিল। শান্তি সেটি নামাইল। রঙ্গীন চুপড়িতে পাঁজ পাকাইবার শরকাঠি, বাগানের কাপাসতূলা এবং তূলা ধুনিবার যন্ত্র আছে, তৈয়ারী সূতাটুকু ছোট্ট লাটাইয়ে জড়াইয়া শান্তি সেটী পরীক্ষা করিল দুইটা পৈতা হইতে পারে কিন্তু লেশের জন্য একটু সরু সূতো চাই।

মধ্যাহ্ন নিদ্রা সারিয়া হেমেন্দ্রনাথ হঠাৎ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। বিবাহের পর প্রথম প্রথম সুন্দরী স্ত্রীকে চোখের আড় করিতে ইচ্ছা হইত না এবং সেই অত্যধিক লাভেচ্ছা পত্নীকে ক্লান্তও করিয়াছিল—হেমেন্দ্র বলিত—"সংসার দেখবার তোমার কি দরকার? যাঁরা বাড়ী জুড়ে বসে অন্ন ধ্বংস করছেন, তাঁরা দেখুন না, তোমার জ্যেঠামশায়ের সেবাও তো এতকাল চাকর দাসীতেই করে আসছে, তোমায় কি চাকরাণীগিরি করতে এনেছেন নাকি?"

এই সকল সদুপদেশ পালন করা শান্তির চক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। ঘৃণায় লজ্জায় সে মরিয়া যায়, কাজেই স্বামীর আদেশ লঙ্ঘন অনিবার্য্য হয়। এই সব লইয়া তাদের মধ্যে প্রায়ই মনোমালিন্য চলে। মধ্যে মধ্যে রাগ করিয়া হেম কথা বন্ধ করে। আব্দারে বালকের সখের পুতুলের মত দিনরাত নাড়াচাড়ায় নূতত্বের সাধ দুদিনে মিটাইয়া হেম সহসা একটা নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিল। বন্ধু যোগেশের উপদেশে হঠাৎ তার জ্ঞান হইল—সে এমন যে একটা লোক, ভাবী জমিদার, কিজন্য সে এমন করিয়া স্ত্রীর আঁচল ধরিয়া বসিয়া থাকে? সেই বরং হেমের সাক্ষাৎ লাভের জন্য আকুল হোক।

সেই শুভদিনে ভাবী কর্ত্তার খাসমহলটা বহির্ব্বাটীতে উঠিয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধু বান্ধবের আমদানী যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল, অন্দরের টান সেই পরিমাণে কমিয়া আসিল।

হেমেন্দ্র ঘরে পা দিয়া বিরক্তির স্বরে বলিয়া উঠিল—"চরকা নিয়ে বসেছ! আচ্ছা লোক তো দেখতে পাই! ভদ্র ঘরে এসেছ, জোলানীর মত ব্যাভার কেন? মেম রেখে দিচ্ছি, ভাল রকম শিল্প শেখ, ধ্যাৎ! এই জন্যেই তো আসি নে।"

শান্তি সলজ্জভাবে হাসিল, ধীরে ধীরে বলিল—"বারণ কর তো ছেড়েই দেব। বাবা বলেন, সূক্ষ্ম শিল্পের চেয়ে সুতো কাটা আমাদের এখন বেশী দরকার। সুতো তৈরি করতে আমারও খুব ভাল লাগে। বাবা বলেন, আগে আমাদের দেশের মেয়েরা ঘরে ঘরে সুতো কেটে তাঁতিদের কাপড় বুনতে দিত। বাবা—"

বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া হেম রুষ্ট স্বরে বলিল—"বলুনগে" তোমার বাবা,—তিনি যা বলেন তাইই যে বেদবাক্য এমনও কথা নেই! উকিল মানুষ তাঁর ওসব সাজে। আমাদের এত বাড়াবাড়ি করলে কলেক্টর

সাহেবের কু-নজরে পড়তে হ'বে। একে তাঁরই পরামর্শে বাবা সেদিন ওদের ক্লাব বিল্ডিংয়ের চাঁদায় মোটে পঞ্চাশটা টাকা সই করে একটা মহা অন্যায় করেছেন। তা'র উপর তোমরা যদি দেশশুদ্ধ লোককে তুলোর চাষ, তাঁত চরকা নিয়ে নাচিয়ে তোল তা হলে পথে দাঁড়াতে হ'বে। বলোতো একটা মেম গবর্ণেস রেখে দিচ্ছি, সাহেব শুনলে সুখী হ'বে খন।'

শান্তি নত মুখ তুলিয়া সবেগে বলিয়া উঠিল—"জ্যেঠামশায় পছন্দ কর্ব্বেন না!"

পরে বলিল, "এত টাকা মেমকে দিয়ে কি হবে? একে অতি-বৃষ্টির লোকসানীর জন্য প্রজাদের খাজনা কিছু ছেড়ে দিতেই হ'বে।"

ভাবী জমিদার সরোষে বলিয়া উঠিল—"মিথ্যে কথা, ফসলের কিছু কমী হয় নি! ও সব শালাদের বদমায়েসি ঐতেই সব গোল্লায় যা'বে, এ'ও শ্বশুরমশায়েরই পরামর্শ?"

শান্তি করুণদৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিল। হেমেন্দ্র ততক্ষণে সোফায় শুইয়া পড়িয়াছিল। আলস্য ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে বলিল—"আবার কি এক হুজুক উঠেছে সব নাকি তীর্থভ্রমণে যাবে?"

শান্তি উঠিয়া স্বামীর সোফা ঘেঁসিয়া মেঝেতে বসিল। স্বামী না ডাকিলে কাছে যাইতে সঙ্কোচ বোধ হয়। নিজের পূর্ণাধিকার গ্রহণ করিতে পারে না। এ গৃহের সে সর্ব্বময়ী গৃহিণী, গৃহস্বামী তাকে সে পদ মুক্ত হস্তে প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু নববধূ সে অযাচিত হইয়া পত্নীত্বের সার্ব্বভৌমত্ব গ্রহণ করিতে পারে না। উত্তর দিল—"জ্যেঠামশায় যা'বেন বলছেন।"

"জ্যেঠামশায় তো যা'বেন, তুমিও নাকি যাচ্চো?"

"হ্যাঁ।—জ্যেঠামশায়ের ইচ্ছা তুমিও যাও—তোমায় বলেন নি?"

"আমায়!" হেমেন্দ্র সাশ্চর্য্যে বলিয়া উঠিল—"আমার সে সাধ নেই। বাড়ী ঘর ছেড়ে, কোথায় বিদেশ বিভুঁইয়ে অস্থিত পঙ্ককে ঘুরে সারা হ'বো! ওঁরা বুড়ো হয়েছেন, তীর্থ ধর্ম্ম করুন গে', তোমায় আমায় টানাটানি কেন?"

শান্তি জিভ কাটিয়া শঙ্কিতস্বরে বলিয়া উঠিল—"জ্যেঠামশায় নিয়ে যেতে চাচ্ছেন, আমায় যেতেই হবে।"

হেমেন্দ্র মুখ ভার করিল—"বেশ, যাও—আমি যাবো না।"

স্বামী সঙ্গে যান, শান্তির ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কাহারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে তর্ক করা তার স্বভাব নয়। সে জানে সে ভিন্ন জ্যেঠামশায়ের আর কেহই নাই। আরও জানে তার কাছে জ্যেঠামশায় শুধু এইটুকু আশা করিয়াই তাকে ঘরে আনিয়াছেন।

রাত্রে আহারকালে পাথাহস্তে আসীনা বধূকে সম্বোধন করিয়া শ্যামাকান্ত বলিলেন—"আমাদের যাওয়া ঠিক তো মা?"

শান্তি ঈষৎ নতমুখে সলজ্জে উত্তর দিল—"হ্যাঁ জ্যেঠামশাই!"

"প্রথম কোথায় ওঠা যাবে, ঠিক করেছ?"

ক্ষুদ্রা জননী, জননীর মতই সস্নেহে হাসিয়া কহিল—"সে আপনিই ঠিক করুন না, জ্যেঠামশাই। আমি মনে করছিলুম, বৈদ্যনাথে একটু বিশ্রাম করে নেবেন, তারপর গয়া হয়ে কাশী যা'ব। আপনার শরীর ভাল নয়, একেবারে কাশী যেতে হয় তো টান পড়বে, কিন্তু আপনি—"

বৃদ্ধ জমিদার মুখ তুলিয়া সস্নেহে চাহিলেন—"আমার মা থাকতে আমি? না'মা, আমি তোমার অবাধ্য ছেলে নই।"

বলিতে বলিতে অজ্ঞাতসারে হৃদয় ভেদ করিয়া একটা নিশ্বাস বহিয়া গেল।

সংসারপথে চলিতে গিয়া মানুষ পদে পদে ভ্রম করিয়া বসে!

ভ্রান্তিপূর্ণ জগতের ইহা একটা অখণ্ডনীয় নিয়ম। মহামহাঋষিরা যখন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে একটা বিরাট ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নহে বলিয়া গিয়াছেন, তখন সামান্য মানুষ যা কিছু করে, যা চায়, যা আশা করে, সেগুলা কেমন করিয়া ভ্রমাত্মক না হইয়া সত্য হইবে? অনেক ভাবিয়া, বহু আশা করিয়া শ্যামাকান্ত গরীব হেমেন্দ্রকে প্রাণাধিক পুত্রের পরিত্যক্ত সিংহাসনে বসাইয়া মনে করিয়াছিলেন সেখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সে তাঁহারই হইয়া যাইবে—তাঁর সে আশা বিমানমার্গে নির্ম্মিত অট্টালিকাবৎ অচিরেই ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। এক বৃক্ষ হইতে ছাল কাটিয়া বৃক্ষান্তরে জুড়িয়া দিতে চেষ্টা করিলে যেমন জোড়া লাগে না, পোষ্যপুত্র লইয়া তাকে মনের মত গড়িয়া তুলিবার আশাও সেইরূপ বিড়ম্বনামাত্র।

গরীবের ছেলে বড়লোক হইয়া 'হঠাৎ নবাব' জীবেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিল। শ্যামাকান্ত দেখিলেন, বিনোদ বিপন্নের সাহায্য করিতে যে অর্থ ব্যয় করিত, তার বহুগুণ হেমেন্দ্র বিলাসিতায় উড়াইতেছে। দেখিতে দেখিতে হেমেন্দ্র রীতিমত বাবু হইয়া উঠিল। তার মোসাহেবের সংখ্যা রক্তবীজের ন্যায় দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিল এবং বিদ্যাদাত্রীদেবীর সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইল। নারায়ণগঞ্জের বাগানবাড়ী বিনোদের পিতামহের মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত ছিল। এখন সংস্কারের সঙ্গে পুরাতন স্মৃতির মত আবার সেই বৃহৎ উদ্যানপ্রাচীর ছাড়াইয়া নারী-কণ্ঠের স্বরলহরী ও নূপুর-নিক্কন বিস্মিত পথিকের কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল।

রজনীনাথ লিখিলেন—"হেমেন্দ্রের স্বতন্ত্র বাড়ীতে থাকিবার প্রয়োজন কি? আমার কাছে থাক।" শ্যামাকান্ত হেমেন্দ্রকে শ্বশুরের অভিমত জানাইলেন। হেম চটিয়া উঠিল—"শ্বশুরবাড়ী বাস করবো? আপনি এ কথা কি করে বল্লেন? তিনি এ কথা ব'লে যে, আপনাকেও অপমান করেছেন, আপনি কি বুঝতেও পারলেন না?"

শ্যামাকান্ত বুঝাইতে চাহিলেন, রজনীনাথের সহিত তাঁর সম্বন্ধ সে ভাবের নয়। রজনী তাঁর ছোট ভাইয়ের মত, তিনি যা বলিবেন, তারচেয়ে ভাল পরামর্শ আর কেহই দিতে পারিবে না। বিশেষ হেমেন্দ্রনাথের অবস্থায় শ্বশুরালয়-বাসে কেহ তাকে 'ঘরজামাই' ভাবিয়া অবজ্ঞা করিবে না। হেমেন্দ্র সে কথা কানেও তুলিল না, বলিয়া দিল, শ্বশুরের কাছে গিয়া সে থাকিবে না, তাতে পড়াশুনা তার হোক, আর নাই হোক! কিছুদিন পরে সে আরও সুস্পষ্ট বুঝাইল তার চোখ খারাপ। পড়াশুনা করিতে গিয়া অন্ধ হইবে কি? তা'রপর একজোড়া চশমা পরিয়া দার্জ্জিলিঙ্গে বেড়াইয়া আসিয়া থিয়েটার প্রভৃতি লইয়া লক্ষ্মীপুরে অস্থায়ীরূপে বসিল। শ্যামাকান্ত ভয়ে কথা বলিতে পারিলেন না। শান্তিও না। রজনীনাথ তীব্র তিরস্কার করিলেন। সে তাঁর উপর হাড়ে চটিল। মনের ঝাল মিটাইবার সুবিধা না পাইয়া যথালাভ বিবেচনায় শান্তির নিকটে অশেষ বিশেষে তার পিতৃনিন্দা করিল। শান্তি বসিয়া শুনিল এবং বলা শেষে নীরবেই উঠিয়া গেল। পিতার স্বপক্ষে সে একটি কথাও বলিল না। যে তাঁকে বুঝে না, কেন তাকে জোর করিয়া বুঝাইবে?

শান্তির এ সহিষ্ণুতা হেমেন্দ্র অপ্রতিহত গর্ব্ব বলিয়াই ধরিল। তার প্রতিও মন তার বিমুখ হইয়া উঠিল। যাকে দুকথা শুনাইলাম, সে যদি রাগই না করিল, তার বলার সুখটুকুই যে নষ্ট হইল। সরোষে মন্তব্য করিল—"যেমন বাপ তার তেমনি মেয়ে!"

বৈদ্যনাথে গিরিগর্ভস্থ মহাদেব-দর্শনান্তে গয়া, পরে গয়া হইতে কাশী পৌছিয়া শ্যামাকান্ত মিহরি পোখরায় বাসা লইলেন।

শান্তির এসব দেখা, কিন্তু শ্যামাকান্তের আত্মীয়ার দল মুগ্ধনেত্রে এই সকল স্থানের শুষ্ক বালুময় ধূলিকণাটা অবধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। বিশ্বেশ্বরের আনন্দধাম, বিশ্বমাতার রন্ধনশালা, যোগিবাঞ্ছিত পুণ্যক্ষেত্র—এখানকার পবিত্র বাতাসে সংসার-তাপদাহ জুড়াইয়া যায়। কতদিনকার এই কাশী! এই জনাকীর্ণ রাজপথ কত শত বৎসর মহা-মহর্ষিগণের পবিত্র পদাঙ্ক বক্ষে ধরিয়া গর্ব্ব-স্ফীত হইয়াছিল। এই নগর-গগন সামগানের গম্ভীরতানে স্পন্দিত মুখরিত হইয়াছিল, আর আজিও এই অবনতির শেষ যুগে হিন্দুর হিন্দুত্ব, সাধুর সাধুত্ব, অদ্বৈতবাদের অচল মহিমা এইখানেই একটু যা' প্রতিষ্ঠিত আছে। কত সিদ্ধর্ষি ব্রহ্মর্ষি আজও ইহার অঙ্কে অবস্থিতি করিতেছেন। এখান হইতে বিন্ধ্যাচল, প্রয়াগ হইয়া টুণ্ডলা দিয়া আগ্রা, জয়পুর পুষ্কর ও সাবিত্রী পাহাড়ে দেবী দর্শন করিয়া শ্যামাকান্ত উজ্জয়িনী গমন করিলেন। উদয়পুর, চিতোরগড় দেখিয়া আরাবলি পর্ব্বতপ্রাচীর বেষ্টিত গিরিপথে কত শত ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রাচীন কাহিনীর করুণ ও গৌরবময়স্মৃতি হৃদয়ে লইয়া শ্বশুর-বধূ আজমীরে ফিরিয়া আসিলেন।

আজমীর ইতিহাসপ্রসিদ্ধ এক সুপ্রাচীন ও সুসমৃদ্ধ নগরী। ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্যও অত্যন্ত রমণীয়। আরাবলির সমুন্নত ধূসর শৈলশ্রেণী চারিদিক দিয়া ইহাকে অটল প্রাচীরের মত পরিবেষ্টন করিয়াছে। মেঘের কোল হইতে সহরের জনাকীর্ণ রাজপথ পর্য্যন্ত সেই প্রাকৃতিক প্রাচীরের

বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত। এদিকে গিরি-প্রবাহিত সলিলরচিত সুদৃশ্য হ্রদ 'আনার-সাগর' তার তিন পার্শ্বে শৈলপ্রাকার। সম্মুখতীরে মর্ম্মর গ্রথিত নরহস্তরচিত মর্ম্মর রেইলবেষ্টিত প্রশস্ত দালান, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রীষ্মাবাস এবং সযত্নরক্ষিত আধুনিক ফ্যাসানে প্রস্তুত রাজকীয় প্রশস্ত উদ্যান। এই প্রস্তর প্রাসাদাবলী পূর্ব্বে মোগল সম্রাট আকবর এবং সাজাহানের কাছারীবাড়ী ছিল, এখন ইহা ইংরাজ চিফ-কমিশনরের আবাসগৃহ। পুষ্প-বাটিকার সে মহিমা সে গরিমা আর নাই, এখন ইহা সাধারণ ইংরাজ স্ত্রী পুরুষের ক্রীড়াকানন, দর্শকবৃন্দের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার স্থলমাত্র। আজমীরে দ্রষ্টব্যস্থল বিস্তর। আজমীর-রাজবংশীয় কীর্ত্তি, অধুনা যাহা 'আড়াইয়া-ঝোব্‌রা' নামে পরিচিত, তাহার সূক্ষ্মশিল্প ও নির্ম্মাণকৌশল অপূর্ব্ব। ইহার রচনা-অবস্থাতেই হিন্দুর সৌভাগ্যসূর্য্য অস্তমিত হইয়াছিল। মুসলমান অধিকারের পর ইহা পুনঃসংস্কৃত ও সমাপ্ত হয়, এবং ইদানীং ইহার অসম্পূর্ণ শোচনীয় ধ্বংসের উপর আমাদের আধুনিক রাজপুরুষগণের করুণাদৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে।

তারাগড় দুর্গে এখন বিদেশী বিজেতার বিজয়-বৈজয়ন্তী সগৌরবে উড্ডীয়মান। ধূসর গিরিমালার উচ্চতর চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত দুর্গটি প্রাচীন ভারত ইতিহাসের একটি গৌরব চিহ্ন। সেই উন্নত দুর্গ শিরে সমগ্র রাজপুত জাতির বিগত পুণ্যগৌরবময় রক্তপতাকা তাঁদের নির্বীর্য্য হৃদয়ে এক বিভীষিকাময় বেদনা-স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে।

তারাগড়ের ঠিক নীচেই পর্ব্বতগাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া সমতলভূমি পর্য্যন্ত বিস্তৃত, মুসলমানের পুণ্যতীর্থ 'আজমীর-সরিফ' ধর্ম্মের সহিত ঐশ্বর্য্যের মিলনে পবিত্রতায় ও সৌন্দর্য্যে ভারতের মধ্যে একটি দর্শনীয় স্থান। ভক্তের ভক্তি আরাধনার আন্তরিক প্রয়াস ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অতি পুরাতন হইতে বর্ত্তমানকাল অবধি সমস্ত সম্রাট নবাব

সেনাপতি ও ওমরাহগণের কিছু না কিছু কীর্ত্তি চিহ্ন ইহার মধ্যে আছেই। বাবর, হুমায়ুন, আকবরসাহ, জাহাঙ্গীর, ঔরঙ্গজেব হইতে হায়দার পর্য্যন্ত স্বনামখ্যাত ব্যক্তির এক একটি ফাটক, মসজিদ বা কোন কিছু দান এখনও তাঁহাদের নামকে এখানে সজীব রাখিয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রজাগণের দ্বারা জগদীশ্বরের সহিত উপমিত দিল্লীশ্বরের মসজিদ ভক্তজনোচিত পবিত্র এবং সৌখীন সম্রাট সাজাহানের মর্ম্মরপ্রাসাদ তাঁর রুচিরই অনুরূপ। প্রবেশদ্বারের উপর নহবৎখানায় চিতোরলুণ্ঠিত প্রকাণ্ড জয়ঢাক এখনও তেমনি মেঘমন্দ্র স্বরে প্রহরে প্রহরে বাজিয়া উঠে। কিন্তু সে শব্দ রাজপুত হিন্দুর হৃদয়ে আর তেমন অশনিনির্ঘোষে বাজে না। সে হিন্দু আর নাই— সে বিজেতা মুসলমানই বা কোথায়!

রাজকুমার কলেজ প্রভৃতি আধুনিক কালেরও কিছু কিছু দ্রষ্টব্য স্থান আছে। বন-পর্ব্বতমালা-পরিবেষ্টিত নির্জ্জন কানন মধ্যবর্ত্তী সাবিত্রী-পর্ব্বতের উচ্চচূড় মন্দিরাভ্যন্তরে শ্বেত প্রস্তরময়ী অপূর্ব্ব শিল্পকলার আদর্শ-মূর্ত্তি, সাবিত্রী ও সরস্বতী দেবী অধিষ্ঠিতা। উচ্চে দাঁড়াইয়া চারি দিকে চাহিলে, মন এক অননুভূতপূর্ব্ব শান্তিরসে পরিপ্লুত হইয়া যায়। বিশ্বশিল্পীর অনন্ত শিল্পচাতুর্য্যের অপূর্ব্ব পরিচয়! নীলাকাশের নীচে সুদূরপ্রসারী শৈলমালা শ্যামবৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে ক্ষুদ্র বৃহৎ গিরিতরঙ্গিনী আবার একপার্শ্বে মাড়বারমরু-বালুর অস্পষ্ট শুভ্র রেখা।

শান্তি যখন ফিরিয়া আসিল, তখন পাণ্ডার সহিত সরকার মহাশয়ের বেশ একটু বিবাদের সূত্রপাত হইয়া উঠিয়াছে। শান্তি ঘরে ঢুকিয়া সাগ্রহে বলিয়া উঠিল—কি চমৎকার মূর্ত্তি দু'টি জ্যেঠামশায়। আমার ইচ্ছে কর্‌ছে, আমাদের লক্ষ্মীপুরে অমন দু'টি মূর্ত্তি থাকে। আপনি যদি দেখতেন!"

ভক্তির আনন্দে সমুজ্জল বধূর মুখখানির দিকে সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া

শ্যামাকান্ত ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—"কেন মা, এই যে তাঁরি ছায়া আমার ভক্তিমতী জননীর মধ্যে আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি!"

অতি প্রশংসায় শান্তি লজ্জাকুণ্ঠিতা হইয়া উত্তর দিল—"খুব ভাল লাগ্‌ল জ্যেঠামশায়।"

পরে তারা দিল্লী হইয়া কুরুক্ষেত্র জ্বালামুখী ও হরিদ্বার ঘুরিয়া মথুরা বৃন্দাবন দর্শনে গমন করিলেন।

কুরুক্ষেত্র যুগান্তব্যাপী মহা শ্মশানস্মৃতি বক্ষে লইয়া উদাসভাবে পড়িয়া আছে। উদার আকাশে মহাগাম্ভীর্য্যময় অব্যক্ত সুর এখনও সেই মহা-ভারতের মহাযজ্ঞের মহাকাহিনী ব্যক্ত করিতেছে। এদেশের মৃত্তিকা এখনও যেন সেই স্রোতবাহিত শোণিতরাগে অনুরঞ্জিত। বাতাস শোক-গাথায় আজও ম্রিয়মাণ! হরিদ্বারে হিমরাজের ভীমকান্ত শোভা ও ধবলতরঙ্গার অনির্ব্বচনীয় রূপরাশি দেখিয়া সকলেই বিস্ময়জড়িত এক অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিল।

মথুরায় ধ্রুবঘাটের অদূরে যমুনার উপর বাসা লওয়া হইল।

মথুরায় কয়েকদিন বিশ্রাম লইয়া বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন।

সেই রাত্রে শান্তি বিছানায় না ঢুকিয়া নদীর দিকের জানালা খুলিয়া জ্যোৎস্নার আলোকে বসিল। একটা নূতন কথা যেন ক্রমেই বেদনার মধ্যে ব্যক্ত হইয়া পড়িতে চাহিতেছিল, তাকে বুঝি অল্পে চাপা দিয়া রাখা চলে না। হেমেন্দ্র তাকে হয়ত ভালবাসে না। বংশমর্য্যাদায় হেমেন্দ্র যে শান্তির পিতা অপেক্ষা বড়—ধনে মানে রজনীনাথ যে অনেক ছোট এবং এককালে তিনি তাদের আশ্রিত ছিলেন, এ কথা তাকে স্মরণ করাইয়া দিতে হেমেন্দ্র কখনও ভুল করে না। শান্তির সকল কার্য্যেই শ্লেষপূর্ণ বিদ্রূপের সহিত কখন অল্প কখন তীব্র সমালোচনা করা ছাড়া কখনও কি একটা ভাল কথা সে বলিয়াছে? 'বিদুষী', 'পণ্ডিতমশায়', 'এজিটেটার'

প্রভৃতি শব্দগুলাই ত তার সাদর সম্ভাষণ! সনিশ্বাসে শান্তি ভাবিল, আজন্মের সমুদয় সংস্কার, শিক্ষা না ভুলিতে পারিলে বুঝি ভাগ্যে তার স্বামীর সুখলাভ ঘটিবে না। চেষ্টা যত্ন করিলে তাকে তুষ্ট করিতে পারিবে না। তিনি এতই নিষ্ঠুর!

শ্যামাকান্ত একদিন হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন—"মা! হেম ত আমাদের চিঠিপত্র লেখে না!" সে কথায় শান্তির বুকের রক্ত হৃৎপিণ্ডের উপর ছলাৎ করিয়া পড়িল। মুখ নত করিয়া সে অঞ্চলের সূত্র টানিতে লাগিল, তার গাল দুইটা ও কপালটা একটু যে লাল হইয়া উঠিয়াছিল, পাছে জ্যেঠা-মহাশয় তাহা ধরিয়া ফেলেন, তা'ই ভাবিয়া সে সেই রক্তিমকে বর্দ্ধিত করিয়া তুলিল।

শ্যামাকান্ত তাঁর বড় আদরের বধূর প্রতি হেমেন্দ্রের উদাসীন অনাগ্রহে মনে মনে বড়ই ব্যথানুভব করিতেন। হেম যে তাঁর সহিতও সদ্ব্যবহার করিত, তাহা নহে, তবে নিজের প্রতি অসম্মান সহ্য করা যায় কিন্তু শান্তির অপমান যে অসহ্য! তবু মুখ বুজিয়া সবই সহিতে হইত, কারণ সে শান্তির স্বামী। সে যদি তাঁর শাসন না মানে কেমন করিয়া তিনি তাকে সংশোধন করিবেন? মনের সে বলও নাই, চেষ্টা উদ্যম কিছুই নাই। সে সবই সেই একজন সঙ্গে লইয়া চলিয়া গিয়াছে। এমন করিয়া তিনি তার সকল অন্যায় সকল আব্দার সইয়া সইয়া অন্যায়ের মাত্রা বর্দ্ধিত করিয়া তুলিতেছিলেন। ইহা যে শান্তির পক্ষেই অধিকতর ক্ষতিকর হইতেছে জানিয়া বুঝিয়াও চিত্তদৌর্ব্বল্যের বশে প্রতিকারের চেষ্টা করিতে পারিতে-ছিলেন না। সত্য কথা বলিতে গেলে, শ্যামাকান্তের প্রয়োজন ছিল শান্তিকে। হেমেন্দ্র তাঁর নিকট আদৌ লোভনীয় নহে, কিন্তু এখন তো আর সে কথা বলা চলে না, সে যে শান্তির স্বামী, চিরজীবনের সুখ দুঃখ যে একান্তভাবে তারই উপর নির্ভর করিতেছে, এ কথা ত অগ্রাহ্য করিবার

নহে ! তা'ই যখনই মনে হয়, লোভপরবশ হইয়া শান্তিকে তিনি অযোগ্যের হাতে প্রদান করাইয়াছেন, তখনই আত্মগ্লানিতে হৃদয় ভরিয়া উঠে। কেমন করিয়া হেমেন্দ্রকে শুধরাইয়া তুলিবেন, কি করিলে শান্তির সুখ অবিচ্ছিন্ন হইতে পারে, এই কঠিন সমস্যা যতই জটিল হইয়া উঠে, ব্যাকুলতা ততই বাড়িতে থাকে। পুত্রের প্রতি অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক ক্রোধ জন্মে। সে যদি ফিরিয়া আসিত, সেই তো তাঁদের সকল দুঃখের মূল !

দেওয়ানকে পত্র লিখিলেন—"হেমকে বলিও, সে যেন দুই একদিন অন্তর পত্র লিখে। তার হস্তলিখিত পত্র না পাইলে আমাদের তৃপ্তি হয় না। সে যেন ইহার অন্যথা না করে। সে এখন কোথায় আছে, তাহা জানি না বলিয়া তাহাকে পত্র লিখিলাম না। তুমি এই পত্র তাহাকে দেখাইও।"

কয়দিন পরে উত্তর আসিল—"ছোটবাবু কলিকাতা হইতে আসিলে তাঁহাকে আপনার পত্র দিলাম। তিনি বলিলেন, তাঁর অবসর নাই সেজন্য পত্র লিখিতে পারেন না। আপনাদের ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন কি ? সংবাদ তো পাইতেছেন। নারায়ণগঞ্জের বাগানে সাহেব ভোজের জন্য আমরা সকলেই অত্যন্ত ব্যস্ত আছি, বোধ হয় ইহাতে বিশহাজার টাকা খরচ পড়িবে। রাজরাজেশ্বরী দেবীপ্রতিমা গঠন প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে, বোধ হয় ভাদ্র পূর্ণিমার সময় দেবী প্রতিষ্ঠা হইতে পারিবে। মন্দিরেরও আর অধিক বিলম্ব নাই। ভাদ্র পূর্ণিমায় সমস্তই এক প্রকার দাঁড়াইয়া যাইবে। সেই সময় মাতাঠাকুরাণীকে লইয়া আপনি আসিলে সমস্ত প্রস্তুত দেখিবেন। ছোটবাবু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের চাঁদায় পঞ্চাশ হাজার টাকার সহি দিয়া আসিয়াছেন, শুনা যায়, সাহেব আপনার জন্য 'রাজা' খেতাবের চেষ্টা করিবেন।"

শ্যামাকান্ত এ পত্র শান্তিকে দেখাইতে পারিলেন না ! সরোষে

ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বক্তব্যটা এক সময় বধূকে বলিলেন। শান্তি খুসী হইয়া বলিয়া উঠিল—"আমি কাশী থেকে জরি চুমকি এনেছি, নিজে শাড়ি তৈরি করে পরাবো। আর অনেকগুলি গহনা করাতে হ'বে, না জ্যেঠামশায়? ঠাকুরের হাতের মাপ নিয়ে কাকা যেন চুড়ি বাউটি আর সোনার মল গড়িয়ে রাখেন। বাকি আমি নিজে পছন্দ করে গড়াবো। খুব ভাল করে সাজাতে হ'বে, জ্যেঠামশায়। না হলে রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি মানাবে কেন? আমাদের মা তো সত্যি কাঙ্গালিনী ন'ন! বাবা বলেন, তিনি সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী জগদ্ধাত্রী—তাঁর তেমনি মূর্ত্তিই হওয়া চাই তো?"

মুগ্ধ শ্যামাকান্ত কহিলেন—"তুমি যা করবে তার কি কিছু খুঁত থাকতে পারে, মা? এতদিন যক্ষের ধন কেবল সঞ্চয়ই করেছি, তার যে এমন সদ্ব্যয় হবে, তা স্বপ্নেও ভাবি নি। তোমার আতুরালয় ও অতিথিশালার বন্দোবস্তও নূতন করে করাচ্চি, একজন ভাল ডাক্তার ও কবিরাজের জন্য রজনীকে লিখতে হবে।"

আনন্দে বালিকার উজ্জ্বল চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল, সে কহিল—"এবার অনেক লোক থাক্‌তে পাবে তো? নাম কি থাকবে, জ্যেঠামশায়? ওর নাম জ্যেঠাইমার নামে হোক।"

যমুনাতীরে সুবিধামত বাড়ী পাওয়া গেল না। সেজন্য একটু দূরে রাস্তার উপর এক প্রকাণ্ড পাথরের বাড়ী ভাড়া লওয়া হইল। সেদিন ঘাটে বেশী লোক ছিল না। একটু বেলায় শান্তি যখন নারী বাহিনী সঙ্গে যমুনা স্নান করিতে আসিল তখন বৃষ্টি থামিয়াছে। ঘাটে জনকয়েক ব্রজবাসী স্নান করিতেছিল এবং এক পাশে একটি বাঙ্গালীর মেয়ে কাপড় কাচিতেছিল। মেয়েটি অত্যন্ত সুন্দরী। শান্তি তাহাকে দেখিয়া মাসতুত যাকে বলিল—"সেজদি, দেখ, ঐ মেয়েটি কেমন সুন্দর? এস না ভাই ওর সঙ্গে ভাব করি।" সেজদিদি যুবতীর দিকে অপাঙ্গে চাহিয়া তাচ্ছিল্যভাবে উত্তর করিলেন—"কি এমন সুন্দর! কোথাকার কে' তার ঠিক নেই, যার তার খোঁজে তোমার দরকার কি?"

কাপড় কাচিয়া ডুব দিয়া উঠিয়া যুবতী সিঁড়ির উপর হইতে পিত্তলের কলসী তুলিতে গিয়া দেখিল, এক জোড়া উজ্জ্বল কালোচোখ সিঁড়ির উপর হইতে সবিস্ময়ে তাকে লক্ষ্য করিতেছে।

শান্তির একেই মিশুনে স্বভাব, তার উপর এই খোট্টার মুলুকে অল্পবয়স্কা সুন্দরী বাঙ্গালিনী দেখিয়া সে, লুব্ধা হইয়াছিল। কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার বাড়ী কোথা, ভাই?"

যুবতী ঈষৎ বিস্মিতে শান্তিকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উত্তর দিল—"ঘাটের উপর!"

মাথায় নদীর জল একটু ছিটাইয়া দিয়া আলতাপরা পা দুটি জলে ডুবাইতে ডুবাইতে শান্তি কহিল—"আমাদের বাড়ী ভাই লক্ষ্মীপুরে, আপনারাও তো তীর্থ করতে এসেছেন!"

"এখানেই আমাদের বাড়ী।"

"বাপের বাড়ী না শ্বশুর বাড়ী, ভাই ?"

"বাপের বাড়ী !"

"আপনার শ্বশুর-বাড়ী কোথা ভাই ?"

মেয়েটী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অনুচ্চ স্বরে উত্তর দিল—"জানি নে।" বলিয়া ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া মাথা মুছিতে লাগিল। উত্তর শুনিয়া শান্তি আশ্চর্য্য হইলেও কৌতূহল দমন করিল, কিন্তু অল্পক্ষণেই জানিয়া লইল, নব-পরিচিতার নাম শিবানী, তার একটি শিশুসন্তান ও মা ভিন্ন কেহই নাই।

শুনিয়া শান্তির বড় কষ্ট হইল। শান্তির সঙ্গিনীরা তাকে 'গুঁড়ি-গুঁড়ি' বৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া যার-তার সঙ্গে অত কথা কহিতে দেখিয়া মৃদু অনুযোগ করিতে লাগিলেন। মাসিমা বলিলেন—"একি তোমার নীলেখেলা ! নিজের সোনার শরীরে একটুও কি মায়া নেই গো ?"

কাকীমা কহিলেন—"পাগলীর বেটির আমার সকল তা'তেই পাগলামী ! নাও, চান করে ঘরে চল, অসুখ বিসুখ হয় তো আমরাই মাথা চাপড়ে মরব।" ঠানদি' কহিলেন—"নাতবৌ ! তোর ভাই সকলি অনাছিষ্টি। যদি ব্যায়রাম হয়, শ্যামাকান্ত আমাদের বকবেন।" পিসি আঁচল দিয়া বধূর অঙ্গের বৃষ্টির জলকণা মুছাইয়া কহিলেন—"মা যেন আমার এ পিরথিবীর ন'ন ! অনাথ আতুর দেখলে, মায়ের আমার কচি প্রাণ গলে পড়ে, তা যেও গো, বাছা ! একদিন আমাদের বাসায় যেও। মায়ের আমাদের দয়ার শরীর।"

শান্তি লজ্জায় মাটি হইয়া গেল। শিবানীর স্থির চক্ষে ঈষৎ কৌতুকের হাসি অত্যন্ত সন্তর্পণে ফুটিয়া উঠিল। সে কলসী লইয়া আবার জলে নামিয়া গামছা কাচিতে লাগিল। কাছে আসিয়া সলজ্জে চুপি চুপি

শান্তি বলিল—"কিছু মনে করবেন না, ভাই! মাপ করুন!" শিবানীর দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠে একটু অবজ্ঞার হাসি ফুটিতে ফুটিতে মিলাইয়া গেল, উত্তর দিল—"কিছু না।" ভিজা গামছা কাঁধে ফেলিয়া মাজা কলসীতে জল ভরিতে লাগিল।

সঙ্কুচিতভাবে শান্তি কহিল—"আচ্ছা ভাই, কাল আবার আমি এই সময় স্নান করতে আসবো, আপনিও তখন আসবেন? বাড়ী তো খুবই কাছে।" শিবানীর পক্ষে এ নিমন্ত্রণে আগ্রহ বা অনাগ্রহ কিছুই ছিল না, সে শান্তির বস্ত্রালঙ্কার ও সঙ্গের লোকজন দেখিয়া তাহাকে 'বড়-লোকের বধূ' বলিয়া বুঝিয়াছিল। গরীব শিবানীর প্রতি তার এই সহৃদয় ব্যবহার, যাহা দেখিয়া পাঁচজনের দয়া বলিয়া ভ্রম হয়, তা পাইবার জন্য শিবানী কিছুমাত্র উৎসুক নয়, পৃথিবীর মধ্যে এই বস্তুটিকেই সে সব চেয়ে ঘৃণা করে। শান্তির আগ্রহে সে টলিল না। নিজের অক্ষুণ্ণ গর্ব্বের মধ্য হইতে সচল পাষাণ প্রতিমার মত ঈষৎ মস্তক হেলাইয়া সম্মতি প্রকাশ করিয়া কোনদিকে লক্ষ্যমাত্র না করিয়াই পূর্ণকুম্ভকক্ষে ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া গেল। তার আর্দ্র বস্ত্র হইতে জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। পদচিহ্নগুলি সিঁড়ির ধাপের উপর কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত লিখিত হইয়া রহিল। ভিজা কাপড় ক্ষীণ দেহে সংসক্ত থাকিয়া তার পর ম্লান সৌন্দর্য্যটিকে অধিকতর পরিস্ফুট করিয়া তুলিল। শান্তির চোখে যেন সবই নূতন ঠেকিল। সে আকৃষ্টভাবে সেইদিকে বহুক্ষণ চাহিয়া রহিল।"

শ্বশুরকে খাওয়াইতে বসিলে, সহসা তিনি প্রশ্ন করিলেন—"হেম কি চিঠি লিখেছে?"

শান্তি নীরবে ঘাড় নাড়িল। নিজের দুঃখে সে তাঁকে দুঃখিত করিতে অনিচ্ছুক থাকিলেও মিথ্যাই বা কেমন করিয়া বলে? শ্যামাকান্ত কথা না বলিয়া নীরবে আহার করিতে লাগিলেন। আজকাল এই

ব্যাপার লইয়া তাঁর মন অত্যন্ত উত্যক্ত হইয়া উঠিতেছিল, নিজের দিন তো শেষ হইয়া আসিতেছে কিন্তু তাঁর এই জীর্ণ তরীতে যে ক্ষুদ্র আরোহীকে তিনি কূলের জনপদ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তুলিয়া লইয়াছেন, মাঝনদীতে তাহাকে তিনি কোন আনাড়ি মাঝির হাতে ফেলিয়া যাইবেন ? এ কি করিলেন ? নিজের স্বার্থ খুঁজিতে গিয়া শান্তিকে তিনি কি জন্মদুঃখিনী করিয়া ফেলিলেন ? হেম এ'কি হইয়া উঠিতেছে ! মনের দুঃখে আহার্য্য তাঁর মুখে উঠিতে চাহিতেছিল না।

শান্তি বুঝিল, তাই সে তাঁকে ভুলাইবার চেষ্টায় অন্য কথা পাড়িতে গেল, গল্প করিবার ভাবে বলিল—"আজ ঘাটে একটি বাঙ্গালীর মেয়ে দেখে এলাম জ্যেঠামশায় ! তার মা আর একটি ছোট্ট ছেলে ভিন্ন আর কেউ নেই, তার বড্ড কষ্ট না জ্যেঠামশায় ?"

শ্যামাকান্ত এ সংবাদে সহানুভূতি দেখান উচিত ভাবিয়াই বলিলেন, —"আহা, বড্ড কষ্ট তো !" কিন্তু মনের মধ্যে মা ও একটি ছেলে ভিন্ন আর কেহ না থাকা যে খুবই কষ্টকর এমন বিশ্বাস তাঁর ছিল না।

"হ্যাঁ, জ্যেঠামশায় ! তার বড্ড কষ্ট ! সে সধবা কি না জানি না, সে কথা কিছু বল্লে না, কিন্তু হাতে লোহা আছে, আর একটী করে চুড়ি তাতেই সে এত সুন্দর, অনেক ভাল ভাল গয়না পরে মানুষকে অমন মানায় না ! মুখখানি কি সুন্দর, চোখদুটি যেন সুকুর চোখের মত !" শ্যামাকান্ত ঈষৎ স্নেহের হাসি হাসিলেন—"তাকে কি দিতে হ'বে মা ? সে তোমার সঙ্গে এসেছে বুঝি ?"

শান্তি অপ্রতিভভাবে বাধা দিল—"না, না—সে তো গরীব নয়, সে চাইবে কেন ? আচ্ছা, জ্যেঠামশায়, আমি যদি তা'র বাড়ী যাই, দোষ হবে ? ঠিক ঐ ঘাটের উপরেই তাদের বাড়ী, আমার তা'কে খুব ভাল লেগেছে !"

"তুমি কখন তো কিছু অন্যায় ইচ্ছা কর না, দোষ কিসের? তোমার মাসীমাকে সঙ্গে নিয়ে যেও।"

এমন সময় নিরামিষ অম্বলের বাটি হাতে মাসী-ঠাকুরাণী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিগা! কোথায় যাবার কথা বল্‌ছেন?"

শ্যামাকান্ত কথাটা বলিলেন, শুনিয়া জিহ্বা দংশন করিয়া মাসীমা সাতঙ্কে বলিয়া উঠিলেন—"ওমা! পাগলীর কথা শোন একবার! তুমি সে কুঁড়ের ভেতর কোন দুঃখে যা'বে গা, রাণী!"—বলিয়া শান্তির চিবুকে বাম হস্তের অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন—"আমার সোনার সীতে! —তা' চৌধুরীমশাই! আপনার বেটা বৌয়ের কল্যাণে যা লোক পাপ মুখে বলতে নেই, যা মনের সাধ ছিল, তা' মিটেছে, এখন যদি 'বন' করতে সরকারমশায়ের সঙ্গে পাঠিয়ে দেন, তা হলেই সঙ্কল্প সাঙ্গ হয়।"

শ্যামাকান্ত স্বীকার করিলেন। তাঁর চিত্তে যে বিষাদের ঢেউটা আজকাল ক্রমাগত উঠিতে পড়িতেছিল তাহা তাঁহাকে কেমন যেন দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছে। শান্তির চেষ্টা করিয়া উত্থাপিত তাঁর ছোটবেলার কথা কহিতে কহিতে সে বিষাদতরঙ্গ কোন সময় তার প্রাণ-খোলা সরল হাস্য-লহরীর ঝঙ্কার হৃদয়-প্রান্তে মিলাইয়া গেল। মানুষ বন্ধনে জড়িত হইতেই যে ভালবাসে, বন্ধন-মুক্তি ভগবানের দেওয়া যে কত বড় দান, সে কথা সে ভাবিতে চেষ্টা না করিয়া সেই শুভসুযোগকে অবহেলায় ফিরাইয়া দিয়া চির-হাহাকার বরণ করে। রহস্যময় জগতের এ রহস্য একান্তই নিগূঢ়।

প্রথম স্নানের ঘাটে ও তারপর দুপুরবেলা শিবানীর জীর্ণ গৃহেও শান্তি আসিতে আরম্ভ করিল। শিবানী প্রথম প্রথম ইহাতে অত্যন্ত অশান্তি অনুভব করিত, মানুষ বাড়ী আসিলে ভদ্রতার খাতিরে তার সঙ্গে কথা কহিতে হয়, তাকে যত্ন আপ্যায়ন না করা ভাল দেখায় না, কিন্তু শিবানী তার অভেদ্য গাম্ভীর্য্য-বর্ম্ম পরিয়া চারিপাশের পৃথিবীকে বহুদূরে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া অচল ধ্যানাসনে স্তব্ধ থাকিতেই ভালবাসে, জনসঙ্গ তার একটুও প্রার্থিত নয়। শান্তির অতিরিক্ত আদর তার পক্ষে ক্লেশ-দায়ক হইয়া পড়িল। সাধক সাধনার ব্যাঘাতে যে কষ্ট অনুভব করে, সেও তেমনি একটা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিত, কিন্তু সৌন্দর্য্যের একটা অপ্রতিহত প্রভাব আছে, সে সৌন্দর্য্য বাহিরের বা ভিতরের হোক, তাহার সংস্পর্শে আসিলে চুম্বকাকৃষ্ট লৌহের ন্যায় আকৃষ্ট হইতেই হইবে। শান্তির এই উভয় সৌন্দর্য্যই শিবানীর কঠিন লৌহবর্ম্ম ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল! লোহা কাটিয়া যে অস্ত্র বক্ষে বিঁধে, তার শক্তি সামান্য নয়! নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও গরীবের মেয়ে শিবানী রাজবধূ শান্তিকে ভালবাসিয়া ফেলিল। শান্তি অল্প দিনেই তাকে চিনিয়াছিল। সেই জন্য সে এ পর্য্যন্ত তাকে তাদের বাসায় নিমন্ত্রণ করে নাই, তাদের সাংসারিক অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করে নাই, তাকে এতটুকু সাহায্য করিবারও চেষ্টা পায় নাই! আজ যখন তারা অনেকখানি কাছাকাছি পৌঁছিয়াছে, তখন সে কথাটা পাড়িল। কথাটা এই যে সে তার শ্বশুরের সহিত পরামর্শ করিয়াছে যে, তারা শিবানীর নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর অনুসন্ধান করিবে। শান্তি বলিল—"তাঁর কোন ফটো কি হাতের লেখা কিছুই কি তোমার কাছে নেই? শুধু একটি হীরের আংটি?"

সেই ছোট্ট ঘরের জানালার নিকট বসিয়া দুজনের কথা হইতেছিল। অদূরে শিবানীর পুত্র সদ্যোপ্রাপ্ত উপহারের চুপড়িটি লইয়া ব্যাপৃত রহিয়াছে, মধ্যে মধ্যে চুপড়ি হইতে রঙিন কাঠের খেলনাগুলি নামাইতে নামাইতে—'ঐতা ঘোয়া, এতা গয়ু, এতা উম্মান'—ইত্যাদি যথেচ্ছ নামে যাহাকে খুসি অভিহিত করিতেছিল—নিজের বুদ্ধির উপর যে তার অটুট বিশ্বাস আছে, ইহাই প্রমাণিত হইতেছিল।

কথাটা শুনিয়া শিবানী চমকিয়া উঠিল। তারপর একটু প্রকৃতিস্থা হইয়া একটা শ্বাস মোচন করিল—"আর কেন? যে স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই সে স্বপ্ন জাগিয়ে কি হবে?—তুমি আমায় ভালবাস, আমার উপকার করতে চাইছ, জানি না তাতে আমার উপকার কি অপকার হ'বে। যদি এ বিশ্বাস আমার ভেঙ্গে যায়, যদি সত্যই জানতে পারি, আমি—আমি—বিধবা, তবে কি নিয়ে থাক্‌ব শান্তি?"

শিবানীর কণ্ঠ শান্তির বক্ষে সজোরে আঘাত করিল। "না, নিশ্চয় তিনি বেঁচে আছেন।"

শিবানী সুগভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া স্বপ্নাভিভূতার ন্যায় মৃদু-স্বরে কহিল—"তাই বল, তাই বল—সত্য হোক—মিথ্যা হোক—তবু বল তিনি আস্‌বেন, বল আমি সধবা।"

বিদায়কালে শান্তি ক্রীড়ারত অমূল্যকে কোলে তুলিয়া চুম্বন করিতে করিতে বলিল—"কই, আংটিটা?" শিবানী কাঠের সিন্দুক খুলিয়া কাগজে মোড়া একখানি ফটোগ্রাফ ও আংটিটি বাহির করিয়া দিয়া বলিল—"এই দু'টি তাঁর মার জিনিষ, আমায় যত্ন করে রাখতে দিয়েছিলেন, তাঁর আর কোন চিহ্নই আমার কাছে নেই।"

শান্তি অমূল্যকে কোলে লইয়া আদর করিতে করিতে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল, শিবানীও তার অনুসরণ করিল। গাড়িতে উঠিতে উঠিতে

মুখ ফিরাইয়া শান্তি শিবানীর দিকে চাহিল, মৃদু হাসিয়া অমূল্যকুমারকে দেখাইয়া বলিল—"ছেলে নিয়ে যাই?" শিবানী সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া ঈষৎ হাসিল। শান্তি আবার ফিরিয়া আসিয়া ছেলেকে মায়ের কোলে দিয়া বিনীতভাবে বলিল—"একদিন আমাদের ওখানে পায়ের ধূলো কি পড়্‌বে না?"

"যাব বৈকি!" বলিয়া শিবানী চুপ করিল। কোথাও যাওয়া যেন তার পক্ষে মহা দায়। "তবে কালই যেও ভাই!—সকালেই গাড়ী পাঠাব। মাসীমাকেও নিয়ে যেও, তাঁকে যে বলে যাওয়া হলো না, তিনি যে বাড়ী নেই!"

"কালই? আচ্ছা।" বলিয়া শিবানী ছেলেকে কোল হইতে নামাইয়া দিতেই সে ছুটিয়া তার পরিত্যক্ত খেলনা লইতে চলিয়া গেল। শান্তি গাড়ীতে উঠিতে গিয়া আবার ফিরিয়া আসিল—"একটা কথা, তোমার স্বামীর নামটা তো জানা চাই।" শিবানী উত্তর দিল—'কাল লিখে দিলে হ'বে না?"

সে রাত্রে শ্যামাকান্তের শরীর মন সুস্থ ছিল না বলিয়া তিনি আহার করিলেন না। বধূর সঙ্গেও বেশী কথাবার্ত্তা হইল না, কাজেই সেদিন আংটি ও ছবি বাক্সের মধ্যেই বন্ধ রহিল।

পরদিন সিদ্ধেশ্বরীর পরিবর্ত্তে মাতঙ্গিনীকে সঙ্গে লইয়া শিবানী সখীর বাড়ী নিমন্ত্রণ রাখিতে আসিল। শান্তি অমূল্যকে ও নিমন্ত্রিতাদ্বয়কে আদর করিয়া গ্রহণ করিল। শ্যামাকান্ত আহার করিতে বসিলে তাদের অন্ত ঘরে বসাইয়া শান্তি অমূল্যকুমারকে কোলে লইয়া এ ঘরে আসিল। এমন চাঁদের মত ছেলেটি জ্যেঠামহাশয়কে না দেখাইয়া তার আরাম হইতেছিল না। শ্যামাকান্ত মাথা নীচু করিয়া অন্তমনস্কভাবে আহার করিতেছিলেন, শান্তির চুড়ির শব্দে চাহিয়া দেখিলেন,

ছেলেটিকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কাদের ছেলে মা ?"

শান্তি শিশুকে কোল হইতে নামাইয়া পাখা হাতে শ্বশুরের কাছে বসিল। অমূল্য সবিস্ময়ে তার বড় বড় চোখ দুটী বিস্ফারিত করিয়া শান্তির গায়ে হেলিয়া বৃদ্ধকে দেখিতে লাগিল। শান্তি পরিচয় দিল—"সেই যে মেয়েটির নাম শিবানী—যা'র কথা আপনাকে বলেছিলেম, ছেলেটি তার, খুব সুন্দর, নয় ?"

শ্যামাকান্ত একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া নীরবে শিশুকে দেখিতে লাগিলেন। অপরিচিতের দৃষ্টিতে বালক কেমন একটু বিব্রত হইয়া শান্তির কাছে আরও ঘেঁষিয়া আসিল, তারপর সেও মুখের মধ্যে একটা অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করিয়া গম্ভীর ভাবে তাঁর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। শ্যামাকান্ত হঠাৎ দৃষ্টি ফিরাইয়া আবার একটা যন্ত্রণা-ব্যঞ্জক সুগভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন, চক্ষের দৃষ্টি বিপর্য্যস্ত এবং বুকখানা উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, দৃষ্টি যেন সেখান হইতে আর ফিরিয়া আসিতে চাহিতেছিল না। তারপর সহসা একান্ত কাতরস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"মা ! মাগো ! একে কোথা থেকে নিয়ে এলি, মা ?—আমার সেই ছোট্ট মুখ, ওরে—সে যে এখনও স্পষ্ট এই বুকের ভিতর আঁকা রয়েছে ! এ যে তা'রই জীবন্ত ছায়া—এ যে সেই—সেই—সেই আমার বিনো !—ওরে বিনু আমার আবার কি তুই তেমনি ছোট্টটি হয়ে আমায় দেখা দিতে এলি রে ?"—বলিতে বলিতে হঠাৎ আত্মবিস্মৃত বৃদ্ধ আত্মসংবরণ করিয়া লইলেন, অত্যন্ত বিদাদের ক্ষীণ মৃদুতর হাসি হাসিয়া কহিলেন—"পাগলের কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গেছ মা ! কিন্তু সবটাই পাগলামী নয় ! একে দেখে আমার একটি ছোট্ট মুখ মনে আসছে। সুন্দর ছেলেরা বুঝি ছোটবেলায় সবাই এক রকমই থাকে ? না মা !—বেশ ছেলে, এস তো

দাদাভাই! আমার কাছে এস তো দাদু! বলিতে বলিতে সাগ্রহে তিনি শিশুর দিকে উভয় বাহু প্রসারিত করিয়া দিলেন। শান্তির মৃদু অনুরোধে বালক ঈষৎ ভয়ে ভয়ে শ্যামাকান্তের নিকট এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইয়া গেল। শ্যামাকান্ত তাহাকে দুই হাতে টানিয়া কোলে বসাইয়া অতৃপ্ত নেত্রে দেখিতে লাগিলেন। "দেখ মা! খোকার হাতখানি ঠিক তা'র মত, কপাল, চুল, চোখ—কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য!—তোমার নামটি বল তো দাদুন্!"

বালক একবার অদূরবর্ত্তিনী শান্তির দিকে চাহিয়া সভয়ে অস্ফুট-কাকলীতে বলিল—"অমূয়কুমাই চৌদুলী।" শান্তির নিকটেই সে নিজের নাম বলিতে শিখিয়াছিল।

"অমূল্যকুমার চৌধুরী!—চৌধুরী? তোমার বাবার নাম জান কি খোকা?"

'বাবা' শব্দটা বালকের তেমন পরিচিত নহে? সে তাই ইহার অর্থবোধ করিতে পারিল না, একবার ইহার একবার উহার মুখপানে চাহিয়া দেখিল। শান্তি বলিল—"আমি জেনেছি,—তাঁর নাম নীরদকুমার চৌধুরী, তাঁরাও বারেন্দ্র শ্রেণী।"

শ্যামাকান্তের মুখে ঘোর হতাশার চিহ্ন প্রকাশিত হইল, শান্তি তাহা লক্ষ্য করে নাই, অঞ্চলপ্রান্ত হইতে অঙ্গুরী ও ছবিখানি বাহির করিতে করিতে সে বলিতে লাগিল—"তাঁর দেশ কোনখানে, সে কথা তিনি শিবানীকে জানান্ নি, জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, সময় এলে সবই জানাব। এখন আমার অজ্ঞাতবাস।'—এই হীরার আংটিটি আর ছবিখানি ওকে রাখতে দিয়েছিলেন, এ থেকে যদি সন্ধান করা যায়, তা'ই চেয়ে এনেছি।" বলিতে বলিতে সে মোড়ক খুলিয়া ছবিখানার উপর নেত্রপাত করিল। সে চিত্র একটি মধ্যবয়স্কা সুন্দরী নারীর। অস্পষ্ট হইয়া

আসিলেও চেহারা চিনিবার পক্ষে ব্যাঘাত জন্মায় না। ছবির দিকে চাহিয়াই শান্তি কিন্তু চমকাইয়া উচ্চকণ্ঠে কহিয়া উঠিল—"একি! এ কার ফটো?—এ' এ শিবানীর শাশুড়ীর কেন হ'বে? এ জ্যেঠাইমার সেই বড় ব্রোমাইডটার নেগেটিভ।"

"কি? কি? কি বল্লে, মা?" আগ্রহতাড়িত উচ্চকণ্ঠে এই কথা বলিয়া শ্যামাকান্ত বধূর হাত হইতে ফটোগ্রাফখানি প্রায় ছিনাইয়া লইলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁর হাত দুইটা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তারপর শিথিল অঙ্গুলিচ্যুত হইয়া চিত্রখানা ভূমে পড়িয়া গেল।

বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কেহ কোন কথা কহিতে পারিল না। এই অচিন্তনীয় ব্যাপারে শোকাহত বৃদ্ধ এবং চঞ্চলচিত্তা বালিকা উভয়েই অভিভূত হইয়া রহিল। তারপর অবসন্ন শরীরে সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে, শান্তি হীরকাঙ্গুরীয়টা তাঁর সম্মুখে ধরিল, "দেখুন তো, এটা চেনেন কি? এটা তিনি যত্ন করে রাখতে বলেছিলেন—বলেছিলেন তাঁর মার দেওয়া।"

শ্যামাকান্ত বিদ্যুৎ তাড়িতবৎ চমকিয়া উঠিলেন—"আংটি? ঠিক কথা। তা'র মায়ের নাম লেখা হীরার আংটি তা'র হাতে থাকৃত, ভিতর দিকে কিছু লেখা আছে কি না, দেখ ত মা। তা'র নাম লেখা ছিল মনে হচ্চে।" শান্তি শ্বশুরের নির্দ্দেশে দেখিল, অঙ্গুরীর ভিতর দিকে বাঙ্গালা অক্ষরে "ভুবনমোহিনী" নাম খোদা। আংটি শ্বশুরের হাতে দিয়া পুলক কম্পিত স্বরে কহিল—"আছে।"

শ্যামাকান্ত নামটা পড়িয়া আর কোন কথাই বলিতে পারিলেন না, শিশুকে উভয় বাহুর মধ্যে টানিয়া সবলে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। তাঁর চোখের অবিশ্রান্ত ধারায় হতবুদ্ধি বালকের অনাবৃত অঙ্গ ভিজিয়া গেল, সে এই অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাপারে এতই বিস্মিত হইয়াছিল যে তাঁর হাত

ছাড়াইয়া পলাইতেও ভুলিয়া গিয়া সাশ্চর্য্যে তাঁর আকুল ক্রন্দন দেখিতে লাগিল।

তারপর শান্তি চোখের জল মুছিতে মুছিতে শিবানীর নিকট ছুটিল। তার কাছে এই মুহূর্ত্তেই যেন সে নিজেকে অপরাধিনী বলিয়া অনুভব করিতেছিল। ছি, ছি, সমস্ত রাজ-ঐশ্বর্য্যের প্রকৃত অধিকারিণী যে, সে কি না আজ দীনা অনাথিনীভাবে কোথায় পড়িয়া আছে, আর তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার কাড়িয়া লইয়া ভোগ করিতেছে কি না সে নিজে।

শান্তির সহিত অর্দ্ধমূর্চ্ছিতা শিবানী আসিয়া যখন শ্বশুরের পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া বসিয়া পড়িল, তখন শ্যামাকান্ত বাহুবদ্ধ নাতিকে নামাইয়া অবগুণ্ঠনবতী বধূর হাত দুইখানা নিজের কম্পিত শীর্ণ হস্তের মধ্যে গ্রহণ করিয়া তাহাকে নিকটে টানিয়া লইলেন, তার মাথাটা বুকের উপর রাখিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলেন—"মা! মা! আমার হারানিধি আবার কেন হারালি, মা! আমার অমূল্যধনকে কেন আমায় এতদিন দিস্ নি, মা? আমার নয়নতারা হারিয়ে যে আমি অন্ধ হয়ে গিছ্‌লুম।" স্বামীহীনা ও পুত্রহারার বিরহসন্তপ্ত চিত্তের অজস্র অশ্রুজলের মধ্যে উভয়ের একমাত্র ধ্রুবতারার ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি অমূল্যের আজ অভিষেক হইয়া গেল। সেও এত কান্না দেখিয়া বেশীক্ষণ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, সহসা ঠোঁট ফুলাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। শান্তি সে দৃশ্য সহিতে পারিতেছিল না, সে নিজের অশ্রু সংবরণ করিতে করিতে উঠিয়া গেল।

সেদিনের আনন্দের প্রথম উচ্ছ্বাসে বিষাদের সুরটাই ক্রমাগত বাজিতে লাগিল। অশ্রুর উৎস একবার বহিতে আরম্ভ করিলে আর তাহাকে থামান যায় না। শিবানীর স্থির গাম্ভীর্য্য ঘোর বিষাদের অশ্রুরূপে ঝরিয়া এতদিন পরে পড়িল। এতদিন সে যেন কোনখানেই

এতটুকু আলো দেখিতে পাইতেছিল না। সমস্ত জীবনটাই যেন তার পক্ষে একটা অভেদ্য রহস্যময় জটিল উপন্যাসের মত ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছিল। একটা বৈচিত্র্যপূর্ণ স্বপ্নের স্মৃতি, বাকী সবটাই ঘন অন্ধকার লইয়া তার শূন্য হৃদয়খানা একান্ত হা হা করিয়া ফিরিতেছিল! মৃত্যুর যুগান্তব্যাপী অন্ধকারের মত তাহা যেন তাহাকে অচ্ছেদ্য নাগপাশে আঁটিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, কোথাও সে এমন একটু ফাঁক পাইত না যে, সেখান দিয়া তার বন্ধনমুক্ত প্রাণটা মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত হাল্কা হইয়া বাহিরের বাতাসে উড়িয়া বেড়ায়। আজ সহসা সেই জীবনরহস্যের শেষ অঙ্ক অভিনীত হইয়া গেল! আজ সকল প্রহেলিকা তাহার নিকট সত্যের আলোকে সুপরিস্ফুট হইল। সেই দুর্জ্জেয় অভিমানও আজ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া সে বাণবিদ্ধার ন্যায় অন্তরে অন্তরে লুটাইয়া পড়িল। হায়! যে জন রাজ্যেশ্বর রাজা, দরিদ্রা নির্গুণা শিবানী তাহাকে কেমন করিয়া ধরিয়া রাখিবে? এই অতুল পিতৃস্নেহও যে অভিমানকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই, সে কি শিবানীর প্রেমে প্রতিহত হইবার?

সেদিন মাতঙ্গিনীর বড় আনন্দের দিন। সত্যই তিনি নিরাশ্রয়া বালিকার জন্য মনে মনে বড়ই উৎকণ্ঠিতা ছিলেন। আজ অকস্মাৎ সেই শিবানী এই রাজ্যেশ্বরতুল্য ধনপতির একমাত্র পুত্রবধূ জানিয়া তিনি আনন্দে ও বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তারপর সহসা উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদিয়া ফেলিলেন? কাঁদিয়া বলিলেন—"মাগো, তোর যে একটা হিল্লে হ'ল, এ আনন্দ রাখবার আর ঠাঁই নেই! নীরদ আমার বেঁচে আছেন, আবার তাঁ'কে তুমি ফিরে পা'বে মা, রাজরাণী হয়ে স্বামী পুত্তুর নিয়ে সুখে ঘর করবে। আহা, দিদি যদি এখন এখানে থাকৃত! কে জানে ঠাকুরবাড়ী থেকে কতদিনেই ফিরবে, ইচ্ছে কর্‌ছে যে, ছুটে যেয়ে খবরটা দিয়ে আসি।"

দিন দুই পরে বনভ্রমণ সারিয়া প্রবীণার দল ফিরিয়া আসিলেন, মাসীমা অর্দ্ধেকটা শুনিয়াই শিবানীর চিবুক স্পর্শপূর্ব্বক সস্নেহে নিজের অঙ্গুলি চুম্বন করিয়া কহিলেন—"ওমা, তাই জন্যেই সেদিন তোমায় দেখে আমার মনটা এমন চঞ্চল হয়েছিল, বটে! ক'দিন ধরেই ভাবছি, বলি উটি বুঝি আমার আর জন্মের মেয়েগো!" তা'রপর ক্রন্দনজড়িতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"ওগো, বিনুর বৌ যে আমার পেটের মেয়ের বাড়া গো! ওরে বিনু, বাবারে! এমন সোনার প্রীতিমে ভাসিয়ে দিয়ে তুই কোন প্রাণে পালালি রে? ওগো, এমন চাঁদের মত পৌত্তুর থাকতে চৌধুরীমশাই কোন্ প্রাণে পুষ্যিবেটা নিলে গো!"

শ্যামাকান্ত বলিলেন—"এখন আমার দু'জন মা হ'লেন, মা! বৌমা হ'বেন বড় মা, আর তুমি ত চিরদিনের আছই। এবার তবে বাড়ী ফেরা যাক, রাজরাজেশ্বরী প্রতিষ্ঠার আর তো বেশী দেরিও নাই।"

শান্তি একটু ভাবিয়া বলিল—"দিদির মা পুরী থেকে ফেরা অবধি অপেক্ষা করলে ভাল হয় না?"

২৭

সেদিন লক্ষ্মীপুরে চৌধুরীবাড়ী ভারী ধুম।

ঠাকুরদালানে মোটা মোটা থামের মাথায় দেবদারু পত্রের বিচিত্র কটক; দ্বারে দ্বারে আমপাতার মালা ঝুলান, রাঙ্গা নিশানে লাগান সরু মোটা নানা আকারের জরিগুলায় রৌদ্র পড়িয়া ঝক্‌ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। পুরাতন মন্দিরের মধ্যে রূপার দোলনায় রাধাশ্যামের যুগলমূর্ত্তি স্থাপিত, ধূপের পবিত্র গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়া উঠিতেছিল। মন্দিরের অঙ্গ

ভাগে রাধাশ্যামের পার্শ্বেই এক মর্ম্মর বেদীর উপর রজতকান্তি মহাদেবের বক্ষোপরি বিরাজিতা অসুরনাশিনী মহাশক্তি। কোটি ব্রহ্মাণ্ড তাঁর কণ্ঠের মুণ্ডমালা, হস্তে জ্ঞান-অসি ধারণ করিয়া তিনি অজ্ঞানরূপী দানব-গণকে নিহত করিতেছেন, মা'র যোগীন্দ্র-বাঞ্ছিত পদস্পর্শে শবও শিবত্ব লাভ করিয়াছেন। পরমা প্রকৃতি এক্ষণে পরমাত্মা সংমিলনে সৃষ্টিস্থিতি-সংহারকারিণী। শ্যামামন্দিরের বামভাগে নূতন মন্দির উঠিয়াছে, সুন্দর সুন্দর কারুকার্য্যযুক্ত দুগ্ধফেনশুভ্র দেবালয় নির্ম্মল সূর্য্যালোকে সবুজ গাছগুলার মাঝখানে নীল আকাশের প্রান্তে পুঞ্জীকৃত শুভ্র মেঘখণ্ডের মত দেখাইতেছে। পত্রে পুষ্পে মঙ্গল ঘট ও কদলী বৃক্ষে সুশোভিত এই মন্দির—শান্তির সাধের রাজরাজেশ্বরীর মন্দির। মহাসমারোহে মন্দির-প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হইয়া গেল। পূজা হোম হইয়া গিয়াছে, চণ্ডীপাঠ শেষ হয় নাই। দ্বাদশজন ব্রাহ্মণের মধ্যে পণ্ডিত হরিনারায়ণ ভক্তিগদ্‌গদ কণ্ঠে সুললিত ভাষায় পাঠ করিতেছিলেন—

"দেবী প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ,—
প্রসীদ মাতর্জ্জগতোঽখিলস্য,
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরী পাহি বিশ্বম্
ত্বমীশ্বরী দেবী চরাচরস্য॥"

ফোঁটা তিলক কণ্ঠিধারী ভক্তগণ এবং ছাইমাথা গেরুয়া-পরা সন্ন্যাসী অবধূত অনেকগুলি একত্র হইয়া কেহ রাধাশ্যাম-মন্দিরের দালানে কেহ রাজরাজেশ্বরী মন্দিরের সম্মুখে তর্ক-বিতর্ক কলহ-কোলাহলের দ্বারা পূজা বাড়ী সরগরম রাখিয়াছিল। ঠাকুরবাড়ী ও অতিথিশালায় আজ সুবৃহৎ যজ্ঞের ব্যাপার চলিতেছিল। শান্তি দেবী দর্শন করিতে আসিল। জয়পুরী শিল্পীর ভাস্কর্য্য-নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠাস্বরূপা মর্ম্মর প্রতিমাকে স্বহস্তে অলঙ্কার বস্ত্রে সাজাইয়া সে ভক্তি ও আনন্দের আবেগে বাক্‌শূন্য

হইয়া অপলকে তাঁর দিকে চাহিয়া রহিল। তখন চারিদিক হইতে দেবীর অভিষেক-দ্রব্য-সম্ভার আনীত হইতেছে; লোকে লোকারণ্য। শ্যামাকান্ত ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া উঠিয়া বধূকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন মা! যেমনটী চেয়েছিলে, পেয়েছ তো?"

বধূ সাগ্রহে মাথা হেলাইয়া সানন্দ সম্মতি জানাইল।

এদিকে থিয়েটারের জন্যও বেশ ঘটা লাগিয়াছিল। বড় বড় পাল খাটাইয়া বাঁশ বাঁধিয়া, বেঞ্চ, কেদারা নাড়ানাড়ি করিয়া চিক খাটাইয়া সতরঞ্চ বিছাইয়া বাড়ীর ভৃত্যগণ, ভাড়াকরা ফরাশেরা ও গ্রামের প্রজাবৃন্দ ব্যস্ত হইয়া ঘুরিতেছিল।

বিপুল উদরের ভারে হেলিয়া পড়িয়া মৃদুমন্দ গমনে এখানে ওখানে দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে পান চিবাইতে চিবাইতে প্রৌঢ় দেওয়ানজী বিরল-কেশ মস্তকে ভিজা গামছা ঢাকা দিয়া তদ্বির তদারক করিতেছেন—"ওহে গুরুসদয়! তুমি অতি মূর্খ! দেখ দেখি সাতডেলে ঝাড়টা ওখানে না দিয়ে এইখানে কি হিসাবে খাটালে?' 'ওরে ও মেধো! তো' বেটাদের সঙ্গে পারবার যো নেই, ছিলিমটি চড়িয়ে দিব্যিটি বসে গেছ!" ছেলের দল জড় হইয়া হট্টগোল লাগাইয়াছে।

কলিকাতা হইতে থিয়েটার পার্টি আনা হইয়াছে, তারা কপাল-কুণ্ডলা অভিনয় করিবে। পল্লীগ্রামের অনভিজ্ঞ জনগণ কৌতূহলে অধীর হইয়া উঠিয়াছে। হেমেন্দ্রনাথ ব্যতিব্যস্ত হইয়া আছে, উপেন্দ্র ও যোগেশের সঙ্গে ঘুরিতে ঘুরিতে মধ্যে মধ্যে বলিতেছে —"দেখলে হে সরকারটার আক্কেল! কোন যুগে হুকুম করেছি, গোটাকতক ভাল ভাল গোলাপের তোড়া বানিয়ে যেন মেয়েদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়, এতক্ষণে খবর দিচ্চেন মালি বেটারা সমস্ত ভাল ফুল পূজার জন্যে তুলে নিয়েছে।" 'বুড়ো দেওয়ানটা বড় জ্বালাচ্চে হে! না পারে

কিছু ম্যানেজ করতে, না ছাড়বে কাজ। বলে কি না 'তুমি ত সেদিনের ছেলে!'—যত সেকেলে বুড়োর দল!"

উপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—"কর্ত্তার ফিরতে এত দেরি হ'ল?"

ঔদাস্যের সহিত ভাবী জমীদার উত্তর দিল—"কে জানে! রাত্রে ঘুমচ্ছিলাম, গিয়ে দেখি, বেশ চটা চটা; বেগতিক বুঝে পিট্টান দিলাম।"

যোগেশ সায় দিল—"শাস্ত্রেই আছে—'স্থানত্যাগেন দুর্জ্জনাঃ'।"

উপেন্দ্র হাসিল—"দুর্জ্জনই বটে! তা'র পর অন্দর মহলে? সুরটা ঠিক কোমল নিখাদে আরম্ভ হয় নি বোধ করি!"

হেমেন্দ্র জয়ের হাসি হাসিল—"হুঁঃ তেমনি আহাম্মক ঠাউরেছ! এমন দিনটায় পাদরী সাহেবের ধর্ম্মোপদেশ শুনতে ছুটলাম আর কি! চিঠিপত্র লেখা নিয়ে মেজাজ গরম হয়ে আছে জানি, তারপর এই থিয়েটারও একটা ছুতো। ওঁরা রাজ্যের ঠাকুর আর মন্দির তৈরি করে পয়সা ওড়াবেন, যত লোকসান হয় আমার একটু আমোদ আহ্লাদ কর্‌লে! বলেন, ও টাকা অনাথ আতুরকে দিলে তা'রা বেঁচে যেত! আরে বাপু! অনাথ আতুরকে বাঁচিয়ে তোদের লাভটা কি শুনি? পৃথিবীর দারিদ্র্য ও ভারবৃদ্ধি বৈ ত নয়, মেয়ে শঙ্করাচার্য্যদের কাছে যাওয়া আরে বাপ্‌রে!"

উপেন্দ্র বলিল—"আচ্ছা অমন উপদেষ্টার মুখে, ধর্ম্মকথা মিষ্টি লাগে না?"

"ক্ষেপেছ! গার্গী লীলাবতীকে, মৈত্রেয়ী আত্রেয়ীকে ভয় ভিন্ন ভক্তি করা যায়? তাঁদের সংস্রব হ'তে সুদূরে থাকাই ভাল। ভট্টচায্যিমশায়ের টিকি নাড়া ধর্ম্মকথা চোক কান বুজে বরং সইতে পারি নিজের স্ত্রীর পণ্ডিতি সহ্য হয় না।"

উপেন্দ্র ঈষৎ ক্রুদ্ধস্বরে কহিল—"হেম এ তোমার অন্যায়! অমন

গুণবতী স্ত্রীরও যদি তুমি নিন্দা কর, তা হ'লে তোমার নরকেও স্থান হবে না।"

যোগেশ উত্তেজিত উপেন্দ্রের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল—"নরকে স্থান না হ'লে এমন বেশি ক্ষতি কি হবে হে?—"

হেম বলিল—"চটো না! আমি কি বলছি, আমার স্ত্রী মন্দ? তাহলে সে আমার স্ত্রী হ'ল কেন? তবে কি জান স্ত্রী স্ত্রীর মতন আবদার করবে, মান অভিমান করবে, চাই কি তাই নিয়ে মধ্যে মধ্যে সোনালী রকম এক আধ পশলা রৌদ্রবৃষ্টিও বা হয়ে গেল—তবে না সে স্ত্রী! স্ত্রী ধরবে—বাড়ীতে যাত্রা থিয়েটার দাও, প্রতি শনিবারে গড়ের মাঠে সার্কাস কিংবা চিড়িয়াখানা দেখিয়ে আন; সন্ধ্যাবেলা বাসন্তী রংয়ের সাড়িখানি পরে ফুলের মালাগাছি হাতে দাঁড়িয়ে থাকবে, যা'বামাত্র মালাগাছি গলায় পরিয়ে দিয়ে হাত ধরে ভালবাসার মৃদুগুঞ্জনে কথা কইবে, তা' না ঘরে পা গলিয়েছি কি না গলিয়েছি, বাবা লিখেছেন—'তোমার এখন থেকে পড়াশুনা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়! মেডিকেল কলেজে পড়্‌লে হয় না? কত গরীব দুঃখীর উপকার হ'বে',—ইত্যাদি ইত্যাদি। গরীব দুঃখীদের জন্যে ত আমি ফেটে মারা গেলাম! এদিকে সে লজ্জাবতী লতাটি! কিন্তু নিজের গরজে এনি-বেশাণ্ট! আবার শ্বশুর যখন আরম্ভ করেন, তখন কোথায় লাগেন সুরেন্দ্র বাঁড়ুজ্জে কোথায় থাকেন বিপিন পাল!"

"আহা, হেম! কি সব বল্‌ছ! তোমার শ্বশুর সামান্য লোক নন', তিনি যা বলেন, নির্ব্বিচারে পালন করা উচিত।"

যোগেশ তীব্র বিদ্রূপে বলিয়া উঠিল—"কর্ত্রীঠাকরুণের কিছু প্রসাদ পুরস্কার পাচ্চো বুঝি? রীতিমত স্তাবক হয়ে উঠেছ যে "

"আমি মোসাহেবি জানি নি—সেটা তোমারই একচেটে থাক ভাই!

"আমি মোসাহেব? শোন, হেম, তোমার খাতিরে অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু বারে বারে অপমানিত হ'লে—"

ভৃত্য আসিয়া জানাইল ছোটবাবুর শ্বশুর তাঁকে ডাকিতেছেন। বিপন্ন হেমেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, তিনি অন্তঃপুরে তাঁর কন্যার কাছে আছেন। হেমেন্দ্র বিরক্তচিত্তে বলিয়া উঠিল—"তবেই আমার দফা রফা, মণি-কাঞ্চন সংযোগ!" যাইবার সময় বন্ধুদের বলিয়া গেল—"দেখো হে, সব যেন ঠিক থাকে, শালারা তো ফাঁকি দিতে পেলে কিছু চায় না। মেয়েদের যেন কোন অসুবিধা না হয়। যোগেশ! তুমি ভাই সেখানে যাও, আমি আসছি।"

রজনীনাথ জামাতাকে পড়াশুনা ত্যাগ করার জন্য মৃদু তিরস্কার করিলেন, পরে বলিলেন—"এই বয়সে পড়া ছেড়ে ওসব চলবে না, আমার কাছে থেকে পড়তে হ'বে। কালই আমি তোমাকে নিয়ে যাব।"

হেমেন্দ্র মনের মধ্যে খুবই চটিল, তথাপি ক্রোধ দমন করিয়া বিনীত-ভাবে কহিল—"আমার চোখ ভাল নয় জানেন, পড়াশুনা করতে গেলে অন্ধ হয়ে যেতে পারি, এতে যদি আপত্তি না থাকে, বেশ—যাচ্ছি।"

রজনীনাথ হাসিলেন, বলিলেন—"তোমার চক্ষু রোগের কথা আমার মনে আছে। যদিই বা ভুলতাম, কিন্তু ঐ নীল চশমাটা পরে এসে সেটা ভুলতে পারা অসম্ভব করেছ! আমার জামাই অন্ধ হয়, অবশ্য সে ইচ্ছা আমার একটুও নেই, সে ভাবনা আমার উপর ছেড়ে দিয়ে প্রস্তুত হয়ে থেকো ছয়টার ট্রেণেই আমাদের যেতে হবে, আমার কাজ আছে।"

রজনীনাথের স্বরে দৃঢ়তা লক্ষ্য করিয়া হেমেন্দ্রের মনে মুক্তির আশা ক্ষীণ হইয়া আসিল ও অত্যন্ত ক্রোধ হইল, সে সুস্পষ্ট ক্রুদ্ধ স্বরেই বলিয়া ফেলিল—"কাল সকালে আমি যেতে পার্ব্বো না! বাড়ীতে কাজ; আজ রাত্রে গোছ গাছ হয়ে ওঠা অসম্ভব!"

রজনীনাথ ভ্রূকুটি করিলেন, বলিলেন—"অসম্ভব কিসের? তোমার বাবাকে বলেছি। থিয়েটার তুমি যথেষ্ট দেখেছ; গোছানোর জন্য তোমার ভাবনা নেই, শান্তি সব করবে। কেমন রে, পারবি নি?"

পার্শ্বের ঘরে দ্বারের নিকট অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী শান্তি দাঁড়াইয়াছিল। পিতার আহ্বানে ধীর পদে প্রবেশ করিয়া মস্তক হেলাইয়া জানাইল—পারিবে।

রজনীনাথ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন—"আমি তোমার বাপের কাছে যাচ্ছি, তুমিও যেও, তোমার সঙ্গে কিছু বিশেষ কথা আছে। নতু! আমি চল্লাম।—বলিয়া রজনীনাথ বাহির হইয়া গেলেন। শ্বশুর চৌকাট পার হইতে না হইতেই হেমেন্দ্র পরুষ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"তুমি বুঝি আমার নামে ওঁর কাছে লাগিয়েছ?"

শান্তি অকস্মাৎ চমকিয়া উঠিল, বিস্ময়ে নেত্র বিস্ফারিত করিয়া কহিল—"সে কি কথা!"

তুমি নয় তো আর কে? তোমায় চিঠিপত্র লিখতে পারি নি, কাজের ভিড়ে দেখা করতে সময় পাইনি বলে চটে গেছত, তারই শোধ নে'বার জন্যে বাপের কাছে আমার নামে লাগিয়ে আমায় বাড়ী ছাড়া কচ্চো! এমন নইলে স্ত্রী!—দু'চক্ষে আমায় দেখতে পার না!"

শান্তি শিহরিয়া দু পা পিছাইয়া গেল। ব্যথিত ভৎর্সনায় তার শান্ত চোখ দুইটি পূর্ণ করিয়া সবিষাদে বলিয়া উঠিল—"আমায় এমন নীচ মনে কর!"

সে ধিক্কারে হেমেন্দ্র একটু স্তম্ভিত হইল। শান্তির কণ্ঠে সে সুর সে শুনে নাই, আশাও করে নাই—ঈষৎ লজ্জা বোধ করিল, কিন্তু পরক্ষণে নিজের আসন্ন বিপদের কথা স্মরণ করিয়া শান্তির উপর মমতাহীন হইয়াই

বলিল—"নিশ্চয়ই এ তোমারই কারসাজী! এমন জানলে আমি তোমাদের সামনে আসতাম না।"

শান্তির বিবর্ণ অধর ঈষৎ কম্পিত হইল। সে তীব্রভাবে কি বলিতে গিয়া আত্মসম্বরণ পূর্ব্বক দ্রুতপদে কক্ষের অপর প্রান্তে একটা জানালার ধারে গিয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। তখন শরতের অপরাহ্ন ছায়াচ্ছন্ন সন্ধ্যার মধ্যে মিলাইয়া যাইতেছিল, জানালার নীচে কামিনী বৃক্ষের শ্রেণী হইতে মদিরময় সুবাস সন্ধ্যার বাতাসে মিশ্রিত হইয়া উঠিতেছিল, পাখীটার গান গাহিবার সাধ তখনও মিটে নাই, থাকিয়া থাকিয়া জামরুল গাছের মধ্যে লুকাইয়া সে একটা ঝঙ্কার দিয়া উঠিতেছিল, শান্তি তার অনাদৃত, অভিমানাহত হৃদয় লইয়া চুপ করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। তার কালো চোখের প্রান্তে একটা কম্পিত জলের রেখা দেখা দিয়াছিল, সেটাকে সে অঞ্চলপ্রান্তে অতি সন্তর্পণে মুছিয়া ফেলিল। এমন হৃদয়হীনের কাছে হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করাও নিদারুণ অপমান!

শান্তির ব্যবহারে হেমেন্দ্রের মুখখানা ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিয়া আবার তাহা স্বাভাবিক ভাব ধারণ করিল। সে চোখ ফিরাইয়া স্থির দৃষ্টিতে শান্তির দিকে চাহিয়া রহিল। গোধূলির সেই আধ আলো আধ অন্ধকারে ঈষৎরক্তিম ক্ষীণালোকে অদূরবর্ত্তিনী নারীমূর্ত্তি যেন কোন নিপুণ চিত্রকরের তুলিতে চিত্রিত সুন্দর চিত্রের মত দেখাইতেছিল। তার স্বরচিত কবরীর নীচে পীতবর্ণের সাড়িখানি পরিপুষ্ট অঙ্গ বেষ্টন করিয়া দৈহিক সুবর্ণের সৌন্দর্য্য আরো বাড়াইয়া তুলিয়াছিল, তাহা মুহূর্ত্তে হেমেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া লইল। মনে মনে ঈষৎ লজ্জা ও পরাভব বোধ করিতে লাগিল, শান্তি কি তার সমালোচনাটা এইমাত্র শুনিয়া আসিয়াছে নাকি? এই কথাই না সে বন্ধুদের কাছে এই কতক্ষণমাত্র

পূর্ব্বে বলিতেছিল? সত্য সত্যই কি তবে সে এতক্ষণ তার মনোমত সাজে সাজিয়া তারই জন্ম উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে পথ চাহিয়াছিল? দুর্ভাগ্যের বিষয় উপস্থিত সেথানে একগাছা জুঁই ফুলের মালা ছিল না, আর এই যে দীর্ঘ বিরহের পর দম্পতীর প্রথম আলাপ, ইহাকেও ঠিক প্রেমালাপ বলা চলে না! হেমেন্দ্র ডাকিল—"শান্তি!"

অভ্যাস বশতঃ শান্তি ফিরিয়া দাঁড়াইল। তার বিষাদপূর্ণ ম্লানমুখে বেদনা ও অভিমানের রেখাগুলি পরিষ্কার অক্ষরে ফুটিয়া রহিয়াছিল। অপ্রতিভভাবে হেম কহিল—"শান্তি! কাছে এসো, এতদিন পরে দেখা—রাগ করো না।"

সত্য! এতদিন পরে সাক্ষাৎ—শান্তির আজ অভিমান প্রকাশ করা উচিত হয় নাই! সে ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল, হেমেন্দ্র মিনতিপূর্ণ কোমল স্বরে কহিল—"কাল সকালে আমি যেতে পারবো না, সে একেবারে অসম্ভব, তোমায় এর কিছু উপায় করে দিতে হবে—লক্ষ্মীটি এই উপকারটা করো।"

"আমি!" সবিস্ময়ে শান্তি কহিল—"আমি কি উপায় কর্ব্বো বলে দাও আমাকে! সাধ্য হয় কর্ব্বো।"

হেমেন্দ্র পরামর্শ দিল—"তোমার বাবাকে বলো আজ তোমার শরীর ভাল নেই সেই জন্ম কিছু উদ্যোগ করে তুলতে পারলে না, তা হলেই তিনি বিশ্বাস করবেন। তুমি ইচ্ছা করলে কি না হয়। দেখ দেখি কাল আমি কেমন করে যা'ব, তুমিই বল এ রকম জুলুম করা কি উচিত?"

শান্তি সভয়ে জিহ্বা দংশন করিয়া বলিল—"আমি বাবার কাছে মিথ্যা বলতে পারবো না।"

হেমেন্দ্রের মুখে গভীর বিরক্তির চিহ্ন প্রকাশিত হইল, সবেগে সে

ভূমে পদাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিল—"ঐ তো তোমার রোগ! ঐ জন্যেই তো তোমার সঙ্গে বনে না! মিথ্যে কিসে হ'ল? আমার উপকারের জন্যে এটুকুও তুমি করতে পারো না? সাধ করে কি বলতে হয় আমি তোমার আপদ—আমায় বিদায় করতে পারলেই তুমি বাঁচো!"

শান্তি ক্রুদ্ধ হেমের একটা হাত দুই হস্তে চাপিয়া ধরিয়া ব্যাকুলকণ্ঠে বাধা দিয়া বলিল—"তুমি আমাকে কেবল কেবল এমন করে বকো না; যা বলবে তাই করবো।"

"আঃ, তাই বল! বেশী এমন কি কর্‌তে হবে, শুধু কাল আমার যা'তে যেতে না হয় তা'রি উপায় করো। আমি কাল যাব না—সেটা নিশ্চিত, তবে তা' নিয়ে একটা ঝগড়া বাধান আমার ইচ্ছা নয়।"

বিবর্ণ মুখ ঈষৎ নত করিয়া শান্তি কহিল—"চেষ্টা কর্‌বো।"—হেমেন্দ্র খুসী হইয়া পত্নীকে একটু কাছে টানিয়া লইল তার শুভ্র ললাটে মৃদু মৃদু অঙ্গুলির আঘাতে পরিস্ফুট কৃতজ্ঞতার চিহ্ন প্রকাশ করিয়া বলিল—"বাঁচালে! দেখ দেখি শ্বশুর মহাশয়ের কি অন্যায়! এত খরচ করে আমি থিয়েটারটা আনালাম, আর আজই আমায় যত দরকার পড়ে গেল—এ শুধু আমার উপর আক্রোশ দেখানো ছাড়া আর কি? চলি, নবকুমারে'র শরীর নাকি ভাল নেই, ম্যানেজার ধরেছে আমায় নবকুমারের পার্ট নিতে হ'বে। কলকেতায় বারকয়েক অভিনয় করা গেছে, তবু এখানে একটু যেন বাধ বাধ ঠেকে! সবাই বলে 'নবকুমারে'র পার্ট যেমন করেছিলুম তেমন কেউ পারে না। হ্যাঁ, ভাল কথা—ম্যানেজার বলছিল 'মেহেরুন্নিসা'র জন্য ভুল করে লাল সাড়ি আনা হয়েছে, তা'তে ওকে মানাবে না, দাও দেখি তোমার একখানা নীল গোলাপি বা ফিরোজী সাড়ি। অবশ্য খুব ভাল দেখে।"

এক মুহূর্ত্তে শান্তির শান্ত মুখ ঘৃণামিশ্রিত বিরক্তিতে আরক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে সে এত শীঘ্র পার্শ্বের ঘরে চলিয়া গেল যে তার এই সহসা অন্তর্ধানে হেমেন্দ্র বুঝিয়া উঠিতে পারিল না যে সে রাগ করিয়া গেল না ভাল মনে! বেশীক্ষণ তাকে এ সমস্যায় থাকিতে হইল না, সল্পক্ষণ পরেই একখানা ফিকে নীল রংয়ের সাড়ি হাতে শান্তি ফিরিয়া আসিল। হেমেন্দ্র আরও বিস্মিত হইল, শান্তি যে উপদেশ দিতে পারিলে আর কিছুই চাহে না, সে আজ স্বামীর মুখের কথাটী খসিতে না খসিতে তার আজ্ঞা পালনে এত তৎপর, এমন বাধ্য স্ত্রী সে কবে হইল? পরীক্ষা করিয়া দেখিল সাড়িখানি সত্যই বহুমূল্য। প্রসন্নমুখে কহিল—"হ্যাঁ, এখানা মেহেরুন্নিসার যোগ্য হ'বে।" বলিয়া পত্নীর গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিল, "থ্যাঙ্ক্ ইউ ভেরী মাচ মাই ডিয়ারেষ্ট! কিন্তু দেখো যেন ও কথাটা ভুলো না।" শান্তির ললাট হইতে কর্ণমূল পর্য্যন্ত কে' যেন লোহিতরাগে রাঙ্গাইয়া দিল।

শ্যামাকান্ত সকাল সকাল আহার করিয়া শয়ন করিতেন, কিন্তু রজনীনাথের অভ্যাস ইহার বিপরীত। মক্কেলদের কাজকর্ম্ম বুঝিয়া লইয়া তাঁর বাড়ীর ভিতর আসিতে প্রায়ই রাত্রি দেড়প্রহর হইয়া যাইত। আজও পথশ্রান্ত ও উত্যক্তচিত্ত শ্যামাকান্ত বৈবাহিক ও বধূর অনুরোধে একটু কিছু আহার করিয়া শয়ন করিতে গেলে রজনীনাথ ভিতরে কন্যার মহলে আহারার্থ আহূত হইয়া আসিলেন। তখন কোলাহল-মুখরিত প্রকাণ্ড পুরী অনেকটা নিস্তব্ধ হইয়া আসিতেছে। কনসার্ট থামিয়াছে, ড্রপ্‌সিন উঠিয়াছে, আলোকিত রঙ্গমঞ্চ উজ্জ্বলবেশধারী অভিনেতৃবৃন্দের আবির্ভাবে দর্শকমণ্ডলী সেইদিকেই জমায়েৎ হইয়াছে।

রজনীনাথ আসনে বসিয়া কিছুক্ষণ অন্যমনস্কভাবে আহার করিয়া

যাইতে লাগিলেন, নিকটে বসিয়া শান্তিও নীরবে পিতাকে পাখার বাতাস দিতে লাগিল, সেও সহসা কোন কথা বলিতে পারিতেছিল না। পিতার মুখের অদ্ভুত গাম্ভীর্য্য তার মনের মধ্যে কেমন যেন ব্যথার মত বাজিতেছিল। তার ভাবনাই যে তার চিরস্নেহময় জনককে এমন করিয়া ভাবাইয়া তুলিয়াছে, ইহা ত বুঝিতে বাকি ছিল না। অনেকক্ষণ এভাবে থাকিতে না পারিয়া ডাকিল—"বাবা!"

রজনীনাথ একটু যেন চকিত হইয়া কহিলেন—"কিরে লতি! তুই থিয়েটার দেখ্‌তে যাস্ নি?"

সেও ক্ষীণভাবে একটু হাসিল, থিয়েটারের নাম সে মুখে উচ্চারণ করিতে পারিল না, মনে পড়িল পিতা এখনও জানেন না সেই থিয়েটারের আজ প্রধান অভিনেতা কে'! কথা ঘুরাইয়া বলিল—"বাবা! সুকু এল না কেন? তা'কে অনেক দিন যে দেখি নি।"

রজনীনাথ কহিলেন—"তা'র শরীরটা ভাল ছিল না, সে তো 'দিদি' 'দিদি' করে অস্থির হচ্চে। তোর মাও তোকে দেখ্‌বার জন্যে বড্ড ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন।"

শান্তির বিষণ্ণ চোখে আনন্দের জ্যোতিঃ নবোৎসাহে ফুটিয়া উঠিল। সে আগ্রহে বলিয়া উঠিল—"আমিও মাকে সুকুকে অনেক দিন দেখি নি, বাবা, আমায় আপনার সঙ্গে নিয়ে যান।"

রজনীনাথ সস্নেহে কন্যার দিকে চাহিলেন—"তোকে নিয়ে যেতে পারলে ত বাঁচতাম বুড়ি! তা তো এখন হয় না।—বলিয়া ঈষৎ নিম্নস্বরে কহিলেন—"এখন যদি তোকে নিয়ে যাই তা হলে চৌধুরীমশায় হয় তো অন্য কিছু ভাবতেও পারেন।"

একটু ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া শান্তি মৃদুকণ্ঠে কহিল—"আচ্ছা।"

নিশ্বাসটা ক্ষুদ্র হইলেও রজনীনাথের কান এড়াইতে পারে নাই

তিনি চকিতনেত্রে মেয়ের মুখের দিকে চাহিলেন, কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলেন—"হেমকে কাল আর নিয়ে যা'ব না, আজ তোর পক্ষে যথেষ্ট পরিশ্রম হয়েছে লতু! আজ তা'র যা'বার বন্দোবস্ত করে উঠতে পারবি নে, হেম না হয় দুদিন পরেই যাবে, কিন্তু তা'র যাওয়া চাইই, সে ভার তোমার উপর রৈল—এখন থেকে পড়া ছেড়ে থিয়েটারে মিশলে তো চলবে না।"

শান্তি লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। বাবা কেমন করিয়া টের পাইলেন! যদিও সে একটা মহা দায় হইতে মুক্ত হইল, তথাপি উৎকট লজ্জার হাত সে এড়াইতে পারিতেছিল না। বাবা কি মনে করিলেন যে, সে তার ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্যের বশে স্বামীর উন্নতির পথে বাধা দিতে চায়? এতদিন পরে ফিরিয়া আসিয়া স্বামীর সহিত বিচ্ছেদ আশঙ্কায় সে তাঁর সহিত যাইতে ব্যগ্র!

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পিতাপুত্রীতে কথা হইল। রজনীনাথ বলিলেন—"আমি তোর সম্বন্ধে সমস্ত স্থির করেই এসেছি—তুই চৌধুরীমশায়ের কাছে থাকবি, কিন্তু হেম এখন হ'তে আমার কাছে থেকেই পড়াশুনা করবে। সে বেশ বুদ্ধিমান ছেলেই তো ছিল, দায়িত্ব বুঝলে এখনও লেখাপড়ায় যত্ন করতে পারে। আমার বিশ্বাস এই ব্যাপারটা ভগবান তার মঙ্গলের জন্যই ঘটিয়েছেন, তা'র জন্যে যখন আমার দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না এমন সময় তোর চিঠি পড়ে আমি যেন বাঁচলুম, এবার সে মানুষ হ'বে।" তা'র পর একটু চুপ করিয়া আবার বলিলেন—"লতি! তোর মা ভাবছিলেন যে শিবানীর সঙ্গে তোর বনিবনাও হ'বে কি না। তাঁ'র ইচ্ছা তুইও আমাদের কাছে থাকিস, আমি কিন্তু বলেছি, শান্তি আমাদের এমন মেয়ে নয় যে তা'র সঙ্গে কারও বনবে না!—কি বলিস মা! আমি তোকে তোর মার চেয়েও বেশী চিনি কিনা?"

মৃদুস্বরে সে কহিল—"তিনি আমায় বড্ড ভালবাসেন বলেই সবেতেই ভয় পান! পিতা সস্নেহে কন্যার হাতটা হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া অপর হস্তে তার মাথাটা বুকের উপর চাপিয়া স্নেহকণ্টকিত হইয়া হাসিয়া কহিলেন—"কেন, আমার মেয়েটিকে আমিই কি দেখতে পারি নে? বিনোদের শাশুড়ী নাকি লোক একটু—তা' হোক তা'তেই বা তোর ক্ষতি কি? তুই তাঁ'কে মায়ের মত শ্রদ্ধা ভক্তি করবি, সকল কাজে তাঁ'র পরামর্শ চাইবি, তিনি নিশ্চয়ই তোকে ভালবাসবেন। বিনোদের স্ত্রীর সঙ্গে ঠিক বোনের মত ব্যবহার করবি, কর্ত্তৃত্বের অধিকার তাঁ'র হাতেই দিবি, অথচ নিজে সব কাজে তা'র সাহায্য করবি। আমি জানি আমার মাকে, আমার বুড়িকে কিছুই বলবার দরকার নেই, তবুও বাপের একটা কর্ত্তব্য তো আছে, তাই বলছি লতি! এইবার তোর পরীক্ষার দিন এসেছে—এই সব ছোট বড় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে হ'তে তবেই প্রশস্ত কর্ম্মক্ষেত্রে অচল প্রতিষ্ঠা ঘটে। বিনোদ-কুমারের বিধবা—"

"বাবা! সত্যি কি দিদি তাই? সত্য সত্যই কি তাঁকে আর পাওয়া যাবে না, বাবা?"—কন্যার স্বরে রজনীনাথ বেদনা বোধ করিলেন, তৎক্ষণাৎ কথাটা ফিরাইয়া লইলেন।

"ওটা বলা অন্যায় হয়েছে, ঈশ্বর জানেন—বিনোদ জীবিত কি না, কিন্তু তার ফেরবার আশা তো কিছুই দেখি নে। হ্যাঁ রে, হেম তো শিবানীকে বেশ শ্রদ্ধাভক্তি করছে? তা'কে এ সম্বন্ধে কিছু বলব মনে করেছিলাম কিন্তু সে তো আমার সঙ্গে আর দেখাই করলে না।—শিবানী বা তা'র ছেলের উপর কোন বিরুদ্ধভাব জন্মায় নি ত?"

শান্তি দেখিল কথাগুলার শেষে পিতা ঈষৎ গম্ভীর হইয়া পড়িলেন।

সে চকিতদৃষ্টি ভূমিসংলগ্ন করিয়া অস্ফুটস্বরে উত্তর দিল—"দিদির সঙ্গে দেখা হয় নি তো।"

"দেখাই করে নি? সেটা কিন্তু ভাল নয়, সে যেন তাঁর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে। অমূল্যকুমারের ভার এখন তারি উপর। ওরা আসতে সে সন্তুষ্ট হয়েছে তো?"

শান্তির নত দৃষ্টি আরও নত হইয়া আসিল, ম্লান মুখ অধিক ম্লান করিয়া গভীর লজ্জা ও বেদনার মধ্য হইতে সে মৃদুস্বরে উত্তর করিল—"তা'তো জানি নে।"—স্বল্পমাত্র-পূর্ব্বেকার সেই অভিনয়টা তখনও তার মনের ভিতর শূল বেদনার মত খোঁচা দিয়া উঠিতেছিল, কণ্ঠ যেন চাপিয়া আসিল।

রজনীনাথ বিস্ময়পূর্ণ ক্ষোভে নীরব রহিলেন।

তখন অনেক রাত হইয়া গিয়াছে, পূর্ণিমার চাঁদ বিমল জ্যোৎস্না তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছে। প্রকাণ্ড পুরীর অংশতর হইতে মধুর যন্ত্রস্বরের সহিত সম্মিলিত সকরুণ সঙ্গীতলহরী ভাসিয়া আসিতেছিল—

"কোলে তুলে নে' মা কালী!—ওমা কালের কোলে দিস্ নে' ফেলে—
বড় জ্বালায় জ্বলছি যে' মা, আমায় যেতে দে' জয় কালী বলে।"

২২

পরদিন উপেন হেমকে তার বিশ্রাম কক্ষে একা পাইয়া নিজের অদম্য কৌতূহল নিবৃত্তির সুযোগ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। এ সম্বন্ধে হেমকে উচ্চবাচ্য করিতে না দেখিয়া সে বিস্ময়বোধ করিয়াছিল। কৌতূহলের বিষয় যে শিবানী, তাহা বলাই বাহুল্য। জিজ্ঞাসা করিল—"তোমাদের নতুন গিন্নির খবর কি?"

"নতুন গিন্নি! তিনি আবার কে' হে? আমি তো বাড়ীর একমেব-

দ্বিতীয়মকেই জানি! ওঃ, হ্যাঁ, তিনি আপাততঃ নতুন হয়ে এসেছেন বটে।—না, তাঁর সঙ্গে ভাল করে দেখা সাক্ষাতের ফুরসৎ পাই নি, শরীরটে বেযুৎ হয়ে রয়েচে, আর এক ঘুম না দিলে হবে না—তোমার চক্ষে ঘুম নেই কেন হে?"

হেমেন্দ্রের প্রশ্নে উপেন হাসিয়া কহিল—"কারণ আমরা গরীব লোক, খেটে খেতে হয়, কুম্ভকর্ণ যদি রাবণ হেনও দাদার ভাই না হয়ে আমাদের ঘরে জন্ম নিত, তা হ'লে তারও অভ্যাস দুরস্ত হয়ে যেত। বিনোদবাবুর স্ত্রীকে দেখলেন কেমন? নেহাৎ নাকি হাবাতে ঘরের মেয়ে? তার মা-টি তো শুনচি জাঁহাবাজ মেয়েমানুষ! আমাদের বৌ বলছিল এই তো নূতন এসেছে, এরি মধ্যে যেন সব তারি ঘরকন্না এমন করেই বেড়াচ্ছে। কে' জানে, তোমাদের সঙ্গে বনিবনা কেমন হবে। ছেলেটি কিন্তু চাঁদের মত।"

"বিনুদা'র স্ত্রী!" শয্যাশায়িত হেমেন্দ্র চমকিয়া উঠিয়া বসিল, বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বক্তার পানে চাহিয়া রহিল—"এ আবার কি ঠাট্টা? শুনলেও যে রক্ত জল হয়ে যায়!"

উপেনও বিস্মিত হইল—"ঠাট্টা? তুমি কি নিজের বাড়ীর কোন খবরই রাখো না, অথচ পাড়ায় পাড়ায় আজ এই কথা নিয়েই তুমুল আন্দোলন চলছে, এর মাঝখানে তোমার এত সাধের থিয়েটার কোথায় চাপা পড়ে গিয়েছে;—কিন্তু হেম! মতিবিবির গলাটি কি মিষ্টি! আহা! 'প্রাণ দিয়ে সই প্রাণের ছবি যত্নে এঁকেছ'—কি সুন্দর গাইলে!"

হেমের মাথার ভিতর তখন অভিনয়ের দৃশ্যপটটার উপর একখান তীব্র ঈর্ষার যবনিকা পড়িয়া গিয়াছে, সে উপেনের শেষ কথাগুলায় পূর্ব্বের মত গদ্‌গদ হইয়া উঠিল না বরং ঈষৎ উত্যক্তভাবে বালিশটা চাপড়াইয়া অধৈর্য্যের সহিত বলিয়া উঠিল—"বিনুদা'র আবার বউ ছেলে কোথ

থেকে এল? এসব হেঁয়ালির ছন্দ আমি বুঝতে পারছি নে, স্পষ্ট করে বল!"

"এর চেয়ে আবার স্পষ্টাস্পষ্টি কি আছে? বিনোদবাবু বৃন্দাবনে এক অনাথা বালিকাকে বিয়ে করেছিলেন, সে এতকাল পরে তা'র শ্বশুরের সন্ধান পেয়ে তাঁর কাছে একটি বছর তিন চারেকের ছেলে ও মা সঙ্গে করে উপস্থিত হয়েছে, 'অস্পষ্ট' কোনখানটায় বোধ করচো?"

হেমেন্দ্র নীরবে চাহিয়া রহিল। নিদ্রা তার মুদিতপ্রায় চোখ দুইটাকে ছাড়িয়া কোথায় যে চলিয়া গেল, জানিতেও পারিল না। আজিকার মতই গেল, কি কত দিনের জন্য গেল, তাই বা কে' বলিতে পারে? এমন সময় বাহিরে চটিজুতার শব্দ করিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া যোগেশ বলিল—"ভিতরে যেতে পারি?—নিদ্রিত না জাগ্রত?"

উপেন তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"বন্ধুদের জন্য এখানকার দ্বার অবারিত, স্বচ্ছন্দে আসতে পার।"

যোগেশ প্রবেশ করিয়া হেমের আকস্মিক গাম্ভীর্য্যের কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে উপেনের দিকে চাহিল।

"যোগেশ! তুমি বিনোদবাবুর ছেলেটিকে দেখলে?—হেম এখনও দেখেন নি, তা'রা কর্ত্তার সঙ্গে এসেছে, সে কথা উনি জানতেনও না।"

একখানা চেয়ার হেমেন্দ্রের সোফার নিকট টানিয়া আনিতে আনিতে যোগেশ মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল—"বিনোদবাবুর ছেলে কি কা'র ছেলে তাই বা জানে কে? কর্ত্তা, যেমন ক্ষেপে উঠেছেন, তা'তে তুমি আমিও যদি 'বিনোদ' নাম নিয়ে এসে দাঁড়াই, তা হ'লেও হয় তো তিনি বিশ্বাস করে নেন।"

উপেন ও হেমেন্দ্র উভয়েই যোগেশের পরিহাসে চমকিয়া উঠিল। উপেন বলিয়া উঠিল—"বল কি! কর্ত্তামশাই কি বিশেষ প্রমাণ প্রয়োগ না নিয়েই

বউ নাতি ঘরে এনেছেন? হেমের জ্যাঠাইমার আংটি ও ফটোগ্রাফ ওঁদের কাছে পাওয়া গিয়েছে তা' শোন নি?"

যোগেশ অবিশ্বাসের হাসি হাসিল, কহিল—"মস্ত প্রমাণ! স্ত্রী বিবাহিতা কি অবিবাহিতা তা জানি নে, ছেলে তো সে চলে যাবার পরে হয়েছে, ছেলের মা ভাল হ'লে বিনোদবাবু কখনো শুধু শুধু স্ত্রী ত্যাগ কর্ত্তেন! সে তেমন পাষণ্ড ছিল কি?"—যোগেশ মুখ টিপিয়া ইঙ্গিতের মৃদু হাসিল।

"আহা, যোগেশ! তুমি ভুলে যাচ্চো সে তা'র বাপকে ছেড়ে চলে গেছে! যে পিতৃস্নেহ ত্যাগ করতে পারে সে এও পারে।"

"ভুলি নি হে, ভুলি নি, কিন্তু তোমার এ আরগুমেণ্টটা যে ঠিক পুলিশের মত দেখছি! যেখানেই চুরি হোক, সে দাগীচোরকেই ধরবে। বিনোদবাবু বাপের উপর রাগ করে গিয়েছেন, অতএব তিনি স্ত্রীও ত্যাগ করেছেন! হা হা হা।"

হেমেন্দ্রের মুখটা অসাধারণ বিবর্ণ হইয়া আসিয়াছিল, সে তার কম্পিতবক্ষে হস্তবদ্ধ করিয়া স্থিরকর্ণে যোগেশের কথার প্রত্যেক বর্ণটি পর্য্যন্ত যেন পেটুকের মত গিলিতেছিল। মানুষ কুপরামর্শটি যেমন মনঃ সংযোগপূর্ব্বক শুনিতে পারে, সুপরামর্শটি তেমন পারে না। শিবানীর আগমন-সংবাদে হেমেন্দ্র নিজেকে যে মুহূর্ত্তে বিপন্ন বোধ করিয়া ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল, ঠিক সেই সময় বন্ধু-বেশী শনিগ্রহ আসিয়া তার কাণে কাণে বলিয়া দিল—'নিজের স্বত্ব পরকে ছাড়িয়া দিবার পূর্ব্বে কোথায় কি খুঁৎ বাহির করিতে পার খুঁজিয়া দেখ, বোকামি করিয়া নিজেকে বঞ্চিত করিও না।' অকূলপাথারে হাবুডুবু খাইতে খাইতে একটা ডুবো চর বুঝি পায় ঠেকিল।

হেমেন্দ্রের সুখ সীমাতিক্রম করিয়াছিল। অতুল ঐশ্বর্য্য অপর্য্যাপ্ত

সম্মান স্নেহ প্রেম ও ত্রুটিহীন সেবা—কিছুরই অভাব ছিল না। সংসার তার মুগ্ধ নেত্রে অপূর্ব্ব স্বপ্নজাল রচনা করিতেছিল। সহসা বিনামেঘে একি বজ্রপাত! বিনোদের পুত্র! সত্যই যদি সে আসিয়া থাকে, তবে সেই তো এই বিপুল সম্পদের অধিকারী।—হেম কে? ভোজবিদ্যাবলে যেমন রাজপ্রাসাদ অরণ্যে, আবার অরণ্য রাজপ্রাসাদে পরিণত হয় বলিয়া শুনা যায়, হেমেন্দ্রের ভাগ্যেও এ যে তাহাই ঘটিল। গরীব হেম তার অর্দ্ধ দারিদ্র্যপূর্ণ গৃহে জীর্ণ পুস্তক-পরিবেষ্টিত হইয়া কঠোর অধ্যয়নে নিজেকে ঐশ্বর্য্যময় জগৎ হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল। সে তো স্বপ্নেও এই ইন্দ্রপুরীর ইন্দ্রত্বপদ কামনা করে নাই? তবে কেন তাকে তার অভ্যস্ত পথ হইতে টানিয়া আনিয়া দু'দিনের জন্য ঐশ্বর্য্যের সর্ব্বোচ্চ পদে আরোহণ করাইয়া বিলাসসুখের তীব্র গরলাস্বাদ জানাইয়া দিয়া আবার গভীর অন্ধকার দারিদ্র্যের মধ্যে নিক্ষেপ করা? এ যে 'আরব্য রজনী'র অলৌকিক ভাগ্যবিপর্য্যয় কাহিনী!—হেমেন্দ্র ঘুমাইবার ছলে বন্ধুবান্ধবকে বিদায় দিয়া উঠিয়া বসিল।

সন্ধ্যা অতীত, আলোকাধারে উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছিল, টানা পাখা চলিতেছিল, ক্ষুদ্র ত্রিপদীর উপরের রৌপ্যাধার হইতে তাজা ফুলের স্নিগ্ধ গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল। মর্ম্মর টেবিলের পাশে সবুজ ভেলভেটমণ্ডিত মেহগ্নি কৌচে বসিয়া চিন্তাহীন হেমেন্দ্র আজ আকাশ পাতাল ভাবিয়া পাইতেছিল না। দেওয়ালগিরির আলো দর্পণে, দর্পণ হইতে বৃহৎ চিত্রে নিপতিত হইয়া ঘর আলোকময় করিয়া তুলিয়াছে। গালিচাবৃত কক্ষভূমে বহুমূল্য বিলাতী ফ্যাসানের কৌচ কেদারা মূল্যবান্ রেশমঝালরযুক্ত সুদৃশ্য আবরণে আবৃত হইয়া গৃহের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। বাতায়ন দ্বারের বহুমূল্য পর্দ্দাগুলি থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, দুলিতেছে, সমস্তই আনন্দময়। হেমেন্দ্র একবার সেই সব চাহিয়া দেখিল। এই সুখের

মাঝখান হইতে নামিয়া আবার তাহাকে কোথায় দাঁড়াইতে হইবে? মানসনেত্রে একবার সেই গোময়-মৃত্তিকালিপ্ত ক্ষুদ্র অঙ্গন-পার্শ্বে চূণবালি-খসিয়া-পড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বার জানালা বিশিষ্ট অর্দ্ধ অন্ধকার গৃহখানি উদিত হইল। পুরাকালীন তক্তাপোষের উপর সেই যুগেরই একখানি মাদুর পাতা এবং তারই উপর চারিদিকে পুস্তকরাশি ছড়াইয়া কঠোর অধ্যয়ন। তখন উহাই যথেষ্ট ছিল,—কিন্তু এখন?

হেমেন্দ্র অনেক ভাবিল! সত্য কিছু শ্যামাকান্ত পৌত্রকে পাইয়াছেন বলিয়া তাহাকে একেবারেই বঞ্চিত করিবেন না, যথাসর্ব্বস্বের 'মালিক' হইয়া যেখানে সে চারি বৎসর কাটাইল সেখানকার দাবী শেষ হইলেও দাক্ষিণ্যের অভাব ঘটিবে না। বিশেষতঃ হেমেন্দ্রের জন্য যত না হউক, শান্তির জন্য অবশ্যই তিনি একটা উপায় করিবেন। হেমের ললাট কুঞ্চিত হইল। দয়া? যে বাড়ীতে সে প্রভু ছিল, সেইখানে সে প্রতিপালিতের মধ্যে গণ্য হইবে?

সে একটা সুগভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। যোগেশ তো মন্দ বলে নাই! তার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতে যাহারা নিজেদের প্রকৃত 'ওয়ারিস' বলিয়া জাহির করিয়াছে, সত্য সত্যই তাদের সে অধিকার আছে কি না ভাল করিয়া প্রমাণ লওয়াও তো উচিত! শ্যামাকান্ত নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের নামে জ্ঞানশূন্য হইয়া যান, তাঁহাকে প্রতারিত করা কঠিন নহে, কিন্তু তা'ই বলিয়া কোথা হইতে কে আসিয়া বলিল—'আমরা বিনোদের স্ত্রী পুত্র।' অমনি সে তাদের—নিজের ঐশ্বর্য্য ধরিয়া দিয়া পথে দাঁড়াইবে? অসম্ভব!

হেমেন্দ্র চিন্তাকুলভাবে টেবিলের উপর উত্তপ্ত ললাট রক্ষা করিল। কতক্ষণ ঐ ভাবে ছিল জানে না, সহসা পৃষ্ঠে মৃদুকরস্পর্শ হওয়াতে চমক ভাঙ্গিল।

"তোমার কি অসুখ করেছে? সাধু গিয়ে বল্লে অনেকক্ষণ এমনি করে রয়েছ?"

এই ঔৎসুক্যপূর্ণ সাগ্রহ প্রশ্নে মুখ তুলিয়া পার্শ্ববর্ত্তিনী পত্নীর পানে ফিরিয়া চাহিল। শান্তির বড় বড় কালো চোখের উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি ও সুন্দর মুখের উদ্বিগ্ন ভাব আজ সহসা অপ্রয়োজনেও হেমেন্দ্রর বক্ষে আঘাত করিল।

এতদিন পরে আজ সে অনুভব করিল, এই উদ্বিগ্ন হৃদয়খানিই এখন কেবল তার একান্ত নিজের। ইহা ভিন্ন আর কিছুতেই আপন বলিয়া দাবী করিবার অধিকার তার নাই। সে একটা সুদীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া বসিল—"অসুখ নয় শান্তি! ঈশ্বর আমাদের উপর নির্দ্দয় হয়েছেন—তা'ই ভাব্ছি।"

"ঈশ্বর আমাদের উপর যত সদয় এমন দয়া তাঁর অল্প লোকেই পেয়েছে।—তোমার কপালটা গরম যে! শরীরটা নিশ্চয় ভাল নেই! ভাল ঘুম হ'লেই সেরে যা'বে। আমার দিকটায় গোলমাল কম, ঘুমোতে পার্ব্বে এসো।" সপ্রেম চক্ষে স্বামীর পানে চাহিয়া সে তার স্কন্ধের উপর একটা হাত রাখিল। আজ সে সরম সঙ্কোচে নিপীড়িতা লজ্জাশীলা বধূ নহে, কর্ত্তব্যপরায়ণা পত্নীরূপে নিজের অকুণ্ঠিত অধিকারের গর্ব্বে আসিয়া স্বামীর পাশে দাঁড়াইয়াছে। হেমেন্দ্র ঈষৎ বিস্মিত হইয়া শান্তির প্রশান্ত মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল—সে কি বুঝিতে পারে নাই? এ ঘটনায় তার মনে কি আঁচড়ও লাগে নাই? অথবা সে তার সঙ্গে ছলনা করিতেছে? আবার একটা নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল—"আর ঘুমিয়েছি শান্তি, ঘুমের দফা আজ থেকেই শেষ! শুনছি, একটা কে' মাগি নাকি বিনূদা'র বউ সেজে এসেছে?"

শান্তির সমস্ত মুখখানা ঘোর রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, চমকিয়া স্বামীর

কাঁধের উপর হইতে হাত টানিয়া লইয়া দুই পা পিছু হটিয়া গেল এবং লজ্জায় ক্ষোভে মর্ম্মের ভিতর মরিয়া গিয়া ধিক্কারের সহিত সবেগে বলিয়া উঠিল—"কি বলছো ?—তিনি যে অমূর মা, তোমার বড় ভাজ।"

"তিনি যে কে' তার ঠিকানা কি ? বিনুদা এমন লোক ছিল না যে যেখান সেখান থেকে একটা কুড়ুনে মেয়ে বিয়ে কর্ব্বে! তা'র তেজ, গর্ব্ব, মর্য্যাদাভিমান যে জানে সে একথা কখনই বিশ্বাস করবে না। উনি তা'র নামে পাগল, তাই তা'র নাম করে যে যা' বলে তা'তেই বিশ্বাস করে বসেন ? তা'বলে আমি এর তদন্ত না করে ছাড়ছি নে'। নিশ্চয়ই বিনুদা ঐ হীন স্ত্রীলোকটার ফাঁদে পড়ে মৃত্যুকালে ওদের নিকট আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়ে ছিলেন, সে তাঁর কাছ থেকে সব কথা জেনে নিয়ে সেই আংটি ও ছবির জোরে জাল ওয়ারিস সেজে এসেছে। আমি আমার অবশ্য-প্রাপ্য সম্পত্তি অমনি ছাড়ছি নে।—"

শান্তির কম্পিত অধর ভেদ করিয়া একটা অস্ফুট ধ্বনি বাহির হইয়া পড়িল—"কি সর্ব্বনাশ!" ফুটন্ত গোলাপ যেন মুহূর্ত্তে শ্বেতপদ্মে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। ভীতা শান্তি একখানা কেদারার উপর বসিয়া পড়িয়া আর্ত্ত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"এমন কথা তুলে দিদিকে তুমি অপমান করো না। তোমার পায় পড়ি, চুপ কর—তাঁ'র কাছে আমি আর মুখ দেখাতে পারবো না।"

"শান্তি তুমি ভারি নির্ব্বোধ! এই রাজ ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করে তুমি কি আমায় সেই বাসড়ার জঙ্গলে ফিরে যেতে বল ? তুমি কি চাও আমি এই সমস্ত ছেড়ে বিরাগী হয়ে যাই, নয় তো দোরে দোরে ভিক্ষে করে বেড়াই ? তোমার কি ? বড়লোক বাপ আছে, সেখানে গিয়ে দিব্যি আরামে থাকবে, তুমি বল্‌বে না কেন।"

শান্তির রক্তহীন মুখ বিবর্ণতর হইয়া গেল। সে কাতর হইয়া উত্তর

করিল—"আমি কি তাই বলেছি? আমরা এখানে যেমন আছি, তেমনি থাকবো, কেউ তো আমাদের বাধা দিতে চায় না। অমূল্য ছেলেমানুষ তুমি তা'র কাকা, তা'কে তুমি যত্ন করে পালন কর্বে, এ বাড়ীতে আমাদের পূর্ব্বের মত সবই আছে, কেবল বেশীর মধ্যে আর একটা কর্ত্তব্য—"

"আমায় আর কর্ত্তব্যের লেক্‌চার শুনিয়ে কাজ নেই—কর্ত্তব্য নিয়ে তুমি ধুয়ে খাও; আমার কর্ত্তব্য আমি কর্ব্বো। আমি তোমার মত ক্ষেপি নি যে ওই জালিয়াৎ মাগীর তাঁবেদার হয়ে থাকব। না—কিছুতেই নয়, হয় এস্পার, নয় ওস্পার একটা কিছু চাই। দয়ার প্রত্যাশী—চৌধুরী বংশের রক্ত নিয়ে কেউ হয় নি।"

শান্তির সমস্ত শরীরের রক্ত যেন গরম জলের মত টগবগ করিয়া এক মুহূর্ত্তে ফুটিয়া উথলাইয়া উঠিতে লাগিল, সে দুই হাত দিয়া স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া তার বক্ষের উপর লুটাইয়া পড়িয়া নিরুদ্ধশ্বাসে কহিল—"আমি কখনো তোমায় কোন অনুরোধ করি নি, আজ আমার কথা রাখ—সতীসাধ্বীকে অপমান করো না—করলে কখনই আমাদের মঙ্গল হ'বে না, ঈশ্বর কখনই তা' বরদাস্ত করবেন না।—আমার মিনতি রাখো, ওঁদের সঙ্গে তিনিও আমাদের প্রতি যেমন দয়া করছেন তেমনই কর্বেন।"

সকালবেলা পুকুরঘাটে বাসন মাজিতে মাজিতে হরিদাসী বিমলীকে চুপিচুপি প্রশ্ন করিল—"কি লো, নতুন মুনিবনী লোক কেমন লো? তুই তো একরাত ঘর করে এলি।"

বিমলাদাসী কর্ত্রীর কাপড়খানা জলে প্রসারিত করিয়া দিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া উত্তর করিল—"তা' মন্দ না।—আমাদের এখানেও ঘাস জল সেখানেও ঘাস জল—গতর খাটাবো খাবো, তা'র আবার ভাল মন্দ! এই যে কথায় বলে 'অন্ধ জাগোরে, না কিবে রাত্তির কিবে দিন'।"

"তবে যে তারিণী বল্লে মাঠাকৃরুণের মত অমন নাকি মিলুনে ন'ন—একটু যেন ঠ্যাকারে ঠ্যাকারে?—বাব্বাঃ, মা-টি তো সরদারনি! উনি যদি এ ভিটেয় ঢুকে বসেন, তা হ'লেই লক্ষ্মীপুরের হাড়ের লক্ষ্মী ছাড়াবেন, তা আমি এই দিব্যি গেলে বলে রাখলাম।"

বিমলা একটু সাবধানী। সে আর একবার সেই আম্রচ্ছায়া ঢাকা পথপ্রান্তে চাহিয়া দেখিল, চারি পাড়ের তাল, আম, বাতাবীলেবুর ছায়া স্নিগ্ধ ঘাটের দিকে চকিত দৃষ্টি ফিরাইল। উত্তর পাড়ে কলমীদলের নিকট জলের ধারে একটা বিরাগী বক ছাড়া কেহ কোথাও নাই, বকটি চোখ বুজিয়া বোধ করি পরমার্থ চিন্তাই করিতেছে! গলার কাংস্য-বিনন্দিত স্বর মৃদুতর করিয়া বলিল—"তা' কিছু মিথ্যে বলেনি বোন! নতুন গিন্নির ভারি দ্যামাক, দুনিয়ার মনিষ্যির সঙ্গে গ্যাদায় কথা ক'ন না!—মা আমাদের যেমন মাটির মানুষ, তেমনি ধারা কি সব্বাই হ'বে, ওর জোড়াটী নেই? তা দ্যাখো আমাদের পোড়া অদেষ্টে আবার কি ঘটে!—বলি নিত্যি নিত্যি কাল পেঁচাই বা অমন করে ডাকে কেন?"

বিমলার স্বরে কোন প্রচ্ছন্ন রহস্যের পূর্ব্বাভাষ পাওয়া গেল। হরিদাসী বগনো ঘর্ষণে বিরত হইয়া বিস্ময়পূর্ণ চোখ তুলিয়া সঙ্গিনীর পানে তাকাইয়া বলিল—"কি লো, ব্যাপারখানা কি? তারিণী বলছিল, বড়গিন্নির মা নাকি মাঠাকুরুণকে দুটি চক্ষে দেখতে পারে না, উকুন হয় তো নখে করে মারে।—হ্যাঁ লা সত্যি?" "নয় তো কি? এসেই বলছিল এ সব তো আমার মেয়ের, ওরা এখন থেকে কোথায় থাকবে? তা আমাদের বাড়ীর খোসামুদিরাও যে তেমনি, বলেছেন নাকি—'নিজের পথ খুঁজে নেবে'?"

"এ সব ব্যাপার কর্ত্তাবাবু জানেন?"

বিমলাসুন্দরী কাচা কাপড়খানা নিঙড়াইতে নিঙড়াইতে পূর্ব্ববৎ সাবধানতা অবলম্বনপূর্ব্বক কহিলেন—"আর ব্যাপার! ব্যাপার অনেক দূরই গড়িয়েছে।—এঁদের তো এই—এদিকের খবর বুঝি শুনিস্ নি, কাল রাত্তিরে ছিয়াচার মিয়াচার ফেলে ছোটবাবু নাকি কর্ত্তাবাবুর সঙ্গে কুলুক্ষেত্তর কাণ্ড করেছেন! নব্‌নে বলছিল ছোটবাবু মুখ চোখ রাঙ্গিয়ে তাঁকে খুব কড়া কড়া কথা শুনিয়েছে, বুড়োমানুষ মনের দুঃখে ডুক্‌রে ডুকরে কেঁদে উঠেছে।"

শ্রোত্রী নিরুদ্ধশ্বাসে বলিয়া উঠিল—"বলিস কি লো! তা পরে? 'যা'র শিল তা'র নোড়া তারি ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া' ওমা এযে তা'ই করলে! ওমা, কার দৌলতে এত! হ্যাঁঃ, দেখি নি তো আর কিছু। পেরথম যখন বাবু নিজের ঘর থেকে এলেন, মুখে রা'টি নেই, আধ ময়লা কাপড় জামা পরেন—দেখতে দেখতে নবাব খাঞ্জে খাঁ!"

"আমরা আদার ব্যাপারী জাহাজের খবরে কাজ কি? কে যেন আসচে! দিদিমা ঠাকরুণ যে! আজ যে আপনার এস্‌তে এত বেলা হ'ল?"

সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরাণী দোক্তাপোড়া টেপা অধরে সৌজন্যের মৃদুহাসি হাসিয়া গাত্রমার্জ্জনী হস্তে ঘাটের পৈঠায় দাঁড়াইয়া আলস্য ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে বলিলেন—"কাল নাটক দেখে ঘুমুতে তো পাই নি, আলিস্যিতে গা ম্যাজ ম্যাজ করতে লেগেছে! শিবি কোথা গেল লা? ঘুম থেকে উঠেছে?"

"কোন যুগে! নতুন মা মাঠাকরুণের সঙ্গে পূজো বাড়ী গ্যাছে যেন।—তা' দিদি ঠাকরুণ! দু'টি যা'য়েতে ওনাদের দিব্যি মিল হয়েছে বাপু!"

কথাটা সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরাণীর মনঃপূত হইল না, তিনি মুখ বাঁকাইয়া শ্লেষের স্বরে কহিলেন—"অমন বোকা যা' পেলে সব্বারই মিল জুল হয়েই থাকে, পোড়া মেয়ে তো ভাল মন্দ বোঝে না!"

ক্রমে ক্রমে মাসীমা, মামীমা, পিসীমা, খুড়ীমাতে পুকুরঘাট ভর্ত্তি হইয়া গেল। থিয়েটার হেমেন্দ্র ও শিবানীর আলোচনায় তাঁদের প্রাভাতিক মিটিংটি মন্দ চলিল না।

যেদিন ৺পুরীধাম প্রত্যাগতা সিদ্ধেশ্বরী নিজের জনহীন গৃহে প্রবেশ করিয়া হতবুদ্ধি হইবার স্বল্প পরেই মহাপ্রসাদের ডালাখানি মেয়ের কটকী চুরি জোড়া ও খোকার জগন্নাথের বাটীটী হাতে মাতঙ্গিনীর সহিত বিস্ময় ও আনন্দে নিরুদ্ধবাক্ হইয়া বৈবাহিকের সুবৃহৎ বাসগৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেদিনকার চাইতেও লক্ষ্মীপুর জমিদারভবনে পা দিয়াই তাঁহার আনন্দ ও অহঙ্কার শতগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। মাসী পিসীদের নিকট সিদ্ধেশ্বরী নিজের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি সম্বন্ধে গল্প বলিয়া তাঁদের বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিতেছিলেন, নিরুদ্দিষ্ট জামাতার বোকামির প্রতিও ক্রোধের অন্ত ছিল না। এই সম্পত্তি সে মাটির ঢেলাটার মত ছাড়িয়া গেল? গেলই যদি, নিজের পরিচয়টা দিয়া গেল না? তা হলে

আপদস্বরূপ 'পুষ্যি বেটা' জুটিত ? মূঢ় শিবানী কোথা নিজের ধন পরের হাত হইতে বুঝিয়া লইবে, তা' না সেই অতি বড় শত্রুদের লইয়াই আহ্লাদে আটখানা হইয়া উঠিল ? কি মূর্খকেই তিনি গর্ভে ধরিয়াছিলেন ! সিদ্ধেশ্বরী কন্যার নিকট এ বিষয়ে অনেক তর্ক যুক্তি প্রয়োগ করিয়া হার মানিয়া বুঝিয়াছেন, উহাকে নিরাপদ করিবার ভার তাঁহাকেই লইতে হইবে। তিনি বাঁচিয়া থাকিতে তাদের হকে'র ধন যে অন্যে কাড়িয়া খাইবে সেও তো সহ্য হয় না। হিতৈষিণী বৈবাহিকাগণের শরণাপন্না হইলেন। হাজার হউক শিবানীর সঙ্গে তাদের রক্তের সম্পর্ক, শান্তির তো তা নয়।

সেদিন প্রভাত-সমিতিতে সিদ্ধেশ্বরী কহিলেন—"মেয়ে আমার বড় বোকা, নিজের ঘরে এলি, সব বুঝে পড়ে নে, তা নয় যেন চোর। আর তিনিই যেন সর্ব্বে সর্ব্বময়ী, আঁচলে এই চাবির গোছা ঝুলিয়ে মদগর্ব্বে চারটে হয়ে ফুলে উঠছেন। বলি তুই বা কি হিসেবে পরের ধনে পোদ্দারি করিস্!"

মামীমা বলিলেন—"তা'ই তো, ও যেমন দেবা তেমনি দেবী ! বাপটিও কি কম তুখোড় ভেবেছ ? দেখলে না, আমোদ পেরমোদ ছেড়ে মেয়ের সঙ্গে ফুস্‌ফুস্ গুজ্‌গুজ্—মেয়েকে বোধ করি আইনের কানুন শেখান হচ্ছিল ?"

"মেয়ে আমার ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে আছে ! জাঁহাবাজ সহুরে মেয়ের কাছে ও পারবে কেন বল ?" বলিয়া সিদ্ধেশ্বরী গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলেন—"বাছা আমার কারো অমন্দে নেই, তা'কে বঞ্চিত কর্ব্বার জন্যে কেন যে ফন্দি এঁটে বেড়াচ্ছে তা'ও জানি নি ! তা দেবতা আছেন, কলিকাল হ'লেও অতটা ধর্ম্মে সইবে না। ওর শাশুড়ীর অতটা গহনা, বল্লুম, 'মেয়েটা নোয়া সার করে রয়েছে, তোমার হাতের চুড়িগুলো

ওকে পরিয়ে দাও', পারলে? এদিকে 'দিদি' বলে নাকে কেঁদে খুন।"

পিসীমা এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন, তিনি একটু ন্যায়বাদী। এবার বলিয়া উঠিলেন—"অমন কথা বলো না বেন, ছোট বৌমা তখনি তো চুড়ি খুলে বড় বৌমাকে পরিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন, তিনি কিছুতেই পরলেন না। বাড়ী এসেই অন্য চুড়ি বার করে পরাতে গেলেন,বড় বৌমা কাঁদতে কাঁদতে বল্লেন—'আমার কি এখন সখের দিন এসেছে?' বৌমা আমাদের লক্ষ্মী, তাঁর নিন্দে করো না। হেমাটা পাজি বটে তা একশো বার বল্‌বো।"

সিদ্ধেশ্বরী মুখ টিপিয়া একটু ইঙ্গিতের হাসি হাসিয়া মাসীমার পানে চাহিলেন, মাসীমা ইসারা বুঝিয়া একটু মৃদু হাসিলেন।

সিদ্ধেশ্বরী কহিলেন—"ওগো ওসব তোমরা বোঝ না! ইনি হচ্ছেন মিটমিটে-ডান, ভাজামাছখানি উল্টে খেতেও জানেন না, কিন্তু কলকাতার মেয়েদের পেটে পেটে বুদ্ধি, ওদের হাড়ে ভেল্কি খেলে! হেমের দোষ দিচ্চ? সেটা তো হাঁদা, তা'কে যেমন পরামর্শ দেবে তেমনি কর্‌বে! দেখলে না যেমন সেধো এসে বলেছে, 'ছোটবাবুর বোধ হয় অসুখ করেছে', অমনি মেয়ে লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে বৈঠকখানাতেই বাইনাচ নেচে ছুটে গ্যালো! ধন্যি বাবা কলিকাল! তোমার পায়ে হাজারবার গড় করি!

মামীঠাকুরাণী সুদীর্ঘ নিশ্বাস টানিলেন—"হিংসের চোখ থেকে বিনোদের গুঁড়োটুকুকে যে কেমন করে রক্ষে করবো তা জানি নি!"

সিদ্ধেশ্বরী সজোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন—"যেদিন দেখেছি ঘরে শত্তুর জিয়োন, সেদিন হ'তেই ওর আশা আমি ছেড়ে দিয়েছি। বাছা আমার অগ্নিকুণ্ডের মাঝখানে!

বিনোদের মাতৃষসা মুণ্ডিত মস্তক ঠাণ্ডা করিবার উদ্দেশ্যে অঞ্জলি করিয়া জল দিতে দিতে দুঃখের চরমে উঠিয়া বলিলেন—"হুঁ, ও আবার বাঁচবে! ওকি বাঁচতে এসেচে, ও শুধু আমাদের ছলতে এসেছে বই তো না। বিনু যেমন জ্বালিয়ে গ্যাছে, ও-ও তেমনি জ্বালিয়ে যা'বে। দেখচো না, ওকি বাঁচবার ছেলে? এই বয়সে কত কথা, কত বুদ্ধি! আমায় বলে 'দিদি', চৌধুরীমশাইকে বলে 'দাদা'—যেন কতকালের চেনাশোনা।"

কাদম্বিনী পিসি গাত্র মার্জ্জনা করিতে করিতে ঈষৎ ক্রন্দনের সুর তুলিলেন—"ওই জন্যেই তো ছেলেটার পানে তাকাই নে' মাসী! বলি ওতো বাঁচবেই না, মিথ্যে কেন মায়া বাড়াবো?"

সেদিনকার প্রভাত শান্তির পক্ষে বড় মধুর হইয়া আসে নাই। রাত্রে হেমেন্দ্র তার সহস্র অনুনয় ঠেলিয়া, অজস্র অশ্রুজল উপেক্ষা করিয়া শ্যামাকান্তের সহিত কলহ করিয়াছে, সে তাঁর সব চেয়ে আপনার ধন অমূল্যকে জাল বলিয়া তাঁকে আহত করিয়াছে। সেই লজ্জায় সে মরিয়া গিয়াছিল। সারারাত্রি সে একবার ঘুমায় নাই।

অভ্যস্ত কর্ম্মবন্ধনে সে তার উৎক্ষিপ্ত চিত্তকে বাঁধিতে পারিতেছিল না। সে এ সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী—আজ তার বাড়ী নিমন্ত্রিতে পরিপূর্ণ। তার কত দায়িত্ব, কিন্তু কিছুতেই সে অপরাধের গণ্ডী হইতে চরণ ছাড়াইতে পারিতেছিল না। স্বামীর অপরাধের সেও অংশ-ভাগিনী এমনি বোধ করিতেছিল! থিয়েটারের কনসার্টে তানলয়-সমন্বিত মধুর স্বর-লহরী, সঙ্গীতের প্রত্যেক পদটি পর্য্যন্ত কক্ষমধ্যে ধ্বনিত হইতেছে—বৃষ্টিহীনা জ্যোৎস্না রাত্রির নির্ম্মল শোভা মুক্ত জানালার মধ্য দিয়া প্রকৃতি তার চোখের সম্মুখে বিস্তৃত ক'রিয়া দিয়াছেন, কিন্তু শান্তির মনে প্রাণে কিছুই পৌছিতেছে না। নিজের জন্য, স্বামীর জন্য ক্ষণে ক্ষণে ঘোর

লজ্জা অনুভব করিয়া সে সেই অন্ধকারেও আপনার নিকট আপনি আরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। কি দিয়া যে এই অকথ্য লজ্জা ঢাকিবে, খুঁজিয়া পাইতেছিল না। সকালে উঠিয়া কেমন করিয়া জ্যেঠামহাশয়ের কাছে মুখ দেখাইবে? শিবানীর চোখের উপর চোখ রাখিবে কেমন করিয়া? এমন কি অমূকে আদর করিবার অধিকার যেন তার ফুরাইয়া গিয়াছে।

ভোরের বেলা স্বপ্নপূর্ণ তন্দ্রার মধ্য হইতে জাগিয়া সে শুনিল রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিয়া অমূল্য ডাকিতেছে—"কাকীমা?" "কি মাণিক!" বলিয়া সে দ্রুত উঠিয়া পড়িল। দ্বার খুলিতেই নগ্নকায় শুভ্র কান্তি শিশু তার জানু জড়াইয়া ধরিল, সদ্যজাগ্রত পাখীর কলকাকলীর স্বরে কহিল—"পাইয়ে এতেচি।"

শান্তির প্রথম সঙ্কোচ এমনি করিয়া কাটিয়া গেল। সে সানন্দে শিশুকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া গভীর কৃতজ্ঞতায় তার ললাটে গণ্ডে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে করিতে ঘরে প্রবেশ করিয়া যেন অর্দ্ধেকটা হৃত শান্তি ফিরিয়া পাইল, জিজ্ঞাসা করিল—"অমূ! তোর মা কোথায়?"

অমূল্য তার কচি হাত দুইখানি দিয়া কাকীমার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া সশব্দে তার চুম্বন প্রতিদান করিয়া কহিল—"মা ঘরে আমি বাজনা দেবো।

"আমি তোকে একটা ভাল বাজনা দিই আয়, এই নে' একটা বাঁশী নে'।—চল্ তোর মার কাছে যাই।"—'যাই' বলিয়াও শান্তি যাইতে পারিল না—এতক্ষণে হয় তো শিবানী সব কথা শুনিয়াছে। শুভার্থী-দিগের কল্যাণে এ সব সংবাদ প্রচার হইতে সময় লাগে না। এতক্ষণ সে তাদের কি মনে করিতেছে।"

শিবানী আসিয়া ডাকিল—"শান্তি তুই উঠিস্ নি?"

সন্ধ্যাবেলা যখন হেমেন্দ্রের অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া শান্তি ব্যস্ত

হইয়া চলিয়া গেল, তখন হইতেই শিবানী একা।—এত বড় বাড়ী, এত সব লোকজন এবং তার প্রতি তাদের অযাচিত স্নেহ করুণার উৎস সহস্রধারে উৎসারিত হওয়া সত্বেও সে একমাত্র শান্তিবিহনে একেবারেই একা!—রাত্রে সে ফিরিল না দেখিয়া দেবরের সংবাদ লইতে যাইবার জন্য তার নিস্পৃহচিত্তে একটা প্রবল স্পৃহা জাগিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু হেমেন্দ্র যদিও তার নিকটতম আত্মীয় এবং প্রিয়তর স্নেহাস্পদ, তথাপি তারা এ পর্য্যন্ত অপরিচিত পর, সহসা অচেনা লোকের সম্মুখে গিয়া দাঁড়ান, শিবানীর পক্ষে অসম্ভব, সে ইচ্ছা সত্বেও যাইতে পারিল না।

শান্তি ঠিকই আঁচিয়াছিল—হেমেন্দ্রের সহিত গৃহস্বামীর বচসার একটা অতিরঞ্জিত আলোচনা সেদিন কর্ম্মগৃহের সমুদয় নর এবং নারীর মুখে মুখে পল্লবিত হইয়া পড়িয়াছিল, শিবানী দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল—"ঠাকুরপোর কি অসুখ করেচে?"

দাসী মুখ বাঁকাইয়া কহিল—"হুঁ—অসুখই বটে!"

"তবে কি হয়েছে?"

"হবে আবার কি, আমাদের খোকাধনকে দেখে হিংসেয় জ্বলে উঠেচেন, এই নিয়ে কর্ত্তাবাবুর সঙ্গে নাকি কুলুক্ষেত্তর হয়ে গেল! নব্নে বলছিল, তিনি নাকি বলেছে, তুমি আমাদের দাদাবাবুর বিয়ে করা ইস্তিরি নও।—কি ঘেন্নার কথা গো!"

শিবানী আর্ত্তভাবে বাধা দিল—"চুপ করো বিমলা! শান্তি কোথায়?"

বিম্লি আশ্চর্য্য হইয়া গেল, বলিল—"কি জানি বড় মা! মাঠাকরুণ বোধ হয় কর্ত্তাবাবুর ঘরে, কি ছোটবাবুর ঘরে কোথাও আছেন—তা' হ্যাগা—তুমি যে বড় থিয়েটার দেখতে গেলে না? পাড়ার মেয়েরা সব এয়েচেন, তোমায় সবাই খুঁজতে নেগেচেন যে!"

শিবানী বলিল—"বলগে' আমার অসুখ করেছে।"

"ওমা সে কি গো! মাঠাকৃরুণ গেলেন না, তুমিও যা'বে না, নোকে বল্‌বে কি? তুমিই তো এখন বাড়ীর গিন্নি, তুমি 'নোক নৌকতা' না রাখলে চলবে কেন?"

শিবানী ত্বরিৎপদে উঠিয়া তাড়াতাড়ি বলিল—"যাবো, তুমি যাও।" —তার চোখ চকচকে হইয়া উঠিল। সে এ বাড়ীর গৃহিণী? কেমন করিয়া? কেউ তাকে এ অধিকার দিতে ডাকিয়াছিল? যে এ অধিকার দিতে পারিত, সে ইহা হইতে তাকে দূরে ঠেলিয়া রাখে নাই? সে এ বাড়ীর কে'? কেউ না।—

ভোর হইতে না হইতে শিবানী আর থাকিতে না পারিয়া শান্তির গৃহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। হেমেন্দ্রের উপস্থিতি সম্ভাবনাও তাকে সঙ্কোচ দিতে পারিল না। শিবানীকে দেখিয়া শান্তিও গভীর সঙ্কট হইতে মুক্তি পাইয়া বাঁচিল, সাহ্লাদে বলিয়া উঠিল—"দিদি? আমরা তোমার কাছেই যাচ্ছিলুম।"

আসন গ্রহণ করিয়া শিবানী বলিল—"অমূটা ঘুম ভাঙ্গতেই পালিয়ে এসেছে, কিছুতেই ওকে আটকে রাখতে পারি নে, ঠাকুরপো আছেন মনে করে তবু অনেকক্ষণ উঠতে দিই নি।"

এই কথায় শান্তির গাল দুইটা আরক্ত হইয়া উঠিল, সে মুখ নত করিয়া অমূর কোঁকড়া চুলের গুচ্ছ নাড়িতে লাগিল। বালক তখন নূতন বাঁশী পাইয়া কাকীমার কোলে বসিয়া বাজাইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু অবাধ্য বাঁশী ভাল করিয়া বাজিতেছে না।

স্নানান্তে পট্ট-বসনা বধূদ্বয় দেবালয়ের ঘেরা দালানে বসিয়া মালা গাঁথিতেছিল। শান্তির নিপুণ হস্তে দুইগাছা গোড়ে তৈয়ার হইয়া গিয়াছে, কিন্তু শিবানীর অনভ্যস্ত হাতে একগাছি বই গাঁথা হয় নাই।

দেবালয়ে তখনও লোকসমাগম হয় নাই, ব্রাহ্মণরা পূজার আয়োজন করিতেছিলেন, একজন বিধবা আত্মীয়া নৈবেদ্য প্রস্তুত করিতেছেন।

মনের উপর হইতে বেদনার ভারটা কোন সময় যে নামিয়া গিয়াছে জানিতে পারে নাই, হঠাৎ সে শিবানীর পানে ফিরিয়া বলিল—"ও দিদি! তোমার এখনও সেই মালাটা শেষ হয় নি?"

শিবানী অপ্রতিভভাবে ঈষৎ হাসিল—"আমি ভাই বড্ড কুড়ে—এরি মধ্যে তোর তিন গাছা গাঁথা হয়ে গেল?"

শান্তি সমাপ্ত মালাগাছার মুখে গ্রন্থি দিয়া অবশিষ্ট সূতাটুকু কাঁচির সাহায্যে কাটিয়া ফেলিয়া তাহা অন্য মালাগুলির পার্শ্বে তাম্রপাত্রে সাজাইয়া রাখিতে রাখিতে কহিল—"কিন্তু দেরী হ'লে কি হয়, আমার মালার চেয়ে তোমার মালার গাঁথুনি অনেক ভাল হয়। দিদি ভাই তুমি বিনা সুতোর মালা গাঁথতে জান?"

সূঁচের মুখে ফুল পরাইতে পরাইতে সেইদিকে চোখ রাখিয়া শিবানী উত্তর দিল—"জানি, কিন্তু বড্ড দেরী হয়।"

"তা' হলোই বা—এস রাধাকৃষ্ণের জন্যে দু'জনে দু'গাছি কৃষ্ণকলির মালা গাঁথি। আহা, সেদিন যদি গেঁথে দিতুম—কেমন সুন্দর দেখাত! আমার রাজরাজেশ্বরীর জন্যে পদ্ম পাপড়ি দিয়ে একগাছি নতুন রকম করে মালা গাঁথতে হবে। এই বড় লাল গোলাপটি তা'র মধ্যে দেবার জন্যে থাক।"

শিবানী জিজ্ঞাসা করিল—"পদ্মফুল কোথায় পা'বি?"

শান্তি তার মধুর হাস্যে প্রভাতপবনে ঝঙ্কার তুলিয়া কহিয়া উঠিল—"তুমি বুঝি কিছুই চেয়ে দেখ না! খিড়কির বড় পুকুরের উত্তর দিকটায় অনেক পদ্ম ফুটে আছে তো, দাঁড়াও, মালা শেষ করে তুলে আনা যা'বে।"

"ওমা! এরি মধ্যে তোর প্রায় অর্দ্ধেকটা হয়ে এল যে! শান্তি! আমি ভাই বড় অকর্ম্মা, তুই আমায় একটু কাজের লোক করে নে'না ভাই!"

শান্তি হাসিয়া বলিল—"আমি যেন বড্ডই কর্ম্মী! মা বলতেন, আমার কাজ তাড়াতাড়ির জন্যে পরিষ্কার হয় না। তোমার কাজই আমার চেয়ে ঢের ভাল।"

"আমি জানিই বা কি? সে বইটা শেষ হয়ে গেছে, আর একখানা দিস্, রাত্রে ঘুম না হলে পড়বো।"

"এর মধ্যে শেষ হয়ে গেছে? আচ্ছা 'অনাথবন্ধু' তোমার কেমন লাগ্‌ল?"

শিবানী ব্যথিত নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"বেশ লাগল শান্তি! কিরণশশী বড় দুঃখী, দুঃখীর মনে দুঃখের কথাই বেশী লাগে; কিন্তু শেষটা যেন কি রকম হয়ে গিয়েছে ভাল বোঝা যায় না।"

"শেষটাতে হিন্দু গৃহস্থের জানবার উপযোগী অনেক ভাল কথা আছে। কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও স্বদেশহিতৈষিতার মধ্যে আমাদের সংসার কেমন করে গঠিত হ'তে পারে, এ বইখানি তা'রি একখানি সুন্দর উপদেশপূর্ণ চিত্র। বাবা সুকুকে বলেন, 'অনাথবন্ধুর মত হও'—সুকুর পক্ষে আমি এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ কিছুই মনে করি না, তা দিদি! সুকুও বোধ হয় অমনি ভাল হ'বে।—এখন থেকেই সে বিদেশী জিনিষ স্পর্শ করে না, পরের উপকার করতে পারলে এত খুসী হয় যে, নিজের কোন ক্ষতি গ্রাহ্য করে না। 'পারিবারিক প্রবন্ধ' বোধ হয় পড় নি?"

"না ভাই, আমি কাশীদাসী মহাভারত, আর কৃত্তিবাসী রামায়ণ ভিন্ন আর কিছুই তো পাই নি।"

"বাবা বলেন, 'পারিবারিক প্রবন্ধ' আমাদের দ্বিতীয় 'মনুসংহিতা', ঐটে পড়ো।"

যোগেন্দ্র জুতা পরিয়া বাহির হইয়া গেল।

সম্মুখের বাগানে পুরাতন মালিটা ঝারি করিয়া গাছে জল দিতেছিল, যোগেন্দ্রকে দেখিয়া সেলাম দিল, যোগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল রায় সাহেব ঘরে আছেন।

সম্মুখের হলে কাহাকেও না দেখিয়া সে গৃহস্বামীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। সে ঘরে প্রথম সন্ধ্যাতেই একটা অনুজ্জ্বল দীপ জ্বালাইয়া মেঝের উপর আসন পাতিয়া নীরদকুমার খেরো বাঁধা এক পুঁথি নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিতেছিল। যোগেন্দ্রের সশব্দ প্রবেশও সে জানিতে পারে নাই।

যোগেন্দ্র ঘরখানার চারিদিকে সাশ্চর্য্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। সে ঘর প্রতিমাবর্জ্জিত চণ্ডীমণ্ডপের মত খাঁ খাঁ করিতেছে। গৃহস্বামীর নিকটে গিয়া বলিয়া উঠিল—"জিনিষগুলো গেল কোথা? আলোটারই বা এমন দশা কেন?

সম্বোধিত ব্যক্তি মুখ তুলিল—"কি দশা?"

"চরম দশা! ল্যাম্পটা বুঝি চাকরেরা ভেঙ্গে ফেলেছে? বেটাদের জ্বালায় কিছু টিকতে পা'বে না। এলে কবে?"

নীরদ উত্তর দিল—"মিথ্যে চাকরদের গাল দিচ্চ, তা'রা ভাঙ্গে নি, রাজার দেশের আমদানি তা'ই তা'কে খাতির করে তুলে রেখেছি। তুমি ফিরলে কখন?"

"আজ। বাঃ, আমার প্রশ্নটার উত্তরই দেওয়া হ'ল না যে বড় কোথায় যাওয়া হয়েছিল বল তো?"

নীরদ পুনশ্চ আলোর দিকে ঝুঁকিয়া পুঁথির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া পাতাখানা উল্টাইল—"রামনাদ।"

"হেতু?"

নীরদ হাসিয়া বলিল—"পুলিসের মত জুলুম আরম্ভ করলে যে? দোহাই দারোগা সাহেব! তোমার সোনার 'দোত কলম' হোক, বিলক্ষণ জানো কাজের জন্যে আমায় সেখানে মধ্যে মধ্যে যেতে হয়।"

যোগেন্দ্র এদিক ওদিক চাহিয়া বিরক্তভাবে বলিয়া উঠিল—"একটা কিছু নেই যে বসি।"

নীরদকুমার কহিল—"ঐ তো বিছানা রয়েছে, বস না।"

যোগেন্দ্র বসিল না, দাঁড়াইয়া থাকিয়াই বলিল,—"ওটা একেবারেই অনভ্যাস। চল অন্য ঘরে যাই।"

নীরদ হাসিল—"দু'দিন কেরাণীগিরী করে চিরকালের অভ্যাস জন্মের মত ফুরিয়ে গেল? ওগো মশাই! বাঙ্গালীর ছেলে মা ধরিত্রীর কোলে বসে দেখ কত আরাম।"

"ঈস্! এক মাসেই সত্যানন্দ হয়ে উঠেচ যে? তুমি যা' কর্‌বে সবই কি বাড়াবাড়ি!"

নীরদ গম্ভীরভাবে তামাসাটা গায় লইয়া বলিল—"আশীর্ব্বাদ কর, তা'ই যেন হই।"

অগত্যা যোগেন্দ্রকে বিপুল দেহভার ভূমিতেই ন্যস্ত করিতে হইল। আজ তার অনেকগুলো ঝগড়া জমা করা আছে, তাহা লইয়া তীক্ষ্ণ শ্লেষের শরবর্ষণে ইহাকে ক্ষত বিক্ষত করিতে দৃঢ়সংকল্প লইয়া সে আসিয়াছিল; তা'ই নূতন তর্ক জুড়াইল না।

আসন গ্রহণ করিয়া বলিল—"পিসেমশায়ের কাছে আমার মুখ পুড়িয়ে দিলে কেন? তোমার ব্যবহারে আমি অবাক হয়ে গেছি!" ইচ্ছা করিয়াই যোগেন্দ্র কথাগুলা যথাসাধ্য কড়া করিয়া বলিল কিন্তু শ্রোতা উত্তেজিত হইল না, একটু চঞ্চলভাবে কহিল—"আমার ব্যবহারে?"

"হ্যাঁ, তোমার ব্যবহারে!—সেদিন তুমি তাঁ'র সঙ্গে দেখা করতে

গিয়ে কি রকম অভদ্র ভাবে হঠাৎ পালিয়ে এলে ভুলে গেছ? তারপর সহসাই নিরুদ্দেশ! যেন কোন দাগী আসামী পুলিসের ভয়ে লুকিয়ে ফিরচো। তাঁ'র পরিবারবর্গের সঙ্গে অত অন্তরঙ্গতা অথচ তাঁর সঙ্গে দেখাটি পর্য্যন্ত নয়, এর মানে কি?"

নীরদ উত্তর করিল না, মুখটা নীচু করিয়া নীরবে পুঁথির খোলা পাতাটা দেখিতে লাগিল, দীপ ছায়ায় মুখখানা তার সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যোগেন্দ্র পুনশ্চ কহিল—"তাঁ'র কাছে আমি তোমার কত সুখ্যাতি করেছিলাম, আর কি অদ্ভুত ভাবেই তুমি নিজের পরিচয় দিলে!"

ধিক্কারের সহিত হতাশার স্বরটুকু অত্যন্ত করুণ হইয়া আসিল। এবার নীরদ মাথা তুলিয়া সবেগে বলিয়া উঠিল—"আমি তো তোমার কাছে কোন সার্টিফিকেট চাই নি—বাজে খরচ কেনই বা করতে গিয়েছিলে? যা'কে নিজেই চেন নি, অপরকে তা'র সম্বন্ধে কি বোঝাতে চাও?"

যোগেন্দ্র এ প্রতিবাদে হঠিল না। তবে তার উত্তেজনায় কিছুটা অবসাদ আসিয়াছিল, সবিষাদে বলিয়া উঠিল—"হায়, হায়, আমার কি প্ল্যানটাই তুমি মাটি কর্‌লে! আহা ভবিষ্যতের কি ছবিখানাই যে প্রাণ দিয়ে এঁকেছিলুম—"

নীরদকুমার জোর করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল—"Trust no future, however pleasant."

সে হাসিটা মোটেই স্বাভাবিক নয়, ইহা বুঝিতে স্থূলবুদ্ধি যোগেন্দ্রেরও বিলম্ব হইল না, সে কোন এক অজ্ঞাত ব্যথায় বন্ধুকে ব্যথিত বুঝিয়া থামিয়া গেল।

নীরদ প্রফুল্লতা দেখাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। সে স্ত্রী

পুত্রকে রাখিয়া আসিয়াছে শুনিয়া বলিল—"তবেই হয়েছে! চাকরী খোয়া গেলে, ক'দিন তিষ্ঠবে?"

"ঈস্—যেন পারিনে!"

"সে আমার জানা আছে!"

যোগেন্দ্র হঠাৎ প্রশ্ন করিল—"পুঁথিখানা কিসের হে? মাণিক-পীরের গান, না মনসা পুরাণ?"

নীরদ অনুজ্জ্বল প্রদীপটা উজ্জ্বল করিয়া দিয়া মৃদু হাসিয়া পুঁথিখানা ললাটে স্পর্শ করিয়া সসম্ভ্রমে উত্তর করিল—"বেদান্ত দর্শন।"

"সর্ব্বনাশ! তবেই সেরেছ!"

নীরদ বিরক্তি তিক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"দর্শনের সঙ্গে সর্ব্বনাশের যোগ কোথায় পেলে?"

"খুবই কাছাকাছি। তোমার কাছে কি অপরাধটা করেছি যে এমনি করেই তাড়ালে?"

"তাড়া যদি ইচ্ছে করে খাও, আমি দায়ী নই।—রজ্জুতে সর্প ভ্রম করে অতখানি আঁতকে উঠ না; রসগোল্লাটা খোরাক নয়, রসালাপটা না হয় একটু কমই পড়ল? কি হল? মুখের দিকে অমন করে চেয়ে রইলে যে? আমায় কোন রকম ভয়ানক দেখাচ্ছে নাকি?"

উথলিত বিস্ময় দমন না করিয়া স্তম্ভিত যোগেন্দ্র সবিষাদে বলিয়া উঠিল—"একি শ্রী হয়ে গেছে! চুলগুলোরই বা এমন দশা কেন, জটা বানাবে?"

নীরদ সকৌতুকে হাসিয়া উঠিল, কহিল—"না না, সে মৎলব আপাততঃ নেই। মিলিটারী ফ্যাসানে চুল না ছেঁটে চিরকেলে প্রথায়—"

যোগেন্দ্রের ক্রমেই ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতেছিল, সে চীৎকার করিয়া বলিল—"গোল্লায় যা'ক তোমার প্রথা !—এ সমস্ত তোমার কি নতুন ঢং ? আবার সেই সত্যযুগে ফিরে যাবার চেষ্টা নাকি ? হঠাৎ এত বড় দার্শনিক সংস্কারক এক সঙ্গে সব কি করে হ'লে ?"

"চেষ্টা করা মন্দ কি ! "প্রারম্ভতে ন খলু বিঘ্নভয়েন নীচা"—ইহা বলিয়া তর্কটাকে পাকাইয়া না তুলিয়া হঠাৎ উঠিয়া পড়িল, বলিল—"চল—বাইরে গিয়ে বসা যা'ক, এ ঘরের হাওয়া তোমার ঠিক সইছে না।"

যাইতে যাইতে যোগেন্দ্র প্রশ্ন করিল—"শোবে কিসে ?"

ভূমে একটা গালিচা পাড়া ছিল, দেখাইয়া নীরদ কহিল—"ঐ যে।"

"ঐতে ?"

নীরদ মৃদু হাস্যের সহিত তার মুখের পানে চাহিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—"তাই।"

অনেক রাত্রে যোগেন্দ্র বিদায় লইল। বিদায়-অভিবাদন জানাইতে গেলে, নীরদ ব্যস্ত হইয়া বাধা দিল—"ও সব কায়দা ছাড়ো।"

"সে কি ! ওযে তোমার কাছে শেখা হে !"

"আমিই প্রত্যাহার করছি।"

যোগেন্দ্র যে বাড়ী হইতে আহার করিয়া আসে নাই তাহা সে এখানের সমস্ত উলট-পালটের মধ্যে ভুলিয়া গিয়াছিল, নীরদও পূর্ব্বের মত নিজে হইতে নিমন্ত্রণ করিল না বরং সে বিদায় চাহিবামাত্র বলিল—"রাত হয়ে গেছে—এসো।"

রাত ত পূর্ব্বেও হইত ! যোগেন্দ্র বাড়ীর টানে ছুটিতে চাহিলে সেই তাকে ধরিয়া রাখিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছে—"একটু দেরী হ'লে পদপল্লবে মাপ পা'বে খন।"

আজ বন্ধুত্ব গর্ব্বে একান্ত আহত যোগেন্দ্র তা'ই দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল। মনে মনে বলিল—"বন্ধুত্বের চেয়েও তোমার পুঁথি বড় ? বেশ!—তা'ই নিয়েই থাকো।"

বাড়ী গিয়া খাবার চাহিতে পাচক কুণ্ঠিতভাবে জানাইল, পূর্ব্বে ম্যানেজার সাহেবের বাসায় গিয়া কখনও না খাইয়া ফিরেন নাই বলিয়া আজও সে রাঁধে নাই।

যোগেন্দ্র চটিয়া উঠিয়া তাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিল, তার পর খুব তাগিদ দিয়া লুচি ভাজাইয়া আহারে বসিল। পৃথিবীর এই প্রধান ভোগ্যটাকে সে মনের কোন লাভ লোকসানের অংশভাগী করিতে চাহে না।

পরদিন প্রত্যূষে স্নান করিয়া গরদের ধুতি পরিয়া শয়ন গৃহেরই একটি পাশে কম্বলের আসনে বসিয়া নীরদকুমার আহ্নিক সারিল, তা'র পর সটীক শঙ্করভাষ্য লইয়া বসিয়া একটা জটীল সূত্রের মীমাংসা খুঁজিয়া হতাশ্বাস হইবার উপক্রম করিয়াছে, এমন সময় ভৃত্যের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে যোগেন্দ্র সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল—"যা' ভেবেছি তা'ই!—এরই মধ্যে আমার প্রবেশ নিষেধ!"

নীরদ জটিল সমস্যা অমীমাংসিত পরিত্যাগ করিয়া পুঁথি রাখিয়া বলিল—"চটো না যোগেন! সবারি একটা অন্তঃপুর বলে জিনিষ তো থাকে? মনে কর আমারও এটা তা'ই। এস ও ঘরে যাই—তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।"

"কেন—এ ঘরে কি অহিন্দুদের স্থান নেই নাকি? ঘরটা অপবিত্র হয়ে যা'বে?"

নীরদ অপ্রতিভ হইল না বরং হাসিয়া উত্তর দিল—"মিথ্যে কি?

তোমার পায়ে জুতো রয়েছে, তা' ছাড়া তোমার এখানে বসবার সুবিধা হ'বে না, যুবরাজকে উচ্চাসন দিতে হ'বে ত ?"

দু'জনে নীরদের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল। সে ঘরে সোফা ও কৌচ কেদারা নাই, পরিবর্ত্তে সতরঞ্চ ও জাজিম পাতা তক্তাপোষ বিরাজ করিতেছে। লিখিবার টেবিলটা একধারে আছে, তার উপর পিতলের ফুলদানীতে ফুলের গুচ্ছ শুকাইয়া গিয়াছে, এখনও বদলানো হয় নাই। যোগেন্দ্র চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া অবাক হইয়া বন্ধুর মুখের দিকে চাহিল। বন্ধু সে মৌন বিস্ময় বুঝিয়াছিল, রুদ্ধ জানালা খুলিতে খুলিতে আপনিই বলিল—"নিলেম করে দিয়েছি।"

"কারণ ? সেগুলো তো ভাঙ্গেনি ?"

"কারণ সেগুলো অনাবশ্যক।"

যোগেন্দ্র উত্তেজিত হইয়া বলিল—"অনাবশ্যক ?—সেগুলো অনাবশ্যক! আর আবশ্যক হ'ল তোমার এই জঘন্য তক্তাপোষ? আশ্চর্য্য করেছ !"

আবশ্যকীয় এ'ও নয়, তবে কি জানো, এরা পোষ্যের সামিল, তাঁ'রা নিমন্ত্রিত, তাঁ'দের খাতির করতে গরীবের প্রাণান্ত। আরও কি জান, যে ছিল, সেই থাক, নতুনকে ভাস্কর পণ্ডিতের মত ডেকে এনে কি লাভ ? যোগেন্দ্রের তর্ক অনাবশ্যক হ'লেও শুনতে পারি, ধুন্ধুরাম আপ্পের তর্ক সহ্য হবে কেন ?"

যোগেন্দ্র অনাবশ্যক তর্ক তুলিল না। নীরদ তাহাকে নিজের বক্তব্য বলিল। রামনাদে একদিন এক মহাত্মার সাক্ষাৎ ঘটে। পরমানন্দ স্বামীর সহিত প্রথম তার যে আলাপ হয়, তাহাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা চলে না। সন্ন্যাসী স্মিতগম্ভীর মুখে অনুত্তেজিত কণ্ঠে এমন কতকগুলি কথা বলিলেন যে এক মুহূর্ত্তে অবিশ্বাসীর মস্তক তাঁর পদতলে লুণ্ঠিত হইল।

নীরদ তখন ঠিক প্রকৃতিস্থ ছিল না,। সে তখন বিশ্বসংসারের সমস্ত সহজ পথ ছাড়িয়া এমন কোন একটা রাস্তা খুঁজিতেছিল, যাহা ধরিলে অতীত বর্ত্তমানের সহিত ভবিষ্যৎকে পৃথক করিয়া ফেলা যায়। এমন সময় সহসা এই সাক্ষাৎ! ত'াই তার নিকট এই ঘটনা ঈশ্বরের প্রেরণা বোধ হইল। নিজেকে সে তাঁর পায়ে স'পিয়া দিল।

যোগেন্দ্র এই পর্য্যন্ত শুনিয়া অসহিষ্ণুভাবে বাধা দিল—"তা'ই তিনি দয়া করে এই সহজ পথখানি বাৎলে দিলেন? বড্ড দয়া—ভণ্ড বেটা!"

নীরদ গর্জ্জিয়া উঠিল—"চুপ! তাঁর সমালোচনা করো না!"

তেমন তীব্র দৃষ্টি যোগেন্দ্র সে চোখে কখনও দেখে নাই। সে লজ্জিত হইয়া নীরব রহিল।

নীরদ বলিতে লাগিল—"তিনি কর্ম্মযোগী, সনাতন ধর্ম্ম প্রচার তাঁর জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য।—স্বদেশানুরাগে সেই উন্নত হৃদয় পরিপূর্ণ।"

কয়দিনমাত্র একত্রে থাকিয়া নীরদ নিজের অভিপ্সিত পথ চিনিয়া লইয়াছে। তিনি তাকে সাধ্যায়ত্ত একটি কার্য্য লইতে বলিয়াছেন এবং তাঁর একজন পণ্ডিত শিষ্যের নিকট সে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেছে। বলিয়াছেন, এখন তাকে এই পথে চলিতে হইবে, সময় উপস্থিত হইলে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন, সে ভার এখন হইতে তাঁর উপরই অর্পিত রহিল। বলিয়াছেন, এখন আত্মচিন্তা ভুলিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করুক, জীবনে উদ্দেশ্য-বোধ হউক। বলিয়াছেন—"মানুষের জীবন উদ্দেশ্যহীন হইতে পারে না, কর্ম্মময় জগতে কর্ম্ম ফুরায় না, সহজ চক্ষে নিজের জন্য কর্ম্ম নাই যেখানে, সেখানে ভাল করিয়া দেখিলে দেখা যায়, যে কর্ম্ম হারাইয়া নিজেকে সে কর্ম্মহীন ভাবিয়াছিল, তদপেক্ষা সহস্রগুণ উচ্চতর কর্ম্ম তার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে।" বলিতে বলিতে

কল্পনার দ্বার খুলিয়া ভবিষ্যৎ কর্ম্মক্ষেত্রের যে শান্ত সুপবিত্র অথচ উত্তমপূর্ণ চিত্র বক্তার মানসপটে ফুটিয়া উঠিল তাহাতে তার কণ্ঠকে উৎসাহ-কম্পিত ও নেত্রে এক অপূর্ব্ব দীপ্তি প্রদান করিল।

নীরদ আবার বলিতে লাগিল—"যোগেন! বন্ধু বলতে এখন আমার একমাত্র তুমিই, তুমি আমায় এ পথে চল্‌তে সাহায্য ক'রো, প্রথমে যদি ঠিক মনের মত নাও বোধ হয়, আমার প্রতি ভালবাসায় তা'ও সহ্য ক'রো, সিংহদ্বারের লৌহ কবাট দেখে পিছন ফিরো না।"

যোগেন্দ্র এই নূতন ভাবোন্মাদনার কোন তাৎপর্য্য না বুঝিয়া বিস্ময়ের সহিত কে জানে কেমন যেন একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব পুলকে মাথা হেলাইয়া স্বীকার করিয়া লইল। কিছুক্ষণ কেহ কোন কথা কহিয়া হৃদয়ের অব্যক্ত ভাবটিকে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিল না। যোগেন্দ্রও বুঝিয়াছিল এমন কতকগুলি জিনিষ আছে, যাহাকে ভাষা দিতে গেলে তাদের অবমাননা হয়।

তা'র পর সেই স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া নীরদকুমারই প্রথমে কথা কহিল, প্রফুল্ল মুখে সাগ্রহে দেশের কথা জিজ্ঞাসা করিল।

কথাপ্রসঙ্গে শান্তির বিবাহের কথা আসিয়া পড়িল—যোগেন্দ্র বলিল, —"শান্তির স্বামী খুব সুন্দর হয়েছে, আর বিয়েতে যতদূর সমারোহ হ'তে পারে তা' হয়েছিল, দুনিয়ার যত বাজে খরচ! বাজি, বাজনা, আলো টাকাগুলো একমুহূর্ত্তে ভস্মসাৎ! এত সংস্কার ক'রচো সব ঐ বস্তুটার সংস্কার ক'রতে পারো না।"

বলিয়া যোগেন্দ্র শুষ্ক নীরদের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল। নীরদ হাসিল না, সে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। যোগেন উৎসাহের সহিত বলিয়া যাইতে লাগিল—"যা' হোক, হেম ছেলে মন্দ নয়, চালটা একটু দেমাকে—তা' শান্তি নেহাৎ অসুখী হ'বে না। বিশেষ শ্বশুরের যা'

ভালবাসা সে পেয়েছে। আহা, শ্যামাকান্ত বেচারী বড় কষ্ট পেয়ে এতদিনে একটু সুখী হ'ল তবু—লক্ষ্মীছাড়া বিনোদটা কি আহাম্মুকিই করলে, কা'র আর ক্ষতি হ'ল?—নিজেই এমন রাজঐশ্বর্য্যে বঞ্চিত হ'লেন মাত্র! বাপ পর্য্যন্ত তা'র নাম আর মুখে আনে না—'অন্যে পরে কা কথা!' তা' নীরদ এ সব দেখে অদৃষ্ট মানতেই হয়, হেমের কপালটা কিন্তু খুব।"

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দে যোগেন্দ্র চাহিয়া দেখিল নীরদ-কুমার দুই করতলের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া একটা দারুণ যন্ত্রণাকে যেন সবলে হৃদয়ের মধ্যে চাপিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। যোগেন্দ্র সবিস্ময়ে তার পিঠে হাত দিয়া ডাকিল—"নীরদ!" মুখ তুলিতে তার শিথিল মাথাটা নিজের কাঁধের উপর সযত্নে রাখিয়া ছোট ভাইটির মত দুই হাতে তাকে কাছে টানিয়া অনুযোগের সুরে কহিল—"শরীরটাকে একেবারেই মাটী করে ফেলেছ ভাই!"

নীরদ ক্লান্তভাবে চোখ মুদিয়া আবার একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আত্ম-বিস্মৃতভাবে বলিল—"আঃ—যোগেন!"

"বল, নীরদ! তোমার মনের মধ্যে একটা কি রয়েছে! আমায় কেন লুকুচ্চ ভাই?"

নীরদকুমার হঠাৎ সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া অস্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল—"নিশ্চয়ই একটা কিছু রয়েছে বইকি, কিন্তু সেটা আপাততঃ অপ্রকাশ্য। তোমাকেও এবার থেকে কিন্তু একটু সংযম অভ্যাস করতে হবে।"

"ওঃ রে বাপ্‌ রে—তবেই আমি গেছি!—আচ্ছা, আগে চা' খেয়ে নিয়ে মাথাটা একটু সাফ করি, তা'র পর, তোমার বক্তৃতা শোনা যা'বে।"

নীরদ মৃদু হাসিল—"সে পাঠ উঠিয়ে দিয়েছি।"

শুনিয়া যোগেন্দ্র চোখ এমনি বিস্তার করিয়া চাহিল যে, যেন এমন অদ্ভুত কথা জীবনে সে এই প্রথম শুনিল!

"বল কিহে? তুমি যে আমায় একেবারে অবাক করে দিলে! চা খেলে কি সাধুত্ব জমে না?"

"তা নয় অভ্যাসটা বিদেশী।"

যোগেন্দ্র এবার ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিল না, চটিয়া বলিল—"দেখ, অত বাড়াবাড়ি করলে লোকে ভণ্ড বল্‌বে।"

৫০

সেদিন যখন নিবিড় হইয়া মেঘ জমিয়া মুষলধারে বৃষ্টি নামিল, তখন শান্তি তার শয়ন-গৃহে দক্ষিণধারের জানালার নিকট দাঁড়াইয়াছিল। বৃষ্টির সহিত ঝড়ের বাতাস থাকায় গাছগুলার উচ্চ মস্তক বাতাসে নুইয়া পড়িতেছিল এবং প্রথমে বিন্দু বিন্দু তা'র পর জলের ঝাট জানালার মধ্য দিয়া শান্তির গায়ে আসিয়া পড়িতে লাগিল।

দিন কয়টা বড়ই ক্লান্তিতে কাটিয়াছে। সেদিনকার সেই কর্ণদাহকারী নিষ্ঠুর মন্তব্যের পর তার আহত হৃদয়ে আঘাতের পর আঘাত হানিয়া সিদ্ধেশ্বরী এবং তাঁর মন রাখিবার খাতিরে বাড়ীর প্রবীণা অ-প্রবীণার দল তাহাকে শ্লেষ বিদ্বেষবাণে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছিল।

সেদিন সিদ্ধেশ্বরী কহিলেন—"ছোট বৌ, তুমি চাবিগুলো আমাকেই দাও, তুমি ছেলেমানুষ, ওসব ঠিক পেরে ওঠো না।"

মাসীমা তৎক্ষণাৎ যোগ দিলেন—"হ্যাঁ বাছা, তা'ই দাও—ঘর-কন্নার যা শ্রী করে রেখেছ।"

সিদ্ধেশ্বরী কহিলেন—"বল্লেই ত হয় পারবো না, এমন করে আক্রোশ দেখাও কেন? তোমার কি! অপচো হ'লে ত তোমার যা'বে না, পরের জিনিষ বইত নয়। আমার কিছু দরকার নেই, তবে নেহাৎ মেয়েটা বড্ড বোকা, তা'ই বলি মরুকগে, যতক্ষণ আছি, মরতে মরতেও দেখি।"

এ ঘর পরের ঘর? এ সংসারে সে শুধু গলগ্রহ? এই অল্প সময়ের মধ্যে সে কোথা হইতে কোথায় নামিয়া আসিল? কয়টা দিনমাত্র পূর্ব্বেই না সে লক্ষ্মীর প্রতিমূর্ত্তি ছিল, সবারই মা ছিল, আর আজ এ কি অধঃপতন তার! ঈশ্বর জানেন, শুধু তিনিই জানেন, এ ঘর তার কত আপনার, কত যত্নের। এই ঘরে আসিয়া সে যে তার চিরস্নেহের পিতৃগৃহের অভাব বুঝিতেও পারে নাই! অঞ্চলপ্রান্ত হইতে চাবির রিংটা খুলিয়া সিদ্ধেশ্বরীর হাতে দিয়া একটু দ্রুতপদে সে নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেল, যাইবার সময় শুনিল, সিদ্ধেশ্বরী বলিতেছেন —"দেখলে ত বে'ন!" চৌধুরীমশায়ের যেমন কীর্ত্তি! কোথা থেকে একটা ন'চ্যাংড়া ছুঁড়ি এনে একেবারে মাথার উপর তুল্লেন, দু'দিন তর সইল না। এখন হিংসের আগুনে আমার ছিষ্টিধরকে বাঁচতে দিলে বাঁচি! রাগ দেখে আর বাঁচিনি, বলে—'কেউটে সাপের চক্কোর দেখে সকলে ডরায়—আর হেলে সাপের ফোঁস ফোঁসানি অঙ্গ জলে যায়'।" সদুঃখে নিশ্বাস ফেলিয়া পুনশ্চ যোগ করিলেন—"আমার পোড়া বরাতে যেমন সুখ নেই! নৈলে জামাইটার এমন মতিচ্ছন্নই বা ধরবে কেন? তা' বে'ইকে ব'লে বে'ন, এর একটা বিহিত করা চাই।"

শান্তি পশ্চাতের এই সকল শরক্ষেপ সহ্য করিয়া নিজের কক্ষে চলিয়া

গেল। সম্মানের উচ্চতর সিংহাসন হইতে নামাইয়া তাহাকে একেবারে অপমানের মধ্যখানে দাঁড় করান হইয়াছে। চারিদিক হইতে যেন সপ্তরথীতে তাকে সশস্ত্রে ঘেরিয়া ফেলিতে উদ্যত। কেন? সে কি করিয়াছে? সে ত শিবানীকে তার অধিকৃত আসন ছাড়িয়া দিতে অনিচ্ছুক নয় এবং যতখানি সম্ভব, তা দিয়াছেও।—তবে সবটা যদি শিবানী না নেয়, কেমন করিয়া সে তাকে বাধ্য করে? তবে কেন তার প্রতি সকলে মিলিয়া এমন অবিচার করিতেছে? এই সংসার! মুহূর্ত্তের মধ্যেই সংসার তার অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীকে নির্ম্মমভাবে পায় ঠেলিয়া একেবারে অলক্ষ্মীর আসনে বসাইয়া দিতে পারে? যে এতখানি জুড়িয়াছিল, বালুস্থ গহ্বরের ন্যায় তাহা মুহূর্ত্তে ভরিয়া গিয়াছে, দুই কম্পিত করে অশ্রুপ্লাবিত মুখ সে ঢাকা দিল।

শ্যামাকান্তও আজকাল আহতচিত্তে তাঁর বসিবার ঘরের একটি কোণে ইজি চেয়ারটার উপর এমনি ক্লান্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়া থাকেন যে তিনিও তার সংবাদ লইতে পারেন না। শান্তি নিয়মিত সেবাপরায়ণ হস্তে নীরবে তাঁর কাজগুলি করিয়া দিয়া আসে, তিনি চিন্তা ম্লান মুখে গ্রহণ করিয়া যা'ন। দু'জনেই আপন আপন ভাবনায় মুহ্যমান, অন্যের কথা কাহারও মনে আসে না। এক একবার শ্যামাকান্ত শান্তিকে কাছে দেখিয়া যেন চমকিয়া উঠেন, ম্লান হাসি হাসিয়া বলেন—"তা'ই ত মা একটা মকদ্দমার কথা ভাবছিলুম!" শান্তি স্পষ্টই দেখিতে পায়, কথাটার অযথার্থতায় বৃদ্ধকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। তার দুই চোখে জল উথলিয়া উঠিতে চায়। সে কি সবার ভাবনার কারণ হইয়া দাঁড়াইল?

অমু দাদাবাবুর কাছে তাঁর চস্‌মার খোলখানা, পায়ের জুতাটা লইয়া কখনও বা তাঁর কাগজপত্র দোয়াতকলম ফেলিয়া ছড়াইয়া ঘরখানাকে

তোলপাড় করিয়া যেটুকু পারে দাদামহাশয়ের অশান্ত চিত্তে আনন্দ দান করে, সেও আর কাকীমার কাছে বেশী আসে না। সেদিন যে সিদ্ধেশ্বরী 'জ্ঞাতি শত্রুদের হাতে ছেলের খাওয়ানর ভার দিতে নেই' বলিয়া হাত হইতে দুধের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছিলেন, তা'র পর হইতে শিবানীর অনেক সাধ্য সাধনা সত্ত্বেও সে আর তাহাকে কাহারও অসাক্ষাতে কাছে রাখিতেই সাহস করে না। আজ তাকে চাহিয়া প্রাণ যখন হা-হা করিয়া উঠিতে ছিল, তখন অনেক চেষ্টায় সে লোভ সে সম্বরণ করিল।

বৃষ্টিপতনের একঘেয়ে শব্দ শুনিতে শুনিতে বাহিরের পানে চাহিয়া অন্য একটা জানালার ধারে হেমেন্দ্রও শান্তির মত দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে ভাল মানুষ শান্তির অপমানের অংশ গ্রহণ করিতে না হইলেও সকলের নিকট হইতেই—স্পষ্ট না হ'ক, অল্প বিস্তর তাচ্ছিল্য ভাব সেও বুঝিতে পারিতেছিল। হেমেন্দ্রের আচরণে কেহই তাহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না, এখন তাহারা সুযোগ ছাড়িবে কেন? হেমেন্দ্রও সে সমস্তের শোধ তার পালক পিতার উপর তুলিতে ছাড়ে নাই কিন্তু আজ আর শুধু দূরে দাঁড়াইয়া শরক্ষেপ চলিল না। সিদ্ধেশ্বরী ও তাঁর বৈবাহিকাদলের একটা কঠোর মন্তব্য তার উষ্ণ মস্তিষ্কের মধ্যে তীব্র দাহ জ্বালাইয়া তুলিলে, তৎক্ষণাৎ সে শ্যামাকান্তকে গিয়া বলিল—"ওই মাগী দুটোকে তাড়াবেন কি না?"

শ্যামাকান্ত শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন—"সে কি?"

"কোথাকার ছোটলোক মেয়েমানুষ দুটোকে বাড়ীতে এনেছেন, ওরা যদি থাকে, আমি থাকব না।"

"হেম! ওযে বিনুর বউ, আমার পুত্রবধূ! তোমরা দু'ভাই যদি একত্র হতে, সে কি আরও সুখের হ'ত না?"

হেমেন্দ্র চীৎকার করিয়া উঠিল—"ক্ষেপেছেন! ও বৃন্দাবনের গুণ্ডা

দলের মাগী, জাল! ওকে আত্মীয় বলে স্বীকার করলেও নিজেকে অপমান করা হয়। আপনি ওদের বিদায় কর্ব্বেন কি না?"

শ্যামাকান্ত যন্ত্রণাব্যঞ্জক ধ্বনি করিয়া উঠিলেন—"তারা!"

হেমেন্দ্র সক্রোধে পুনঃ প্রশ্ন করিল—"বিদায় কর্ব্বেন কি না?"

"অসঙ্গত কথা বলো না, হেম!"

"বিদায় কর্ব্বেন কি না?"

"কেমন করে করবো?"

"তবে ওদের নিয়েই থাকুন!—কিন্তু আমার আপনি যে সর্ব্বনাশ করেছেন তা' আমি সইব না, দেখি আইন আমায় ঠকায় কি না।"

মর্ম্মাহত শ্যামাকান্ত কাতর কণ্ঠে বাধা দিলেন—"অমন কথা বলিস নি হেম! তোকে আমি ঠকাবো?—আমার কে' আছে?"

কঠোর বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ হাসি হেমেন্দ্রের মুখে ফুটিয়া উঠিল। কহিল—"আমি সবই বুঝি।"

শান্তির ঘরে আসিয়া সে দেখিল, শান্তি একা আছে। শান্তি হঠাৎ স্বামীকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া উঠিয়া আসিল। জোর করিয়া প্রফুল্লতা দেখাইয়া কিছু একটা বলিয়া ভুলাইয়া দিবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল—"গবর্মেণ্ট জ্যেঠামশায়কে নাকি রাজা উপাধি দিতে চেয়েছে?"

"হুঁ! কিন্তু রাজপুরীটা আপাততঃ ত্যাগ করে যেতে হচ্ছে যে!—হাঁ করে চেয়ে রইলে কি? আরও স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে হ'বে? তবে শোন, ওই পাপিষ্ঠা স্ত্রীলোকদের সঙ্গে এক বাড়ীর বাতাস আমার গায় আমি লাগতে দেব না, আজই এখান থেকে চলে যা'ব।"

শান্তি সজোরে জানালার একটা গরাদ চাপিয়া ধরিল, হেমেন্দ্র চলিয়া গেল।

তা'র পর অনেকক্ষণ পরে যখন হেমেন্দ্র শান্তির কাছে ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি স্থির করলে, শান্তি ?"—তখন আকস্মিক মৌনভঙ্গে শান্তি চমকিয়া উঠিল। ম্লান মুখ ফিরাইয়া সকরুণ নেত্রে স্বামীর পানে চাহিয়া বলিল—"আমায় এখান থেকে যেতে বলো না, আমি এ বাড়ী ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না।"

"বাপের বাড়ী ?"

এক মুহূর্ত্ত পরে সে হতাশভাবে ঘাড় নাড়িল—"বাবা তো যেতে বলেন নি। জ্যেঠামশাই—"

"আমায় রাগিও না—এই অপমান সহ্য করে এখানে দাসী বাঁদীর মত পড়ে থাকতে হ'বে ? লজ্জা করে না ?"

"জ্যেঠামশাই তো আমাদের ভালবাসেন, দিদি তো কিছু বলেন নি, তা'ও যদি হয়, আমাদের সহ্য করতে চেষ্টা করা উচিত—তাঁ'রা গুরুজন—"

হেমেন্দ্র ভূমে পদাঘাত করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল—"রেখে দাও "তোমার ন্যায়ের তর্ক ! তুমি না যাও, থাকো, আমি চল্লুম।—না, তোমাকেও যেতে হ'বে, আমার স্ত্রী, আমার হুকুম, তোমার এখানে থাকা হ'বে না।"

"আজ ? এখনি ? একটু সময় আমায় দাও—জ্যেঠামশাইকে একবার—"

"জ্যেঠামশাই তোমায় রক্ষা করতে পারবেন না—মিথ্যা কেলেঙ্কারী বাড়বে, এ বাড়ীর সঙ্গে আমাদের দেনা-পাওনা মিটে গেছে—না,—কোন কথা শুনতে চাইনে—"

শান্তিকে কথা কহিবার অবকাশ না দিয়া সে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। সন্ধ্যা না হইলেও সন্ধ্যার অন্ধকার—ঘেরা বারান্দায়

ঘনায়মান হইয়া আসিতেছে, খোলা জানালার বাহিরে ছাদের নল দিয়া মোটা স্ফটিকধারার মত বৃষ্টির জল হুহুশব্দে নামিতেছিল। বাঁধা নর্দ্দমার ভিতর কলকল শব্দে সেই জল ছুটিয়া চলিয়াছে, বৃষ্টির যেন আজ শেষ নাই! হেমেন্দ্র সম্মুখে এক অপরিচিতা নারীমূর্ত্তি দেখিয়া পাশ কাটাইতে উদ্যত হইলে সম্মুখবর্ত্তিনী অসঙ্কুচিতভাবে নিকটে আসিয়া ধীরস্বরে কহিল—"ঠাকুরপো! একটু দাঁড়াও ভাই—কথা আছে।" অপরিচিতা নারীর এই সঙ্কোচহীন ব্যবহার হেমেন্দ্রকে বিস্মিত করিল। এই রমণীর বিদ্যুৎতীক্ষ্ণ অভেদ্য অচঞ্চল দৃষ্টি তার নিকট সম্পূর্ণ নূতন ঠেকিল। যদিও অনুমানে সে 'ঠাকুরপো' সম্বোধনকারিণীকে চিনিয়াছিল, তথাপি কৌতূহলপূর্ণ বিস্ময়ে মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল —"কে?"

রমণী কৃষ্ণতারকোজ্জ্বল বিশাল নেত্র প্রশ্নকারীর মুখে স্থাপন করিয়া ধীরে অথচ দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল—"অমুর মা—তোমার বৌদি। শুন্‌লেম তুমি আমার সঙ্গে এক বাড়ীতে থাকতে চাওনা—তাই যদি হয়, কথা দিচ্চি, তুমি যেও না, আমিই আমার সেই বনবাসে ফিরে যাব।"

হেমেন্দ্রের ললাট হইতে কর্ণমূল অবধি অপরাহ্নের পশ্চিমাকাশের মত আরক্ত হইয়া উঠিল, তীক্ষ্ণ শ্লেষপূর্ণ বিদ্রূপের তীব্র হাসি হাসিয়া বলিয়া উঠিল—"আপনার এ অভিনয় চমৎকার হচ্চে, কিন্তু আমার কাছে এসব কেন? নির্ব্বোধ শান্তিকে মুগ্ধ করেছেন, সেই ভাল।

হেমেন্দ্র চাহিয়া দেখিল না, সেই মুহূর্ত্তে ঘন মেঘের মধ্য দিয়া যেমন অশনিভরা বিদ্যুৎ করালীর লোলজিহ্বার ন্যায় লেলিহান হইয়া উঠিয়াছিল, শিবানীর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মুখেও তাহারই ছায়াপাত হইল। সে আজ অনেক ভাবিয়া আপনাকে অনেকখানি গড়িয়া লইয়া হেমেন্দ্রের সম্মুখীন হইয়াছিল। সহসা একজন অজানা লোকের সাক্ষাতে আসিয়া দাঁড়ান

শিবানীর পক্ষে একান্তই কঠিন কিন্তু প্রয়োজনে নিজের দুর্ব্বলতাকে ঠেকাইয়া রাখাও তার পক্ষে তেমনি সহজ। সে দেখিল, এমন করিয়া দূরে দাঁড়াইয়া থাকিলে আর চলে না, যে অভিনয় চলিতেছে, এর মধ্যে আসিয়া নিজের অংশ গ্রহণ না করিলে হয়ত ইহা বিয়োগান্ত হইয়া দাঁড়াইবে। নিঃসঙ্কোচে কর্ত্তব্যভার মাথায় তুলিয়া লইয়াছে। সে কেন পরের সুখে ব্যাঘাত দিবে? সে একজন অপমানিতা, অনাদৃতা, পরিত্যক্তা স্ত্রী!—কেন সে পরের অধিকৃত সিংহাসন জোর করিয়া দখল করিবে? কেন লোকে মনে করিতেছে, ইহা তার আকাঙ্ক্ষিত? কিসের এ অধিকার? কে চায়—এ অধিকার? সে? ইহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা কার। কেন করে? এই ঐশ্বর্য্যের জ্বালা তার অপমানিত হৃদয়কে নিপীড়িত করিতেছে সে কথা কে বুঝিবে? সে দরিদ্রা তা'ই না এত অবহেলা! সে কেন তাঁর যোগ্য হয় নাই? অথবা কেন তিনি দরিদ্র হইলেন না? যে সমস্ত বন্ধন দুই ভিন্নগামী হৃদয়কে এক হইতে দেয় নাই, তাদের প্রতি একটা তীব্র বিদ্বেষ তার চিত্তকে অহর্নিশি খরধার ক্ষুরের মত কাটিয়া তুলিতেছিল, এদের মধ্য হইতে সেই শান্তি-কুটিরে পলায়ন করিতে পারিলে সে তো বাঁচে—কিন্তু হায়! এ আবার কি নূতন মায়া—এ'কি নব বন্ধন! শান্তিকে ছাড়িতেও যে মন চায় না।

হেমেন্দ্রের কথায় শিবানী রাগ করিল না। কোন্ কথা সত্য এবং কিই বা রচনা, এ সংবাদ সে পায় নাই। এক মুহূর্ত্ত থামিয়া সহিষ্ণুতার সহিত অপমানকে স্নেহোপহারের মত নীরবে গ্রহণ করিয়া প্রসন্নমুখে কহিল—"তুমি রাগ করো না, ঠাকুরপো! তোমায় হয়ত আমি বুঝিয়ে বল্‌তে পার্ব্বো না, কিন্তু যেটা আসল কথা, সেইটেই বলছি—বাস্তবিকই 'আমি তোমার অংশীদার হ'তে পারি নে'। অমূ! তা' আগে সে মানুষই

হোক্, বেঁচেই থাক্। তা'র কথা ছেড়েই দাও!—যথার্থই আমি বলছি এখানকার একটি তৃণেও আমার লোভ নেই, এ সব শান্তির। তোমরা কিসের দুঃখে যেতে চাও? আমার জন্তে?—বলিয়া তীব্র বিষাদের উথলিত অশ্রু জোর করিয়া বক্ষে মথিত করিয়া গভীর দুঃখের হাসি হাসিল—"আমার জন্তে যা'বে কেন? বরং আমারই কিছু ব্যবস্থা করে দাও, তোমাদের সংসারের একপাশে যদি ফেলে রাখো, শান্তির জন্তে আমি থাকবো, জানিনা—কেন তা'কে এত ভালবাসি?" আবেগের মুখে আত্মদমন করিতে না পারিয়া সহসা শিবানী নিজের দুর্ব্বলতায় নিজেই লজ্জানুভব করিল, কিন্তু প্রকাশের যে একটি বিমল আনন্দ তাও সে সেই ক্ষণে অনুভব করিতে পারিয়াছিল। তার মনটা যেন কুহেলীর আবরণ মুক্ত নির্ম্মল আকাশের মত লঘু হইয়া গেল। নিজেকে জয়ী বোধ করিয়া সে ঈষৎ গর্ব্বোৎফুল্ল মুখ ফিরাইয়া পরাজিতের পানে চাহিল। বিশ্বরহস্তের একটি দ্বার আজ যে উদ্ঘাটিত হইল, এর মধ্য হইতে কি আলো কি আনন্দ ছড়াইয়া পড়িবে! এ লুকান নির্ঝর কোন্ তপ্ত মরুবালুকাকে শীতল করিয়া দিবে! কিন্তু শিবানীর অনবনত হৃদয় আজ তার কৃত-কর্ম্মের অভিশাপদণ্ড ভোগ করিবার জন্যই বড় অ-স্থানে নতি স্বীকার করিয়াছিল, হেমেন্দ্র ক্রুর নিষ্ঠুর শ্লেষের সহিত তাহাকে আক্রমণ করিল।

"শান্তির প্রতি আপনার অশেষ দয়া—কিন্তু সে দয়া সে ঘৃণা করে। তা'র জন্তে নিজেকে উৎকন্ঠিত করবেন না, আপনাদের দয়ার মধ্য থেকে এখনি সে সরে যাচ্চে—

পিছন হইতে কেহ লগুড়াঘাত করিলে, আহত যেমন আর্ত্ত কাতরতায় অস্ফুট গর্জ্জনে আঘাতকারীর পানে ফিরিয়া দাঁড়ায়, তেমনি করিয়া আহতা শিবানী হেমেন্দ্রের প্রতি ফিরিয়া বলিল—"মিথ্যাবাদি! তা'র অপমান করো না।"

হেমেন্দ্রের মুখখানাও ক্রোধে পাংশু হইয়া গেল, তার দীপ্তনেত্র দিয়া এক ঝলক অগ্নিবর্ষণ হইল, উচ্চকণ্ঠে তীব্র হাসি হাসিয়া সে কহিল— "ঘরে এমন চমৎকার অভিনেত্রী থাকতে থিয়েটার পার্টি আনিয়েছিলুম কেন? এমন সুন্দর অভিনয় আমি কখনও দেখিনি! ক'দিন ত 'কপালকুণ্ডলা' 'তাজ্জব-ব্যাপারের' অভিনয় দেখা গেল, আজ এটা কোন্ নাটকের অভিনয় হচ্চে, বৌঠাকৃরুণ?"

শিবানীর সমস্ত শরীরের রক্ত এ অপমানে রুদ্ধমুখ পাত্রমধ্যস্থ ফুটন্ত জলের মত রুদ্ধ রোষে টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। সে আর একটি কথা না বলিয়া দ্রুতপদে একটা খোলা দ্বারের দিকে ছুটিয়া গেল।

হেমেন্দ্রও দাঁড়াইল না। শিবানীকে যে দুই-চারিটা কড়া কথা শুনাইতে সুযোগ পাইয়াছে, ইহা ভাবিয়া মনটা তার কিছু ঠাণ্ডা হইয়াছিল। যার কথা মনে করিলেও অস্থিমাংস জলিয়া উঠে, তিনিই কিনা পাদরীসাহেবের মত বক্তৃতা দিতে আসিলেন, রাগ ধরিলেও— হাসিও পায়! দেশে কি লোক ছিল না?

শিবানীর পাণ্ডু মুখ ও আহত হৃদয়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ উদ্ধত রোষ-কটাক্ষ স্মরণ করিয়া সে মনে মনে ঈষৎ শান্তি অনুভব করিল। যথার্থই সে তবে শান্তিকে ভালবাসে? নহিলে শান্তি তাকে ঘৃণা করে শুনিয়া সে এমন শেলাহতের মত ছটফট করিয়া উঠিত না। হেমেন্দ্র নিজের প্রতি অত্যন্ত খুসী হইল। সে যে বুদ্ধি করিয়া ঠিক পথটি বাহির করিতে পারিয়াছে এবং এমন সব কথাগুলো যথাসময়ে আসিয়া তার ওষ্ঠাগ্রে যোগাইয়াছে তাহাতে নিজের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয়ে বিস্মিত হইল। যখন সত্যই শান্তিকে ছিনাইয়া লইয়া যাইবে, তখন এদের আঘাত কল্পনা করিয়া সে নিষ্ঠুর হাসি হাসিল।

শ্যামাকান্ত চৌধুরী দেখুন, তিনিই শুধু গরীবের ছেলের সর্ব্বনাশ করিতে পারেন না—সেও তাঁকে শাস্তি দিতে জানে! সে এটুকু জানে, ছুঁচটি কোন জায়গায় বিঁধাইলে মর্ম্ম ভেদ করে! যে শাস্তির জন্য তিনি তাকে পোষ্যপুত্র লইয়া দুরাকাঙ্ক্ষী করিয়া তুলিয়াছেন, সেই শান্তিকেই সে কাড়িয়া লইয়া বুঝাইবে, শান্তিকে পাইতে হইলে তাকে বশ করিলেই চলে না, তাহাকেও খুসী রাখিবার প্রয়োজন থাকে। সে এতটা অবজ্ঞেয় নয় যে, তাকে ডিঙ্গাইয়া চলিতে পারা যায়। আইনমতে সে শান্তির প্রভু, সে তাকে তাঁর হইতে দিবে না, কে' বাধা দিবে?

শিবানী যখন অনুজ্জ্বল ছায়ালোকে বিচ্ছুরিত বিদ্যুৎশিখার ন্যায় ঘরের মধ্যে দ্রুত প্রবেশ করিল, তখন ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘ নানা আকারে ছুটাছুটি করিয়া আবার একটা ভারি বৃষ্টি আনিবার উপক্রম করিতেছিল। সেই উপলক্ষে আকাশের প্রহরীরা তুরি বাজাইয়া আলো জ্বালাইয়া সোরগোল করিতেছে এবং অদূরবর্ত্তি পুষ্করিণীর ঘাটে ও উদ্যানের নালায় ভেকদলের সম্মিলিত ঐক্যতানে বৃষ্টির স্বর ডুবিয়া যাইতেছে। প্রথম শিবানী সে ঘরে কাহাকেও দেখিতে পাইল না, কিন্তু অল্প পরে দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দে চমকিত হইয়া খাটের নিকট আসিতে, দেখিল বিছানার প্রান্তে অন্ধকারে মিশিয়া শান্তি উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। পিঠের উপর ছড়ানো চুলের রাশি তাকে তার গভীর দুঃখের মধ্যে লজ্জাবরণের মতই আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল।

শিবানী পার্শ্বে বসিয়া চুলগুলা সরাইয়া দিতে দিতে ডাকিল—"শান্তি!"

শান্তি সচমকে মুখ তুলিয়া আবার বিছানার মধ্যে মুখ গুঁজিল।

শিবানী বলিল—"শান্তি! তুই আমায় ছেড়ে যা'বি?"

সে যে এ পৃথিবীতে একখানি হৃদয়কেও নিজের কাছে টানিতে পারিল না, এইটাই আজ সব চেয়ে তাকে আঘাত করিয়াছে। যে দুইজনকে সে আপনার করিতে চাহিয়াছিল, তারাই কি তার সব চেয়ে পর হইল?

শান্তি তড়িৎ স্পৃষ্টের মত উঠিয়া বসিল, প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"দিদি, আমার কথা তোমরা ভুলে যেও, আমার"—এবার সে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

শিবানী কহিল—"কেন যা'বি বোন? এ সংসারের তুই লক্ষ্মী, তুই কা'র হাতে তোর সংসার ফেলে চলে যেতে চাস্? যাস্‌নি শান্তি! মার কথা ধরিস্‌নি।"

হা ভগবান—তার ভাগ্যে এ অপবাদও বাকি রহিল না! সে নিজের ইচ্ছায় অকৃতজ্ঞার মত তাদের ছাড়িয়া যাইতেছে!

শিবানী তার অন্তরস্থ সেই রুদ্ধ বেদনার অব্যক্ত কাতরোক্তি শুনিল না, মুহূর্ত্তে তার প্রাণের মধ্যটা বজ্রাহত তালবৃক্ষের মত নিঃশব্দে পুড়িয়া উঠিল। একবারের জন্য দুর্জ্জয় অভিমান ও প্রবল আত্মধিক্কারে পূর্ণ হইয়া উঠিয়া সে বিছানা ছাড়িতে গেল, কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই নিজের ব্যবহারে নিজে লজ্জিত হইয়া করুণ নেত্রে চাহিয়া সম্মুখবর্ত্তী বিবর্ণ মুখখানা সাগ্রহে বক্ষে টানিয়া লইল—"ঠাকুরপো যা'ই বলুন, আমি বিশ্বাস করব না। বল্ শান্তি! তুই আমার উপর রাগ করে যাচ্ছিস্ না?"

শান্তি শিবানীর আলিঙ্গনপাশ ছিন্ন করিয়া সর্পাহতের মত শিহরিয়া মুখ তুলিল। একবার কোমল সজল নেত্রে তীব্র ভৎর্সনার বিদ্যুৎ হানিয়া তাকাইল, তা'রপর আবার বিছানায় মুখ লুকাইল।

সেই মৌন দৃষ্টির নীরব আঘাতে যতখানি লজ্জা ছিল—সান্ত্বনা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি, মনে মনে সেই শান্তিটুকু উপভোগ করিয়া লইবার লোভ দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিলেও শিবানী সেই অনাস্বাদিত সুধাপাত্র ওষ্ঠাগ্র হইতে নামাইয়া লইল। একটি সুকুমার সরল হৃদয় যে তার নিকট অকপটে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, এ আনন্দ তার কাছে তুচ্ছ নয়! শিবানী ধীর স্বরে কহিল—"শান্তি! আরতির সময় হলো, মন্দিরে যা'বি না? বাবা বোধ হয় এতক্ষণ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন!"

শান্তি উঠিয়া বসিল। তার সূক্ষ্ম ওষ্ঠপ্রান্তে এক ফোঁটা বিষাদের হাসি অত্যন্ত ক্ষীণভাবে ফুটিয়া উঠিল, বলিল—"দিদি, রাজরাজেশ্বরী আমার হাতের পূজো নিতে চান না—আমায় যদি সত্যি যেতে হয়, তুমি আমার মত করে মালা গেঁথে দিও, ফুল দিয়ে মন্দির সাজিও, তেমনি নৈবেদ্য করে, ধূপদীপ জ্বেলে দিও। দেখো দিদি! দেবতার সেবার যেন ব্যাঘাত না হয়—"

শিবানীর কঠিন নেত্রে জল আর চাপা রহিল না, সে কাঁদিয়া বলিল—"সত্যি যা'বি? ঠাকুরপো জোর করে নিয়ে যা'বে? তুই শুনবি কেন?"

"আমি কি করব, দিদি? আমি তো যেতে চাই না, কিন্তু যদি যেতেই হয়, তবে তুমি আমার হয়ে জ্যেঠামশায়ের সেবা—"বলিতে বলিতে সহসা তার কম্পিত কণ্ঠস্বর অস্ফুট হইয়া গেল, জ্যেঠামহাশয়কে সে যে মাতৃহীন করিয়া যাইতেছে, এ অকৃতজ্ঞতা তাঁর প্রাণে যে কত বড় হইয়া বাজিবে, ইহা ভাবিয়া তার ব্যাকুল চিত্ত উর্দ্ধস্বরে হাহাকার করিয়া উঠিল, অথচ সে জানে যাওয়া ভিন্ন উপায় নাই। বাধা দিলে ঈর্ষা ও প্রতিহিংসাকে লোকচক্ষে বীভৎস মূর্ত্তিতে প্রস্ফুটিত করিয়া লজ্জা, ক্ষোভ ও মর্ম্মান্তিক ঘৃণার বিকট অভিনয় দেখান ছাড়া কোন ফলই হইবে না।

"শান্তি! এসো—গাড়ি এসেছে"—বলিয়া হেমেন্দ্র ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।—"বৃষ্টিটা একটু কম আছে, খিড়কী দোর দিয়ে বেরিয়ে পড়ো।"

ঘরে সন্ধ্যা ও মেঘ উভয় অন্ধকারের কালিমা ক্রমে নিবিড় হইয়া আসিতেছিল। কে' জানে, কি ভাবিয়া দাসী এখনও আলো জ্বালাইয়া যায় নাই। অস্ফুটালোকে হেমেন্দ্র শিবানীকে দেখিতে পায় নাই, কিন্তু শিবানী এ কথা শুনিয়া ব্যাধ হস্ত হইতে নিজ সন্তানকে রক্ষার চেষ্টায় পক্ষিমাতা যেমন করিয়া তাকে কম্পিত পক্ষপুটে ঢাকিয়া রাখিতে চায়, তেমনি ভাবে শান্তির হাত দুইখানা দুই হাতে শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিল, আর্ত্তকণ্ঠে কহিল—"আমি ওকে যেতে দোব না—ওই গাড়ি করে চুপি চুপি আমায় বিদায় করে দাও, আমি তোমাদের সব অমঙ্গল মুছে নিয়ে যা'ই।"

রুষ্টস্বরে হেমেন্দ্রও তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল—"শান্তি! আমি আদেশ করচি, তুমি ওকে স্পর্শ করো না—শীগ্‌গির এসো।"

শান্তির চারিদিকে ঝড়ে ওড়া কালো কাপড়ের মত অন্ধকারের ছায়াখানা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল, সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া বলিল—"একবার জ্যেঠামশায়ের কাছে আমায় যেতে দাও, তোমার পায়ে পড়ি—একবার যেতে দাও।"

হেমেন্দ্র অবিচলিতভাবে কহিল—"এ জন্মে নয়! অবাধ্য স্ত্রীকে বাধ্য করবার অধিকার আমার আছে, সেটা প্রয়োগ করতে বাধ্য করো না। তোমার জ্যেঠামশায় তোমার চেয়ে হাজার গুণ আদরের জিনিষ পেয়েচেন, তিনি তোমার জন্যে ব্যস্ত ন'ন্।"

দেবমন্দিরে তখন সন্ধ্যারতির কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া বাজিয়া থামিয়া গিয়াছে। ঊর্দ্ধে সাটিনের উপর জরীর বুটীদার চাঁদোয়া, নীচে মর্ম্মর-প্রস্তরের বেদির উপর রৌপ্য সিংহাসনে রাজরাজেশ্বরীর মূর্ত্তি স্থাপিত। সুবর্ণালঙ্কারে সুশোভিতা দেবী মূর্ত্তির কণ্ঠে তখনও শান্তির গাঁথা বিনাসূতার মালা—চামরের বাতাসে দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে, সে মালা এখনও অম্লান, দেবীর তপ্তকাঞ্চনবর্ণ রক্তাম্বরে সুশোভিত, সে বস্ত্রের প্রত্যেক চুমকিখানি শান্তি নিজের হাতে অনেক যত্নে বসাইয়াছিল। সেই মর্ম্মর মূর্ত্তি দেবপ্রতিমাগণের সহিত প্রতিদিনকার মতই দীপ্তি পাইতেছেন। তবু আজ সমস্ত দেবালয় যেন বর্ষার বাতাসের সঙ্গে যোগ দিয়া হা হা করিয়া উঠিতেছে। যেন আজ সেখানে কেহই নাই! পুষ্পচন্দনের কোমল ঘনসৌরভে মন্দিরের বায়ুস্তর আমোদিত, বাতির আলো বহু-শাখাবিশিষ্ট বেলওয়ারি ঝাড়ের মধ্য হইতে, তাহাদের পিঙ্গল আভা বিচ্ছুরিত করিয়া নিম্নে চাহিয়া আছে। নিত্য-সেবার ভোজ্য—নৈবেদ্য প্রতিদিনকার মত সযত্ন-রচিত; কিন্তু বৃদ্ধ পুরোহিত তার মধ্য হইতে শত খুঁটিনাটিতে ত্রুটি ধরিতেছিলেন। ঠাকুরের পানের বাটা এ পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছে নাই। ধূনা জ্বালাইবার অগ্নি রাখা হয় নাই, রাজ-রাজেশ্বরীর পূজার উপকরণ শ্যামের সম্মুখে এবং শ্যামের ভোজ্য পেয় শ্যামের বামভাগে রাখা হইয়াছে। পুরোহিত ঠাকুর বিলম্বে প্রাপ্ত ধূনাচীর অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ডের মধ্যে চূর্ণিত ধূনা নিক্ষেপ করিয়া অপ্রসন্ন মুখে কহিলেন—"মা লক্ষ্মী তো বাড়ী এসেছেন, তবে আবার এ সব বে-বন্দোবস্ত হচ্ছে কেন?"

শ্যামাকান্ত যখন আলোক প্রদর্শিত পথে অল্প বৃষ্টিটুকু ছাতায় বাঁচাইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, তখন আরতি শেষ হইয়া আসিয়াছে। পঞ্চ-প্রদীপ শঙ্খ ও পুষ্প দ্বারা আরতি সমাপ্ত করিয়া আচার্য্য ভোজ্যোৎসর্গ সমাধা করিতেছেন। বৃষ্টির জন্য বা মানসিক অপ্রকৃতিস্থতাবশতঃ যে কারণেই হউক শ্যামাকান্ত আজ তাঁর চির নিয়মের ব্যত্যয় করিয়া ফেলিয়াছেন।

বৃদ্ধ জমিদার তাঁর বিগ্রহগুলিকে ভক্তিভরে প্রণিপাত করিয়া উঠিতেই মঙ্গল উৎসবের সর্ব্বাঙ্গীন অপূর্ণতা তাঁর চিত্ত আকৃষ্ট করিল। পুরোহিতের পশ্চাতে অল্প দূরে মর্ম্মর মেজের উপর প্রায় তেমনি শুভ্র কোমল করতল রক্ষা করিয়া অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী শান্তি তো আজি বসিয়া নাই ?

শ্যামাকান্তের মনটা সহসা বিকল হইয়া উঠিল—সে ত কখনই অনুপস্থিত থাকে না! দ্বারের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বৌমারা এসেছিলেন ?"

সে জানাইল, তাঁরা আসেন নাই।

"বাড়ীতে জিজ্ঞাসা করে আয়, বৌমা কেন আসেন নি।"

ভৃত্য চলিয়া গেল। শ্যামাকান্ত দ্বার ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। উদ্বেগ ও অনুতাপে মনটা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। সে কেন আসিল না! সেও কি আজ তাঁর স্নেহে সন্দিহান হইয়াছে ? কয়দিন যে তিনি হেমের নিষ্ঠুর আঘাতে অবসন্ন হইয়া পড়িয়া আছেন—শান্তির কথা ভাবিয়াই যে মর্ম্মাহত হইয়া আছেন, অথচ সেই শান্তিকেই এই নীরব ঔদাস্যের দ্বারা অনাদরের বেদনা দিয়াছেন কি ? না, না, বুঝি সে কয়দিনের পরিশ্রমে অসুস্থ আছে। বুঝি স্বামীর অবিবেচনার নিদারুণ আঘাত তার কোমল বুকখানি বিঁধিয়া ফেলিয়াছে। তাঁর মা কি তাঁকে চিনে না ?

শ্যামাকান্ত স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন—সজল প্রচুর ঘনায়ত বিশাল নেত্রে মেঘান্ধকার বিদীর্ণ করিয়া এ কি স্নিগ্ধ মধুর বিদ্যুৎ স্ফুরণ! কোথায় রাগ? কোথায় অভিমান? শান্তির মনে রাগ অভিমান কখনও কি দেখা গিয়াছে! সে কি রাগ করিতে জানে? কে জানে, মানুষের সঙ্কীর্ণ সভয়চিত্ত! সহসা মনে হইল যদি তার অসুখ করিয়া থাকে?

অল্প পরেই ভৃত্য বিস্ময়চকিতভাবে ফিরিয়া আসিয়া কহিল—"তারিণী বল্লে, এই একটু আগে ছোটবাবু ছোটমাকে নিয়ে গাড়ি করে কোথায় চলে গেছেন, আর বড়মা তাঁ'র ঘরে বসে কাঁদ্‌চেন।"

শুনিয়া শ্যামাকান্তের চোখের উপর হইতে অকস্মাৎ সমুদয় আলোক-দীপ্তি নিবিয়া গেল। তিনি নিশ্চলভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন বাহিরের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ পরে যখন প্রস্থানোদ্যত ভট্টাচার্য্য মহাশয় সাহস করিয়া মূর্চ্ছিতপ্রায় স্তব্ধ জমিদারের নিকটবর্ত্তী হইয়া সসঙ্কোচে তাঁর বাহু স্পর্শ করিলেন, তখন চমকিয়া উঠিয়া শ্যামাকান্ত বুঝিতে পারিলেন না, যে তিনি ঘুমাইয়া ঘোর দুঃস্বপ্নে অভিভূত হইয়াছেন, না জাগিয়া আছেন? পুরোহিতের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—"হরি! মা আমায় সত্যি ছেড়ে গেছেন?"

"মা?—এ কি বলছেন? মা জগদম্বা আপনার ভক্তি ডোরে বাঁধা, আপনার মত ভেদজ্ঞানহীন সাধক কি এ কলিকালে বেশী আছে? চেয়ে দেখুন, বরাভয়দায়িনী আপনার পানে চেয়ে অভয় হাস্য করছেন।"

শ্যামাকান্ত গভীর হতাশার সহিত এক মুহূর্ত্ত দেবীর প্রসন্নমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া রুদ্ধপ্রায়কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"মাগো! যদি অপ্রসন্ন হোস্‌নি তবে কেন আমার মাকে কেড়ে নিলি মা? আমার মাকে ফিরিয়ে দে' মা, ওমা! আমার শান্তিকে ফিরিয়ে দে'।"

হরিনারায়ণ সবিস্ময়ে শ্যামাকান্তের পানে চাহিলেন—"মা লক্ষ্মীর কি হয়েছে? তিনি তো সকালে ভালই ছিলেন?"

বৃদ্ধ জমিদার কাঁদিয়া ফেলিলেন—"হেম মাকে নিয়ে চলে গেছে—নিশ্চয়ই জোর করে নিয়ে গেছে—"

"সে কি? এই দুর্য্যোগে?" বিস্ময়ে পুরোহিতের নেত্র বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

এই কথায় ব্যাকুল বৃদ্ধ অস্থিরভাবে মন্দিরের রুদ্ধদ্বার খুলিয়া ফেলিয়া দ্রুতপদে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

জমাট কালো মেঘে থাকিয়া থাকিয়া তখনও বিদ্যুৎস্ফুরণ হইতেছিল, ঝুপ্ ঝাপ্ শব্দ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, পুকুরঘাটে ভেকদলের আনন্দ কলরবের শেষ ছিল না। এই দুর্য্যোগ রাত্রের তমসাচ্ছন্ন প্রকৃতির পানে চাহিয়া সহস্র বেদনায় বিদ্ধ তাঁর অশান্ত চিত্ত আজ আবার নূতনতর নৈরাশ্যে হাহাকার করিয়া উঠিল। এই ঘোরান্ধকারে সংহাররূপা করালীর প্রলয়বার্ত্তা ঘোষণার মাঝখানে তাঁর সাধনার লক্ষ্মী—কাহার নিষ্ঠুর অভিশাপে আজ অতল তলে নিমজ্জিত হইয়া গেল? একটা মর্ম্মান্তিক বেদনায় তাঁর শুষ্ক হৃদয় উচ্ছ্বসিত করিয়া আকুল ক্রন্দন বহন করিয়া আনিল। শোকদীর্ণ প্রকৃতির বুকের ক্রন্দন চুরি করিয়া ঝড়ের সঙ্গে মিশিয়া তাঁর বেদনা-রুদ্ধ আর্ত্ত ক্রন্দন, ব্যাকুল আবেগে সুদূর বিমানের স্তরে স্তরে উঠিয়া বলিতে লাগিল—"তুই কোথা গেলি মা? মাগো কোথা গেলি? আর কি আমি তোকে ফিরে পা'বো?"

শ্যামাকান্ত স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন—সজল প্রচুর ঘনায়ত বিশাল নেত্র মেঘান্ধকার বিদীর্ণ করিয়া এ কি স্নিগ্ধ মধুর বিদ্যুৎ স্ফুরণ! কোথায় রাগ? কোথায় অভিমান? শান্তির মনে রাগ অভিমান কখনও কি দেখা গিয়াছে! সে কি রাগ করিতে জানে? কে জানে, মানুষের সঙ্কীর্ণ সভয়চিত্ত! সহসা মনে হইল যদি তার অসুখ করিয়া থাকে?

অল্প পরেই ভৃত্য বিস্ময়চকিতভাবে ফিরিয়া আসিয়া কহিল—"তারিণী বল্লে, এই একটু আগে ছোটবাবু ছোটমাকে নিয়ে গাড়ি করে কোথায় চলে গেছেন, আর বড়মা তাঁ'র ঘরে বসে কাঁদ্‌চেন।"

শুনিয়া শ্যামাকান্তের চোখের উপর হইতে অকস্মাৎ সমুদয় আলোক-দীপ্তি নিবিয়া গেল। তিনি নিশ্চলভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন বাহিরের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ পরে যখন প্রস্থানোদ্যত ভট্টাচার্য্য মহাশয় সাহস করিয়া মূর্চ্ছিতপ্রায় স্তব্ধ জমিদারের নিকটবর্ত্তী হইয়া সসঙ্কোচে তাঁর বাহু স্পর্শ করিলেন, তখন চমকিয়া উঠিয়া শ্যামাকান্ত বুঝিতে পারিলেন না, যে তিনি ঘুমাইয়া ঘোর দুঃস্বপ্নে অভিভূত হইয়াছেন, না জাগিয়া আছেন? পুরোহিতের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—"হরি! মা আমায় সত্যি ছেড়ে গেছেন?"

"মা?—এ কি বলছেন? মা জগদম্বা আপনার ভক্তি ডোরে বাঁধা, আপনার মত ভেদজ্ঞানহীন সাধক কি এ কলিকালে বেশী আছে? চেয়ে দেখুন, বরাভয়দায়িনী আপনার পানে চেয়ে অভয় হাস্য করছেন।"

শ্যামাকান্ত গভীর হতাশার সহিত এক মুহূর্ত্ত দেবীর প্রসন্নমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া রুদ্ধপ্রায়কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"মাগো! যদি অপ্রসন্ন হোস্‌নি তবে কেন আমার মাকে কেড়ে নিলি মা? আমার মাকে ফিরিয়ে দে' মা, ওমা! আমার শান্তিকে ফিরিয়ে দে'।"

হরিনারায়ণ সবিস্ময়ে শ্যামাকান্তের পানে চাহিলেন—"মা লক্ষ্মীর কি হয়েছে ? তিনি তো সকালে ভালই ছিলেন ?"

বৃদ্ধ জমিদার কাঁদিয়া ফেলিলেন—"হেম মাকে নিয়ে চলে গেছে—নিশ্চয়ই জোর করে নিয়ে গেছে—"

"সে কি ? এই দুর্য্যোগে ?" বিস্ময়ে পুরোহিতের নেত্র বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

এই কথায় ব্যাকুল বৃদ্ধ অস্থিরভাবে মন্দিরের রুদ্ধদ্বার খুলিয়া ফেলিয়া দ্রুতপদে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

জমাট কালো মেঘে থাকিয়া থাকিয়া তখনও বিদ্যুৎস্ফুরণ হইতেছিল, ঝুপ্ ঝাপ্ শব্দ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, পুকুরঘাটে ভেকদলের আনন্দ কলরবের শেষ ছিল না। এই দুর্য্যোগ রাত্রের তমসাচ্ছন্ন প্রকৃতির পানে চাহিয়া সহস্র বেদনায় বিদ্ধ তাঁর অশান্ত চিত্ত আজ আবার নূতনতর নৈরাশ্যে হাহাকার করিয়া উঠিল। এই ঘোরান্ধকারে সংহাররূপা করালীর প্রলয়বার্ত্তা ঘোষণার মাঝখানে তাঁর সাধনার লক্ষ্মী—কাহার নিষ্ঠুর অভিশাপে আজ অতল তলে নিমজ্জিত হইয়া গেল ? একটা মর্ম্মান্তিক বেদনায় তাঁর শুষ্ক হৃদয় উচ্ছ্বসিত করিয়া আকুল ক্রন্দন বহন করিয়া আনিল। শোকদীর্ণ প্রকৃতির বুকের ক্রন্দন চুরি করিয়া ঝড়ের সঙ্গে মিশিয়া তাঁর বেদনা-রুদ্ধ আর্ত্ত ক্রন্দন, ব্যাকুল আবেগে সুদূর বিমানের স্তরে স্তরে উঠিয়া বলিতে লাগিল—"তুই কোথা গেলি মা ? মাগো কোথা গেলি ? আর কি আমি তোকে ফিরে পা'বো ?"

লর্ড কার্জ্জনের প্রবর্ত্তিত ব্যঙ্গব্যবচ্ছেদ ব্যাপার লইয়া বাঙ্গালায় সে সময় স্বদেশী আন্দোলন তুমুল হইয়া উঠিয়াছে। সুখসুপ্ত বঙ্গবাসী তখনও রাবণের আহ্বানে অকাল-জাগ্রত কুম্ভকর্ণের ন্যায় বিস্ময়-বিহ্বল, তখন পর্য্যন্ত তারা কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারে নাই। যুবকগণ বিশেষতঃ বালকের দল উদ্যমের সহিত উঠিয়া দাঁড়াইলেও বড় বড় প্রবীণ দলপতিরা তখনও পর্য্যন্ত চিন্তান্বিত মুখে বলিতেছেন—"এ কি টিঁকিবে?" মহৎ উদ্দেশ্য এপর্য্যন্ত কোন দেশে কখনও ব্যর্থ হয় নাই—আজও হইল না। 'স্বদেশী আন্দোলন' বৈশাখী আকাশে ক্ষণিক বজ্র বিদ্যুতের অগ্নিমুখী গর্জ্জনের পর স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাজালে মিলাইয়া না গিয়া একটা স্থায়ীবর্ষণের আগ্রহে বর্ষাকাশে নবীন মেঘরাশির মত বঙ্গ-গগনের উপর সুস্থির হইয়া রহিল। এই সময়ে যাঁরা স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্যপালনে সক্ষম হইয়াছিলেন, রজনীনাথ তাঁদের অন্যতম। রজনী-নাথের স্বদেশপ্রেম 'বয়কটের' হুজুকে জন্মলাভ করে নাই, তাহা তাঁর কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হৃদয়ে বহু পূর্ব্বেই উৎসারিত হইয়াছিল, ৺ভূদেবের গ্রন্থপাঠে, কিন্তু পূর্ব্বে যখনই তিনি এসম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গিয়াছেন—তাঁর সহকর্ম্মী বা বন্ধুদের মধ্যে কেহ হাসিয়া, কেহ চুপ করিয়া থাকিয়া, কেহ বা তর্কের ধারায় তার এই 'উদ্ভট ম্যানিয়া'টাকে উড়াইয়া দিতে কুণ্ঠিত হ'ন নাই। অধিকাংশ লোকেই বলিয়াছেন—এই 'ডিজেনারেট' দেশে আছে কি? কৌপীনবস্ত্র না হ'লে ত দেশী জিনিষ ব্যবহার করা চলে না। বড়জোর কেহ বলিয়াছেন—এ গরীব দেশে সস্তা বিলাতী ছেড়ে মহার্ঘ দেশী জিনিষ চালাতে যাওয়া কি মূর্খতা নয়? সহজে সব জিনিষ পাওয়াও যায় না।

একটু বেশি দাম দিয়া ব্যবহার না করিলে ব্যবসায়ের উন্নতি হইবে কেমন করিয়া এবং সমবেত চেষ্টা দ্বারাই সকল দ্রব্য সহজপ্রাপ্য হইবে—এই সহজ যুক্তিটার মূল্য ধরিতে কেহ প্রস্তুত নহে। দাম বেশী দিয়া মোটা দেশী জিনিষ ব্যবহার করিলে এবং বিলাস বর্জ্জনে যে অনেকখানি সস্তা পড়ে—এ যুক্তি এত হাস্যকর যে মুখ হইতে ইহা বাহির হইবার পূর্ব্বেই ময়ূরপুচ্ছ শোভিত দাঁড়কাকের দল—'টাইয়ের' উপর 'টাইক্লিপ' আঁটা কণ্ঠ সপ্তমে তুলিয়া কক্ষের প্রত্যেক খিলানটি কাঁপাইয়া এমন উপহাসের হাসি হাসিয়াছেন যে, মুখের কথা মুখেই রহিয়া গিয়াছে, কিন্তু আজ উচ্চ হাস্য কোন উচ্চ হৃদয়কে তীক্ষ্ণ আঘাতে বিদ্ধ করিতেছিল না।

রজনীনাথ কয়দিন নিশ্বাস ফেলিবার অবসর পান নাই। নিজের কাজকর্ম্ম সব ঠেলিয়া ফেলিয়া—নূতন উদ্যমে নূতন উৎসাহে সভার পর সভায় যোগদান ও মফঃস্বলে ঘুরিয়া স্বদেশী শিল্প গ্রহণে উৎসাহদান করিয়া বহুদিনের আক্ষেপ মিটাইতেছিলেন। মনে উৎসাহ ও শরীরে বলের অভাব ছিল না। একদিন কাজকর্ম্ম সারিয়া ভিতরে আসিলে বসুমতী তাঁর উৎসাহদীপ্ত অথচ স্নানাহারের অনিয়মে শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া অনুযোগের সুরে কহিলেন—"একি শ্রী করেছ? তোমার সকলি বাড়াবাড়ি?"

রজনীনাথ আয়নার সম্মুখে গিয়া হাসিয়া কহিলেন—"কেন শ্রী তো দিব্যি রয়েছে!"

বসুমতী হাসি চাপিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, দিব্যি আছে। তা, একেবারেই কি বাড়ীঘর সব ত্যাগ করবে নাকি?"

"দেশের কাজের জন্যে কি তা'ও করা উচিত নয়? যা'ক, তুমি হঠাৎ চটলে কেন বল ত?"

ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া বসুমতী বলিলেন—"চটবো কেন? তবে সময়ে নাওয়া খাওয়া করে কাজ ক'র না। শান্তিদের যে দু' এক দিনের মধ্যে লক্ষ্মীপুরে ফেরবার কথা ছিল—কিছু খবর পেলে?"

"তোমায় কিছু বলিনি বুঝি?" একটু অপ্রতিভভাবে রজনীনাথ কহিলেন—"তা'রা এসেছে, আজ বিকেলে আমি যা'ব মনে করেছি।"

সেদিন রজনীনাথ কন্যাকে দেখিতে গিয়া যে অস্বচ্ছন্দতা লইয়া ফিরিলেন, তাহা তাঁর নূতন ব্রতের শত উদ্দীপনাতেও ঢাকা পড়িল না।

শান্তির সুখসৌভাগ্যের যেদিকটায় টান ধরিয়াছে, সেই অংশটার জন্য রজনানাথ নিজেকেই প্রধান—প্রধান কেন সম্পূর্ণ অপরাধী মনে করিতেছিলেন। পোষ্যপুত্রের সহিত শান্তির বিবাহ দিতে শান্তির মা সম্মত ছিলেন না, নিজের সত্য রক্ষা করিতে এবং কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ দিতে গিয়া শান্তিকে যদি দুর্ভাগিনী করিয়া ফেলিয়া থাকেন? ভগবান্! এই কি পিতার কর্ত্তব্য? গোপন নিশ্বাসে দৃঢ় চিত্তের অনেকখানি বল বিসর্জ্জন দিয়া রজনীনাথ ভাবিলেন—"এর চেয়ে বসুমতীর নির্ব্বাচিত পাত্রের সহিত বিবাহ দিলে শান্তি সুখী হইত।" নিজের দুর্ভাগ্য বা দুর্ব্বলতার দায়—অদৃষ্ট বস্তুটার উপর চাপাইতে পারিলে নিজের মনে অনেকখানি সান্ত্বনা লাভ করিতে পারা যায়, এংব ইহাতে অনেকখানি আত্মগ্লানি ও অনুতাপকে খর্ব্ব করিয়া থাকে, কিন্তু রজনীনাথের পক্ষে সে আত্ম-সান্ত্বনার সম্ভাবনা অল্পই ছিল। নিজের অপরাধের বোঝা দৈব বেচারার উপর চাপাইয়া চিত্ত লঘু করিবার অভ্যাস তাঁর একবারও উদিত হইল না, তা'ই হৃদয়ের ভারও তাঁর একটুও কম ছিল না। বসুমতী তাঁর অপেক্ষা অধিকতর বেদনা পাইবেন বুঝিয়া তিনি হৃদয়ের সেই প্রচ্ছন্ন ব্যথা ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। নীলকণ্ঠের কণ্ঠগরলের মত তার তীব্র জ্বালা তাঁকেই গোপনে

জ্বালাইতেছিল। হেমেন্দ্রের দুর্বিনীত ব্যবহার রজনীনাথের মনে অত্যন্ত আঘাত করিয়াছে, বিশেষতঃ এবারে আর একটা তীব্র আঘাত তাঁর চিত্তকে নিষ্ঠুর ছুরিকাঘাতের মতই কাটিয়া তুলিয়াছে। শান্তি ও হেমেন্দ্রের মধ্যে যে ভালবাসার বন্ধন দৃঢ় নয় এবং হেমেন্দ্র যে শান্তিকে নিতান্ত অবহেলার চক্ষে দেখে তাদের সেদিনকার ব্যবহার হইতে রজনীনাথের বুঝিতে বাকি ছিল না; যেটুকু বা অবশিষ্ট ছিল, শ্যামাকান্তের কথায় পরিস্ফুট হইয়াছে।

শ্যামাকান্ত প্রথম দর্শনেই উইলের কথা পাড়িয়া বসিলেন। তাঁর ইচ্ছা, বিনোদের পুত্রের সহিত শান্তিকে তুল্যাংশে তিনি বিষয় ভাগ করিয়া দিবেন, হেমেন্দ্র নিজের হাত খরচের জন্য মাসিক কিছু কিছু টাকা পাইবে। শুনিয়া রজনীনাথ একটু উত্তেজিতভাবে মুখ তুলিয়া দ্রুতস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"আবার কি কৃষ্ণকান্তের উইলের অভিনয় করাতে চান চৌধুরীমশায়? মনে কর্ব্বেন না, আপনার হেম কোন অংশে গোবিন্দলালের চেয়ে ভাল!" তারপর একটু লজ্জিত হইয়া নম্রভাবে কহিলেন—"এখন আপনার উইল না করাই ভাল, নিতান্তই যদি না করলে আপনার মনের তৃপ্তি না হয়, তবে আমার পরামর্শ এই যে, বিনোদের ছেলের সঙ্গে জমীদারির ভাগ অন্য কারুকে না দেওয়াই উচিত। এ থেকে চিরকালের জন্যে একটা সরিকী বিবাদের সৃষ্টি করা ভিন্ন লাভ কিছুই হবে না।"

শ্যামাকান্ত বৈবাহিকের নিকট নিজেকে নিরপরাধী মনে করিতে পারিতেছিলেন না, পাছে রজনীনাথ কিছু মনে করেন, সেই জন্যই বিষয়-ভাগের কথাটা তাড়াতাড়ি পাড়িয়াছিলেন, বেহাই-এর প্রস্তাব সত্যই যেন তাঁকে বিহ্বল করিল। আনন্দে বিস্ময়ে কিছুক্ষণের জন্য বাক্‌রোধ হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে রজনীনাথের পিঠে হাত রাখিয়া

অবরুদ্ধকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন—"কি বলে' আশীর্ব্বাদ কর্‌ব, রজনী—ঈশ্বর তোমার চিরমঙ্গল করুন! তোমার কাছে আমার মুখ দেখাতে লজ্জা করচে, এখন আমি কি করি বলে দাও, মাকে অর্দ্ধেক সম্পত্তি দেব স্থিরই করেছি, আর সেটা মিটিয়ে রাখা ভাল। বৃদ্ধ হয়েছি, কোন্ দিন আছি কোন্ দিন নেই। হেমের হাতে বিষয়টা পড়ে, এ আমার ইচ্ছে নয়। একে তো সে আমার মার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করচে না, তা'র উপর টাকাকড়ি যদি হাতে পড়ে—ঐসব দেখতে তো পাচ্চই? কি আর বলব? ভেবে কূল-কিনারাই পাচ্চি নে। আমার মাকে যে অযত্ন করে আমার তা'র মুখ দেখতে ইচ্ছে করে না।"

শুনিয়া রজনীনাথ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। মর্ম্মের মধ্যে মুহূর্ত্তের জন্য বেদনার হাহাকার উঠিল, কিন্তু দুঃখে নিরাশায় অবসন্ন হওয়া তাঁর স্বভাব নয়, জামাতাকে সংশোধন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তিনি ধীরভাবে কহিলেন—"কিন্তু ভেবে দেখুন, আপনার উইলও তো লতির পক্ষে এমন কিছু মঙ্গলের হ'বে না। যে পথটা আপনি নিচ্চেন, সেইটেই যে হেমের পক্ষে সব চেয়ে অমঙ্গলের। আমি শান্তির বাপ হিসাবে এ পরামর্শ শুধু চক্ষুলজ্জার খাতিরে দিচ্চি না, আপনার আশ্রিত—সেই চিরকৃতজ্ঞ ছোট ভাইএর হিসাবেই বলছি, এখন উইলের নামও করবেন না। এই অবসরে যদি হেম একটু মানুষ হয়ে উঠতে পারে, সেই চেষ্টাই করা যাক। হয়ত ঈশ্বর তা'কে রক্ষা কর্ব্বার জন্যেই এই শুভ সংঘটন করেছেন।"

শ্যামাকান্ত দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—"আমার অদৃষ্টে কি তা' হবে? দেখো ভাই, শেষটা আমি যেন আমার মার উপর অন্যায় না করে ফেলি, যদি আমি হঠাৎ মরে যাই, তা হ'লে আইন তো হেমকেই ভাগ দেবে, শান্তিকে নয়।"

"আপনার নগদ টাকাও তো খুব অল্প নয়, ইচ্ছে করেন তো জমীদারি ভাগ না করে ওদের সেইটেই দেবেন, কিন্তু এখন ও সব কথা থাক, হেমকে তা'র ভবিষ্যৎ ভাববার একটুখানি অবসর দিন, না হ'লে জানবেন চৌধুরীমশায়! আপনার সমুদয় জমীদারি ও বিষয় বিভব শান্তির চোখের জল থামাতে পার্ব্বে না।"

শ্যামাকান্ত শিহরিয়া বলিয়া উঠিলেন—"তারা!"

মনের জ্বালা মনে চাপিয়া এই ঘটনাকে ছাঁটিয়া কাটিয়া রজনীনাথ বসুমতীকে যাহা জানাইলেন, তার অর্থ এই দাঁড়ায় শ্যামাকান্তের শান্তিকে অর্দ্ধেক সম্পত্তিদানে রজনীনাথই বাধা দিয়াছেন। বসুমতী এ স্বার্থত্যাগের আবশ্যকতা বুঝিলেন না, দুঃখিত হইয়া বলিলেন, —"তা'র পর, মেয়েটা খা'বে কি করে—বিনোদের বউ যখন ওদের বিদায় করে দেবে—হেমের তো ঐ বিদ্যে।"

রজনীনাথ বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন—"কেন, তুমি মেয়ের বিয়ে দিয়ে যে ঘরজামাই রাখতে চেয়েছিলে? ভয় হয়ে গেল, পাছে দু'দিন খেতে দিতে হয়?" পরে গম্ভীর মুখে কহিলেন—"হেম একটু মানুষ হোক না,—তা'তে কি তোমরা সকলেই বাধা দিতে চাও? জেনো বসু, ঈশ্বর যা করেন, সবই মঙ্গলের জন্যে! চৌধুরী যদি হেমকে সত্যি সত্যি বিষয় থেকে বঞ্চিত করতে পারতেন, তা হ'লেই হেমের পক্ষে সব চেয়ে ভাল হ'ত। গরীবের স্ত্রীর আদর থাকে বসু! বড় লোকের স্ত্রী হও নি, তা'ই বুঝতে পারবে না, তা'রা কি আগুন—হীরের জ্যোতিতে লুকিয়ে রাখে। ভগবান্ আমার মেয়েকে তা'দের দল থেকে রক্ষা করুন।

মনের সহিত না মিলিলেও বসুমতী চুপ করিয়া রহিলেন। শান্তিকে রাজরাণী হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ আশীর্ব্বাদ করিয়া

তিনি ভাবিলেন—"সবই বাড়াবাড়ি! বড়লোক হ'লেই কি বদ হয়? হেম তো তেমন কিছু মন্দ নয়, মিথ্যে এত ভাবতেও পারেন।"

শান্তিকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে রজনীনাথ বলিলেন—"সেখানে সে যে কি সম্মানে, কি আদরে থাকে, তা'তো তুমি দেখ নি বন্ধু, সে কেমন করে সর্ব্বদা আসবে বল? আমাদের সেই এক ফোঁটা লতি—সেখানকার সকল লোকের মা, শ্বশুর থেকে দাসী চাকর সকলেই তা'র অনুগত। ক'দিনের মধ্যে বিনোদের স্ত্রী ও ছেলেটি তা'র একেবারে বশ হয়ে গেছে, সেই তো এখন অত বড় লক্ষ্মীপুরের সংসার চালাচ্চে। তা'র পরামর্শ ছাড়া চৌধুরী কোন কাজই করেন না।"

রজনীনাথের কণ্ঠে ইহার মধ্যে যে সঙ্কোচ ও বেদনার সুর ঝঙ্কার করিতেছিল, তাহাকে চাপিয়া রাখিবার শক্তি তাঁহার সবল চিত্তেও অধিক ছিল না। কই তিনি একথা বলিতে তো পারিলেন না যে—'হেমও তা'কে পাঠাতে ইচ্ছুক নয়!'

সভায় সেদিন বর্ষায় বাদলে বেশি লোক জমে নাই এবং যাহারা সেই বৃষ্টি বাদল মাথায় করিয়াও মনের অদম্য আগ্রহে ছুটিয়া আসিয়াছিল, রজনীনাথ তাদের আর্দ্রবস্ত্রে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে না দিয়া ফিরাইয়া দিয়াছিলেন।

বিদেশী শিল্প বর্জ্জনে দেশের বড় লোকদেরই যে সর্ব্বপ্রথম পথপ্রদর্শন করা কর্ত্তব্য ও সর্ব্ব বিষয়েই যে তাঁদের দায়িত্ব অধিক, এই সম্বন্ধেই সেদিন বলিতেছিলেন। সকল দেশেরই মধ্য-শ্রেণীর লোকেরা প্রথম শ্রেণীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া থাকে। উচ্চের আদর্শেই সর্ব্বত্র সমাজ গঠিত হয়, তা'ই আদর্শকে মহৎ করিতে হইবে। মডেল নিখুঁত হইলে চিত্রও নিখুঁত হয়।

সেদিন রজনীনাথ রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া বসুমতীকে বলিলেন—"আজ আমার মনটা বড় ভাল আছে, এখনি ঘুম আসবে না। এস একটু গল্প করি, আজকাল তো তোমার কাছে বসাই হয় না।"

স্বামীকে কয়দিন পরে কাছে পাইয়া বসুমতী স্বচ্ছন্দতা অনুভব করিলেন, তাঁর গম্ভীর মুখ, চিন্তা-রেখাযুক্ত ললাট ও দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠ কয়দিন তাঁকে যেন দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিল, নিতান্ত সরল প্রকৃতির মানুষ বসুমতী সেখানে সাহস করিয়া প্রবেশ করিতে পারেন না। কথায় কথায় রাত্রি বাড়িয়া যাইতেছিল। টেবিলের উপরে রক্ষিত প্লেট হইতে ঝুরো শেফালি ও চামেলির গন্ধ বাতাসকে আনন্দিত ও কর্ম্মক্লান্ত মস্তিষ্ককে স্নিগ্ধ করিতেছিল। কয়দিন পরে বৃষ্টি হওয়াতে ভিজা মাটির একটা সোঁদা গন্ধ বাতাসে মিশিয়া ফুলের গন্ধের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। বাগানের ওধারে রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ী ও লোক চলাচলের শব্দটা স্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে, ট্রামের সাড়া আর পাওয়া যাইতেছিল না।

বসুমতী সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা, বিদেশী বর্জ্জনের প্রতিজ্ঞা করলেন তো অনেকেই, তুমি কি করলে? তোমার ও তো নূতন নয়।"

"আমি—আমি তো কিছুই করি নি, এসো বসু! আমরাও আজ কিছু ত্যাগ করি, আজ ত্যাগের দিন।"

বসুমতী হাসিয়া বলিলেন—"ত্যাগ কি আর করবে, আমাকেই করো।"

রজনীনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"ইস্, তা' বুঝি পারি নে, বড় যে সাহস!"

বসুমতী হাসিয়া উঠিলেন, হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"আজকালকার দিনে সোনার সীতার দরকার হয় না, ফোটোগ্রাফ হ'লেই চলে।"

রজনীনাথও হাসিলেন—"মনে বড্ড গর্ব্ব যে! নিজের স্বামীকে রামচন্দ্রের সঙ্গে সমান আসন দেবার স্পর্দ্ধা সবাই রাখে না।"

বসুমতী গর্ব্বের সহিত স্বামীর পানে চাহিয়া বলিলেন—"যে স্ত্রী তা পারে না, সে বড় দুর্ভাগিনী।"

রজনীনাথের বুকের ব্যথায় এই নির্ভরতাপূর্ণ স্পর্দ্ধিত কথাগুলা আঘাতের মত বাজিয়া উঠিল। বসুমতী জানে না, তার স্নেহপ্রতিমা শান্তিও হয় তো এই দুর্ভাগিনীদেরই একজন!

ঠিক এমন সময় ফটকের মধ্যে সজোরে একখানি গাড়ী প্রবেশ করিবার শব্দ উভয়কেই আকৃষ্ট করিল। দেয়ালের একটা ঘড়ী নিজের কাজে ব্যস্ত ছিল, সেইদিকে চকিত নেত্রে চাহিয়া রজনীনাথ ঈষৎ উত্ত্যক্ত-ভাবে বলিলেন—"এত রাত্রেও মক্কেল নাকি?" একটা সম্ভাবনার কথা মনে উদয় হইল, কিন্তু হেম যে এত রাত্রে আসিবে না, তাহা স্থির-নিশ্চয় করিয়া মনটাকে ফিরাইয়া লইলেন। বসুমতীর চিত্তেও হয় তো ইহার ছায়াপাত হইয়া থাকিবে। একটু উৎসুক হইয়া তিনি সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি যে বল্লে, হেম আসবে, কই এলো না তো?"

রজনীনাথ কোন উত্তর দিলেন না, একান্ত ক্ষোভে নীরব রহিলেন।

"একি!—শান্তি—তুই এমন সময়?" নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া কম্পিতপদে গৃহে প্রবেশ করিয়া শান্তি সহসা বাধাপ্রাপ্তের মত থমকিয়া দাঁড়াইল। সে ভাবিয়াছিল, এত রাত্রে তার পিতা মাতা নিদ্রিত হইয়াছেন। সে শুধু গৃহের স্তিমিতালোকে বিছানার পাশে দাঁড়াইয়া তাঁদের স্নেহমুখ নিরীক্ষণ করিয়া নিঃশব্দে ফিরিয়া যাইবে। রাত্রের মত তাঁদের কাছে জবাবদিহির হাত এড়াইবে, মনে করিয়া সে ঈষৎ লঘু বোধ করিয়াছিল। যে মা বাপের স্নেহক্রোড় সে উৎকণ্ঠিত আগ্রহে কামনা

করিয়া থাকে, আজ নিকটে আসিয়াও সেখানের সেই চির-বিশ্বস্ত আশ্রয় গ্রহণ করিতে সে সঙ্কুচিতা।

উপরে উঠিয়া শান্তি দ্বারের নিকট থমকিয়া দাঁড়াইল, আঁচল দিয়া চোখ দুইটা বারংবার মুছিয়া ভাল করিয়া নিশ্বাস লইল, বুকের মধ্যে অপরাধীর আতঙ্ক অকারণে তাহাকে পীড়ন করিতেছিল। চির-অভ্যস্ত 'মা' শব্দ তার মুখে আসিয়াছিল। সে জানিত, সে ডাক—নিদ্রিতা জননীকে মুহূর্ত্তে জাগাইয়া তুলিবে ও আগমনীর প্রভাতে গিরিরাজ-পত্নী মেনকার মতই আলুথালু বেশে মা আসিয়া প্রাণাধিকা কন্যাকে উমা-জননীর ন্যায় ব্যাকুল স্নেহে বক্ষে টানিয়া লইবেন।—কিন্তু হায়! শান্তি কি সে অধিকার লইয়া তাঁদের দ্বারে আসিয়াছে? অপরাধী পতির অপরাধিনী পত্নী সে কোন্ মুখে সেই চির স্নেহের দাবী লইয়া তাঁদের মাঝে দাঁড়াইবে? দ্বার খুলিয়াই সে বিস্ময়ে কুণ্ঠিত হইয়া দেখিল, আলোকিত কক্ষে তখনও পিতামাতা জাগিয়া এবং তাঁরা—এমন কি—এই জনমুখরিত কোলাহলক্লান্ত নগরীর প্রান্তে বিশ্রাম অবসরেও তারই নাম স্নেহ কম্পিতকণ্ঠে উচ্চারণ করিতেছেন! পা দুইখানা যেন সেই-খানেই আটকাইয়া গেল। খুব সাবধানে প্রবেশ করিলেও শান্তির হাতের চুড়ি বালার মৃদুশিঞ্জন-ধ্বনি উঠিয়াছিল, সেই শব্দটুকু উৎকর্ণ রজনীনাথের কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি বিস্ময়ের সহিত দ্বারের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। সত্য! শব্দ তাঁকে প্রতারণা করে নাই।

যে শব্দে তাঁর বক্ষের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা ব্যাকুলভাবে আঘাত করিয়া উঠিয়াছিল, তাহা বাস্তবিকই শান্তির অলঙ্কার রব? আনন্দে বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন—"এত রাত্রে তুই কেমন করে এলিরে বুড়ি?" পর-ক্ষণেই আনন্দ-নির্ব্বাক বসুমতীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন—"দেখ বসু! তোমার বেহাই কত ভদ্র—অনেক দিন তুমি মেয়েকে দেখনি, তাই

নিজেই পাঠিয়ে দিয়েছেন। ও কিরে লতি! অমন করে দাঁড়িয়ে রৈলি কেন মা! আয় মা! আমার কাছে আয়, হেম এসেছে তো?—তোকে হঠাৎ যে পাঠালেন?"

বলিতে বলিতে সন্তানবৎসল পিতা দুই ব্যগ্র বাহু কন্যার দিকে প্রসারিত করিয়া তাহাকে বক্ষে লইতে সাগ্রহে উঠিয়া গেলেন। বিদ্যুতে পরিপূর্ণ জলীয় বাষ্পভরা মেঘখানা বর্ষণোন্মুখ হইয়া যখন আকাশের গায়ে স্তব্ধভাবে দাঁড়ায়, তখন কতটুকুই বা উত্তর বায়ুর প্রয়োজন থাকে? বাতাসের একটা দমকামাত্রে সেখানাকে ফাটাইয়া এককালে নিঃশেষে বর্ষণ করাইয়া দেয়, তেমনি করিয়াই শান্তির রুদ্ধ বাষ্পেভরা হৃদয় সেই গভীর বিশ্বাসে বিজড়িত স্নেহাদরে যেন ফাটিয়া পড়িল, সে ঈষৎ অগ্রসর হইয়া পিতার পদতলে মাটিতে বসিয়া পড়িল। অবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল—"আমি লুকিয়ে চলে এসেছি, সেখানে থাকতে পারলুম না।"

আর কিছু সে বলিতে পারিল না। আর কিছু শুনিবারও প্রয়োজন ছিল না। রজনীনাথের প্রসারিত বাহু নিমেষে ফিরিয়া আসিল, বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধ রহিলেন। এ কথাও কি তাঁকে বিশ্বাস করিতে হইবে?

শান্তি নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। বিস্ময়-বেদনায় কম্পিতকণ্ঠে পিতা কহিলেন—"হীনের সঙ্গে থেকে তুমি এত হীন হয়ে গেছ, শান্তি! এ কথা আমি যে স্বপ্নেও ভাবিনি। আমার সব শিক্ষা এমনি করেই তুমি ডুবিয়ে দিলে?"

অপরাধিনী একবার নতমুখ তুলিয়া পিতার পানে চাহিল কিন্তু তাঁর কঠোর বিচার দৃষ্টির সম্মুখে তার ভয়চকিত দৃষ্টি আপনা হইতে নত হইল। সে বলিবেই বা কি? বলিবে কি যে, তার ঈর্ষাপীড়িত স্বামী জোর করিয়া আশ্রয়-নীড় হইতে তাহাকে কঠোর হস্তে ছিনাইয়া আনিয়াছে।

কেমন করিয়া এ কথা বলিবে? স্ত্রী হইয়া পিতার নিকট স্বামীকে হীন প্রতিপন্ন করিয়া সাধু সাজিবে? তার মৌন অধর ঈষৎ কম্পিত হইল, স্বামীর মন ধর্ম্মপথে যে ধরিয়া রাখিতে পারে না, সে কি দোষী নয়?

বসুমতী স্বামীর রূঢ়তায় বিরক্তির সহিত উঠিয়া আসিয়া মেয়ের হাত ধরিয়া তীক্ষ্ণস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"তুমি ওর উপর মিথ্যে রাগ করচ কেন? নিশ্চয়ই বিনোদের বউ ওকে এমন কিছু বলেছে, কিম্বা হয় তো চৌধুরীমশায় ভাল ব্যবহার করেন নি, নৈলে আমার মেয়ে এমন নয় যে আপনা হ'তে চলে আসবে! তখনই তো তোমায় বল্লুম, ছোট ঘরের মেয়ে কখন ভাল হয় না, আমার বাছাকে আমার কাছে এনে দাও। আয় মা শান্তি! তুই উঠে আয় মা!"

শান্তি উঠিল না। তার চোখের কোল ছাপাইয়া যে অজস্র অশ্রুজল উথলাইয়া উঠিতেছিল, এবার তাহা ঝর্-ঝর্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কেমন করিয়া সে এ অপবাদ সহ্য করিবে? অথচ কেমন করিয়াই বা সব কথা বলিবে? তার চেয়ে নীরবে পিতৃদত্ত দণ্ড গ্রহণ করাও ভাল; যদিও সে জানে এই অবিচারের দণ্ড—বিচারক ও বিচারার্থী উভয়কেই সাংঘাতিক বাজিবে।

রজনীনাথ তীক্ষ্ণ গম্ভীর দৃষ্টিতে কন্যার দিকে চাহিয়া দুঃখ-গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"পরের কাছে দাবী নেই, কিন্তু নিজের সন্তানও শেষে এমন করে আশা ভঙ্গ কর্‌লে?"

রজনীনাথ উঠিয়া গেলেন। বসুমতীও কন্যা-জামাতার সেবার জন্য দাসদাসীদিগকে ডাকিয়া আদেশ প্রদান করিয়া আসিলেন। কয়দিন ধরিয়া মেয়ের জন্য তাঁর মনটা ব্যাকুল হইয়া ছিল, কোন রকমে তাহাকে কাছে পাইয়া তিনি বর্ত্তাইয়া গেছেন, অন্য কিছু ভাবিবার তাঁহার প্রয়োজন নাই। সেখানে যে বনিবনা হইবার সম্ভাবনা নাই, সেকথা

তিনি প্রথম হইতেই বলিতেছেন। রজনীনাথ যদি তাহা হাসিয়া উড়াইয়া না দিতেন, এ কাণ্ড হয় না। অনেক নির্য্যাতন না পাইলে শাস্তি এমন করিয়া চলিয়া আসে! পুরুষমানুষ বিষয়কার্য্য বুঝিলেও লোকচরিত্র মেয়েমানুষের মত বোঝে না, কিন্তু ঐ কেমন 'সবজান্তা' সাজা রোগ, সেই দোষেই তারা মেয়েদের বুদ্ধিকে অগ্রাহ্য করিতে গিয়া সংসারে অশান্তি সৃষ্টি করিয়া বসে। বৃদ্ধ বৈবাহিকের উপরেও বসুমতীর রাগ করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল। তাঁর মেয়ের উপর সে বৃদ্ধের বরাবরই অত্যাচার। তিনি যখন মনের মত দেখিয়া শুনিয়া সেই ছেলেটিকে বাছিয়া লইলেন, এমন সময় কোথা হইতে লোভাতুর বৃদ্ধ তাঁর সেই কল্পনা-কুসুম ছিন্ন করিতে হাত বাড়াইল। বসুমতী অন্য মায়ের মত মেয়ের ঐশ্বর্য্যের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া তার মনের শান্তি বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন, তা'ই সে দুঃখ তাঁর গর্ব্বিত স্বভাব বড় লোকের পোষ্যপুত্র জামাতায় মিটে নাই।

বসুমতী ক্রমেই দেখিতেছিলেন—"স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী" বলিয়া শাস্ত্রকারেরা যে একটা ভয়ানক ভুলকে চিরদিন প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছেন, তার বিষময় ফল তাঁর সংসারে ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে! জামাই কখনও 'মা' বলিয়া কথা কহিল না, মেয়ের উপর তার টান তো কিছু নাই বলিলেও হয়। তার উপর সে আবার লক্ষপতির পরিবর্ত্তে একজন দরিদ্র ভিক্ষুকে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তখন যদি রজনীনাথ নীরদের সহিত মেয়ের বিবাহ দিতেন, তা হইলে এ সব নাটকীয় অভিনয়ের ভূমিকা তাঁদের গ্রহণ করিতে হইত না। এই পর্য্যন্তও তাঁর মনঃপূত হইল না, শুধু শুধু তাঁর বাছাকে পিতা হইয়া এই দুঃখ সহাইলেন। এও বসুমতীর বুদ্ধিকে অগ্রাহ্য করার ফল।

রজনীনাথ যখন ফিরিয়া আসিলেন, বসুমতী তাঁহাকে কি বলিতে

গিয়া ঝড়ের আকাশের মত গুরুগম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়াই থমকিয়া গেলেন।

রজনীনাথ বলিলেন—"হেমের কাছে যা শুনলুম, দেখচি তুমিই দোষী। লোকের কথাই তোমার বড় হ'ল? জিদ করে তুমি হেমের সঙ্গে চলে এলে! একবার ভেবে দেখলে না তোমার এই ব্যবহার তোমার বাপকে কতখানি আঘাত করবে? তুমি আমার সেই শান্তি? সবই আমার কর্ম্মফল, আমায় সহ্য করতে হ'বে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত না তোমার শ্বশুর তোমায় ক্ষমা করচেন, সে পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে তোমাদের কোন সম্পর্ক নেই—"

শান্তির চোখের জল মুছাইবার চেষ্টা করিতে করিতে বসুমতী তীব্র ভাবে ফিরিয়া মুহূর্ত্তে সংযত হইয়া ব্যাকুলকণ্ঠে কহিলেন—"অমন কথা বলো না, দোষ তোমার গোঁয়ার-গোবিন্দ জামায়ের, ওকে কেন শুধু শুধু ও-সব নিষ্ঠুর কথা বলচো—"

রজনীনাথ ঈষৎ চঞ্চলভাবে বিছানার উপর বসিয়া পড়িলেন। তা'ই কি? সত্যই কি তিনি নিষ্ঠুরতা করিতেছেন? কাহার প্রতি সে নিষ্ঠুরতা? যে তাঁর জীবনের আধখানা জুড়িয়া রহিয়াছে, সুপ্রকাশের চেয়েও বোধ করি যে তাঁর বেশী আশার, অধিকতর স্নেহের—? না নিষ্ঠুরতা নয়, লোকে ইহাকে যে শব্দ দ্বারাই বিশেষিত করুক, তিনি জানেন, তিনি কর্ত্তব্যপরায়ণ পিতা। সন্তানের ভুলের, অন্যায়ের প্রশ্রয় দিয়া সর্ব্বনাশের পথে অগ্রসর হইতে তাহাকে সাহায্য করা পিতার কর্ত্তব্য নয়।

বসুমতী স্বামীকে চিন্তিত দেখিয়া, আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন—"এখন এরা থাক, তুমি না হয় একদিন লক্ষ্মীপুরে গিয়ে—"

"না, আমি হেমকে বলে এসেছি, কাল সকালের ট্রেণেই তা'রা বাড়ী

ফিরে যা'বে, আমি কোন অবস্থাতেই ভুলতে পারি না, যে, আমি শ্যামাকান্ত চৌধুরীর কৃপান্নপালিত।"

পাশের ঘরের খোলা দরজার মধ্য দিয়া সদ্য নিদ্রোত্থিত সুপ্রকাশ অনাবৃত দেহে অসংযত বস্ত্রে উঠিয়া আসিল। তার বড় বড় চোখের চঞ্চল কালো তারা ও দীর্ঘ নেত্রপল্লবগুলি ঘুমে জড়াইয়া রহিয়াছে, স্থূল শুভ্র কাঁধের কাছে কালোচুলের গোছা যেন নিদ্রিত সর্পশিশুর মত দেখাইতেছিল।

"বাবা! দিদি এসেছে? আমি দিদিকে স্বপ্ন দেখছিলুম। ঐ তো দিদি—" বলিতে বলিতে হঠাৎ দিদির উপর দৃষ্টি পড়ায় বিস্ময়মিশ্রিত আনন্দধ্বনি করিয়া বালক তার কাছে ছুটিয়া গিয়া দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, নিদ্রা-বিজড়িত কালো চোথ আহ্লাদে উজ্জ্বল করিয়া ঈষৎ অভিমান প্রকাশ করিয়া কহিল—"হ্যাঁ দিদি! তুমি এমন করে চুপি চুপি এলে কেন? আমায় কেন আগে থেকে লিখলে না, তা হ'লে আমি কক্ষণো ঘুমতুম না, নিশ্চয় তোমাকে ইষ্টিসান থেকে নতুন মোটরে করে আনতে যেতুম—"

রজনীনাথ আদেশ দিলেন—"সুকু! তুমি ঘুমুতে যাও—"

চমকিয়া শান্তি বক্ষলগ্ন বড় স্নেহের ভাইটিকে ছাড়িয়া দিল। সাশ্চর্য্যে বালক দিদিকে পরিত্যাগ করিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষে পিতার মুখের দিকে চাহিল। রজনীনাথের মুখে তখন এমন একটা ভাব ছিল যাহা দেখিয়া আদুরে ছেলে সুপ্রকাশও ভয় পাইল। সেই অলঙ্ঘ্য আদেশের বিরুদ্ধে একটিমাত্র প্রতিবাদের শব্দ উচ্চারণ করিতে সাহস না করিয়া সে ছলছল চক্ষে একবার দিদির অশ্রুহীন চোখের দিকে চাহিয়া দেখিল—দিদির মুখে হাসি নাই, চোখের দৃষ্টি নত, মুখ এমন ম্লান যে সে রকম মুখ সে আর কখনও আর কাহারও দেখে নাই। মৃদু গতিতে অনিচ্ছুকভাবে

সে চলিয়া গেল ; কিন্তু পাশের ঘর হইতে তার অস্পষ্ট রোদনের ফোঁপানি শব্দ আসিতে বাধা পাইল না। এবার শান্তি হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল, মুখ তুলিয়া দৃঢ়ভাবে সে পিতার দিকে চাহিয়া বলিল—"বাবা ! আর কা'রো সঙ্গে আমায় তা'হ'লে লক্ষ্মীপুরে পাঠিয়ে দিন।"

হেমেন্দ্রের সহিত পথে বাহির হইবার সাহস নাই—একথা সে বলিতে পারিল না। আতঙ্কটা প্রকাশ করিতে না পারিয়া, কথা অসমাপ্ত রাখিয়াই মাথা নীচু করিল।

রজনীনাথ একটু চঞ্চল হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"তা কি হয়,—হেমও ফিরে যা'ক। তিনি যদি মনে করেন, আমি ওকে প্রশ্রয় দিচ্চি।"

"জামাইবাবু বলচেন যেতে হয় তো চারটের টেরেণে যাওয়াই সুবিধে।" বলিতে বলিতে মোক্ষদা গৃহে প্রবেশ করিল।

বসুমতী ধড়মড়িয়া উঠিয়া বলিলেন—"ওমা ! সে আবার কি কথা ! যেতে হয় তখন কাল বিকেলে যাবে, এই রাত্তিরে না খাওয়া না ঘুমনো এখন কোথায় যা'বে ? যা তো রে মুখি, শীগ্‌গির করে তোলা উননটা ধরিয়ে চাট্টি ময়দা মাখগে, বলাইকে বলগে বিছানা-টিছানা ঠিক করে দিক। বামুনদি না উঠে থাকে তো আর ওঠাতে হ'বে না। আমি নিজে গিয়ে খাবার করে দিচ্চি,—দেখিস্ বাছা,—দেরি যেন না হয়।"

মোক্ষদা চলিয়া গেল ও একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"জামাইবাবু বল্লেন, এই ভোর রাত্তিরে কি খাওয়া যায়, ওসব করতে বারণ কর। ওই টেরেণে যেতেই হ'বে, আবার কাল না হোক পরশু তিনি ফিরে তো আসচেন।"

জামাতার সুমতি দেখিয়া রজনীনাথের মুখের কঠিন ভাব অনেকটা কমিয়া আসিল। হেমেন্দ্র তবে নিজের অন্যায় বুঝিয়াছে ? শান্তির একটু কাছে আসিয়া বলিলেন—"তবে সেই ভাল, দেরি করে

কাজ নেই, শান্তি! এবার যেন তোমায় তুচ্ছ বিষয়ে কর্ত্তব্য ত্যাগ করতে না দেখি! ভুলে যেও না, তোমার শ্বশুর শুধু তোমার শ্বশুর নন, তোমার পিতার অন্নদাতা।"

শান্তি পিতামাতার পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বসুমতী তাকে দুইহাতে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কপালে চুম্বন করিলেন, রজনীনাথ মুখ ফিরাইয়া এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া থাকিয়া ঘাটের পিছনের জানালাটা খুলিবার জন্য চলিয়া গেলেন। মাহুত যেমন করিয়া অনিচ্ছুক হস্তীকে অঙ্কুশাঘাতে ফিরায়, প্রবল ইচ্ছাকে তেমনি করিয়া রোধ করিতে হইল। শান্তি মায়ের বুকে একবার মাথা রাখিয়া এক মুহূর্ত্তকাল স্থির দৃষ্টিতে তাঁর রোদনাক্ত মুখের পানে চাহিয়া দেখিল, তার পর ধীরে ধীরে মায়ের স্নেহবন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া সকাল বেলাকার ম্লান শুকতারা যেমন তার সব জ্যোতিঃটুকু একেবারে উষার নবীন কিরণালোকের মধ্যে নিঃশেষে বিলীন করিয়া দিয়া ঘননীলিমার মাঝখানে নিঃশব্দে মিলাইয়া যায় তেমনি করিয়া নীরবে সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। তার চোখে তখন আর জলের রেখাটুকু ছিল না, স্থির প্রতিজ্ঞার একটি দৃঢ়তা সে যেন পিতার নিকট হইতে তাঁর মৌন আশীর্ব্বাদস্বরূপ লাভ করিয়াছিল, বেদনা ও লজ্জার বিকলতা দূরে ফেলিয়া সে স্থির পদে ফিরিয়া গেল।

বসুমতী দুঃখে অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিলেন, রুদ্ধস্বরে বলিলেন— "তখনি আমি বলেছিলুম, ওখানে শান্তির বিয়ে দিও না, তা'তে তুমি শুন্‌লে না, এমনি করেই মেয়েকে আমার সবাই মিলে খুন করবে!"

মোক্ষদা দ্বারের নিকট গিয়া ফিরিয়া আসিল—"চুপ কর মা! জামাইবাবু বাইরে রয়েচেন।"

শরীর ভাল নাই বলিয়া বসুমতী পরদিন আহ্নিকের পরই নিজের শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন। মোক্ষদা আহারের জন্য ডাকিতে আসিয়া ধমক খাইয়া গিয়াছে। সুপ্রকাশ সকালে উঠিয়া দিদি চলিয়া গিয়াছে দেখিয়া এমন হাঙ্গামা বাধাইয়া তুলিয়াছে যে কেহই তাহাকে শান্ত করিতে পারিতেছে না। দিদি যে তার চেয়ে হেমবাবুকে বেশী ভালবাসে—সে বিষয়ে আজ সে নিশ্চিন্ত হইয়াছে এবং আর কখনও সে দিদির কথায় বিশ্বাস করিবে না, এ বিষয়ে সে সরকার মহাশয় হইতে রজনীনাথ পর্য্যন্ত সকলকে সাক্ষী রাখিয়া পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিতেছে।

ভারতের মানচিত্রে কোন একটি নগরের অস্তিত্ব লইয়া গুরুশিষ্যে সেদিন অত্যন্ত মনোমালিন্য চলিতেছিল। ছাত্র জলভরা চোখ ও কম্পিত অধরে ভৃত্যের দ্বারা আনীত হইয়া ঘরে ঢুকিবামাত্র মাষ্টারমশায় তার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছুমাত্র কৌতূহলী না হইয়া একেবারে ম্যাপ খুলিয়া একটা সৃষ্টিছাড়া অনাবশ্যক দেশের নাম খুঁজিয়া বাহির করিতে আদেশ দিলেন, এ বিষয়ে তার অনুরাগের কথা জানা ছিল বলিয়াই তিনি তাকে ভুলাইবার জন্য এই ফন্দি আঁটিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতে আজ হিতে বিপরীত হইল। কলম্বস যখন আমেরিকার উপকূলে দাঁড়াইয়া নূতন জগৎ আবিষ্কার করিলেন, তখন তাঁর যে মনোভাব হইয়াছিল, বিচিত্র বর্ণের ভূগোলচিত্র হইতে ক্ষুদ্র অক্ষরে ছাপান নূতন নূতন দেশের নাম আবিষ্কার করিয়া সে সেই রকমই একটা আত্ম-প্রসাদ লাভ করিত; কিন্তু আজ তার সে মনের অবস্থা নাই। দুই একবার চিত্রের দিকে চাহিয়া হঠাৎ সে রাগিয়া গেল, পুস্তক হইতে দৃষ্টি উঠাইয়া গম্ভীর মুখে

চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইল, মাষ্টার তাহাকে চিনিতেন—বুঝিলেন বিপদ সামান্য নয়।

রজনীনাথের জুতার শব্দে সুকু অন্যদিন শান্তমূর্ত্তিতে ফিরিয়া আসে—আজও একবার সে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেভাব সামলাইয়া আরও কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। মাষ্টারের উত্তেজিত স্বর বিমনা রজনীনাথকে অনেকক্ষণ পরে যখন সে ঘরে টানিয়া আনিল, তখনও তার কাপড় ছাড়া হয় নাই। রজনীনাথ কি হইয়াছে জানিতে চাহিলেন না, পুত্রের কাছে আসিয়া তার কুঞ্চিত কেশের উপর ডান হাতটি রাখিয়া বাম হস্তে তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া একবার গম্ভীর বিষাদপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। সুকুর ঠোঁট কাঁপিতেছিল, চোখের জল এতক্ষণ জিদ করিয়া সে চাপিয়া রাখিয়াছিল কিন্তু আর সে নিজের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিল না, ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। রজনীনাথ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া মাষ্টারের দিকে ফিরিয়া ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজ ওর মন ভাল নেই—অবাধ্যতার জন্যে মাপ চাইলে কি ওকে আজ'ছুটী দেবেন?"

মাষ্টার চলিয়া গেলে গভীর স্নেহে পুত্রকে বুকে টানিয়া লইয়া রজনীনাথ তার ললাটে অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেকখানি স্নেহ ঢালিয়া চুম্বন করিলেন। বালক সেদিনকার অপরাধের সামান্য শাস্তির পরেই এতখানি আদরের মর্ম্ম তাঁর সজল গম্ভীর মুখে খুঁজিয়া না পাইলেও আপনা আপনি তার চোখে জল আসিতে লাগিল। পিতার প্রতি অভিমান ভুলিয়া তাঁর উপর কেমন যেন একটা প্রবল সহানুভূতি আসিয়া পড়িল, মনে হইতে লাগিল—"বাবা কেন আজ এমন করে চাইচেন? বোধ হয়, বাবাও মনে করেচেন দিদি এখন বাবাকে ভালবাসে না। দিদি যেন কি হয়ে গেছে?

রজনীনাথ অনেক রাত্রে শয়ন করিতে গেলেন। নিঃশব্দে দিনরাত্রি কাটিয়া গেল। তা'র পর আরও একটা দিন আসিল এবং চলিয়া গেল। ডাকের পিয়নটা দুইতিন দফায় সংবাদপত্র ও চিঠিতে রজনীনাথের পড়িবার ঘরের বড় টেবিলটা ভরাইয়া দিয়া গেল; কিন্তু কোন এক-খানাতেও প্রত্যাশিত অক্ষরের ছাপ নজরে পড়িল না। সংসারটা কেবলই কার্য্যের জন্য সৃষ্ট, মনের কোন অবস্থাতেই কার্য্য পরিত্যাগ করিবার উপায় নাই—রজনীনাথ সমাগত মক্কেলদের কাজ দেখিতে উঠিয়া গেলেন। অনেকটা সময় তাদের সহিত মকদ্দমা সংক্রান্ত কথাবার্ত্তায় কাটাইয়া তাহারা বিদায় লইলে জোর করিয়া উঠিয়া অফিস ঘরে আসিয়া মোটা মোটা আইনের বই খুলিয়া বসিলেন; কিন্তু যতই অধিক আগ্রহের সহিত সেগুলাকে নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন, তাদের মধ্যকার ছাপার অক্ষর-গুলা ততই তাঁর মনের মধ্যে দুর্ব্বোধ্য ও জটিল হইয়া উঠিতে লাগিল। পিনালকোডের ধারার উপর একখানা সকরুণ মুখচ্ছবি কেবলই অঙ্কিত হইয়া উঠিতে থাকিল। সে মুখের নেগেটিভখানা যে তাঁহারই বুকের মধ্যে বসান রহিয়াছে! বর্ষাধৌত যূঁইফুলের মত অশ্রুজলে অস্পষ্ট সে সুন্দর ক্ষুদ্র মুখখানা যে তাঁরই আদরিণী-অপরাধিনী কন্যার! পিতার পক্ষে আত্মদমন করা অসম্ভব হইয়া উঠিল।

সেদিনও মেঘধূম্র আকাশ জলভারের গৌরবে বজ্র বিদ্যুৎ বক্ষে বহিয়া আনিয়া স্তব্ধ হইয়াছিল। নদীর এপার ওপারে যে যে স্থানে আকাশ-খানা হেলিয়া পড়িয়া সবুজ গাছের মাথা স্পর্শ করিয়াছে, সেই সকল স্থানেই যেন কালি ঢালা। কালো আকাশের নীচে সবুজ গাছের শ্রেণী, আবার সেই সবুজ ঝোপের মধ্যে মধ্যে কোথাও একটা গাছ রাঙ্গা ছাতিম ফুলে ভরা, কোথাও বা গোটাকতক কদম্ব ফুটিয়া গাছ আলো করিয়াছে। আসন্ন বৃষ্টির ভয়ে বক, চিল ও অন্যান্য পাখীরা ঝাঁক বাঁধিয়া আকাশের কোলে তারকা-শ্রেণীর মত ক্ষুদ্রাকারে উড়িয়া যাইতেছিল, কেবল কাকগুলা তখনও পর্য্যন্ত নির্ভরতার সহিত গাছের ডালে ও প্রাচীরের ধারে বসিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল, আসন্ন বিপদের ভয়ে বর্ত্তমানকে উপেক্ষা করিতে প্রস্তুত নয়।

জানালার নিকটে আরাম কেদারায় পড়িয়া শ্যামাকান্ত চৌধুরী বিশ্রাম করিতেছিলেন, নিকটে একটা ছোট টেবিলের উপর চশমার খাপ ও একখানা বাংলা সংবাদপত্র পড়িয়া আছে। সেখানার এখনও ভাঁজ খোলা হয় নাই। একই সময়ে নিজের অন্তরের সঙ্গে ও বাহিরের সহিত তাঁর যে সংগ্রাম বাধিয়াছিল, তাহা হইতে আত্মরক্ষা করা শ্যামা-কান্তের পক্ষে প্রায় অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। কৃতকর্ম্মের অনুশোচনা ও অকৃতকার্য্যের ফলভোগ তাঁর পক্ষে এখন অনিবার্য্য। মনের দৃঢ়তা বহুপূর্ব্বেই গিয়াছে—কেমন করিয়া এত বড় বড় আঘাতগুলা সহ্য করিয়া চারিদিককার বিরোধকে শান্ত ও সমঞ্জস করিয়া চালাইয়া যাইবেন, সে

কথা মনে করিবার মত বলও তো সেই চিন্তাজীর্ণ বক্ষের ভিতর নাই। অবসাদের ক্লান্তিতে শুভ্র মস্তক নামিয়া আসে, স্তিমিত চক্ষু কেবলই মুদিয়া আসিতে থাকে। উপায় ও চেষ্টা ধরা দেয় না। তবে একটা আশা তিনি কোন সময়ই ছাড়িতে পারেন না, তা'ই মনের এমন সঙ্কট অবস্থাতেও নিকটবর্ত্তী সমস্যাটার অপেক্ষা দূরস্থ সঙ্কটের কথাই তাঁর মনে লৌহদণ্ডের মত আঘাত করে। বেদনা অপেক্ষা সময়ে সময়ে এই প্রলেপের জ্বালা অধিকতর ভয়ানক। অথবা মনের এ অবস্থাকে ছাড়াইয়া চলিবার পথ পাওয়া যাইতেছিল না, চারিদিক হইতে সব দ্বারগুলাই একে একে বন্ধ হইয়া যাইতেছে, অন্ধকার ক্রমে ঘন ও ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে, অন্ধকারে যে ক্ষুদ্র ধ্রুব তারাটি আপনার সবটুকু স্নিগ্ধ আলোক ঢালিয়া দিয়া তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছিল, সেও সহসা এই নিবিড় অন্ধকাররাশির মধ্যে বিন্দুর মত বিলুপ্ত হইয়া গেল, এখন এই গভীরতম অন্ধকারের এই রুদ্ধদ্বার দুর্গকারার নির্জ্জন পথে দৃষ্টিহীন অন্ধকে কে হাত ধরিয়া উদ্ধার করিবে? অন্ধকারে ভীত বালক যেমন নির্ভরতার সহিত মাতৃবক্ষে মুখ লুকাইয়া নিজেকে ঢাকিতে চায় তেমনি করিয়াই শ্যামাকান্ত ব্যাকুলভাবে 'মা' বলিয়া একখানি স্নেহ-বক্ষের ছায়াতলে আত্মসমর্পণ করিতে গিয়া স্বপ্নদৃষ্টের মত চমকিয়া ফিরিয়া আসেন। হায়রে মাতৃহারা! আজ সে কোথায়?—কোথা মা! কোথা মা! ও মা তুই ফিরে আয়! ফিরে আয়!

শ্যামাকান্ত সবচেয়ে আপনাকেই বেশি তিরস্কার করিতেছিলেন, যে সময় পূর্ব্বকালের লোকেরা সংসারাশ্রমকে পরিত্যক্ত চীরখণ্ডের মত অবহেলায় পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থাবলম্বনে পারলৌকিক চিন্তায় মনঃসংযোগ করিতেন—তিনি কিনা ঠিক সেই সময় একটি শিশুর স্নেহে অন্ধ হইয়া তাহাকে কোলে পাইবার জন্য যে কোন উপায় খুঁজিয়া

উন্মাদের মত বেড়াইয়াছেন! এ কথাও কি ভাবা উচিত ছিল না যে, তাঁর খেয়ালের দায়ে তিনি যাকে কাছে টানিতেছেন, তাহার জীবন কেবলমাত্র তাঁহাকে খেলার সুখ দান করিবার জন্যই সৃষ্ট হয় নাই! সোনায় হীরায় সাজাইয়া পুতুলের মত কাচের দেরাজে রাখাতেই তার জীবনের চরম পরিণতি নয়। এখন তাঁর ঘরের দুষ্ট শিশু যদি তাঁহাকে ঠেলিয়া, তাঁর সেই যত্নের প্রতিমা সিংহাসনচ্যুত করিয়া, ডাকের সাজ খুলিয়া কাদামাটি মাখাইয়া দূরে ফেলিয়া দেয়, তা হইলে তিনি তাকে কেমন করিয়াই বা রক্ষা করিবেন? এই সোজা কথাটা বুঝিতেই কি সবচেয়ে দেরি হইল? রজনীনাথের মেয়ে তাঁর হৃদয়ে যে রেখাপাত করিয়াছিল, তা লইয়া খুসী থাকিলেই তো চলিত? মানসমন্দিরেই তো দেবী পূজায় ফলাধিক্য।

সেদিন শ্যামাকান্তের বিশ্রাম অবসর হ্রস্ব হইয়া পড়িল, ভৃত্য প্রবেশ করিয়া জানাইল—"বাবু এসেচেন।"

"কে বাবু?" এই প্রশ্ন উঠিবার পূর্ব্বেই রজনীনাথ গৃহে প্রবেশ করিলেন।

"—রজনি!" সাগ্রহে শ্যামাকান্ত উঠিয়া সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন—"এসো, এসো, আমি তোমার কাছে লোক পাঠাব ভাবছিলুম। সব ভাল তো?" শেষের স্বরটা কাঁপিয়া আসিল।

রজনীনাথ বেহাইকে প্রণাম করিয়া ভৃত্যের দেওয়া কেদারাখানা শ্যামাকান্তের আসনের দিকে একটু সরাইয়া লইয়া বসিতে বসিতে উত্তর করিলেন—"আপনার আশীর্ব্বাদে একরকম চলচে—"

মানুষ খুব বেশি রকম একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া উঠিলে প্রথম যে মুহূর্ত্তে সেটাকে অবাস্তব বলিয়া জানিতে পারে, সেই মুহূর্ত্তেই তার মনে প্রাণে যে রকম একটা গভীর শান্তি জাগিয়া উঠে, রজনীনাথের আগমনে

শ্যামাকান্তও ঠিক সেইরূপ একটা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিলেন। বুকের মধ্যে যে যন্ত্রণার ব্যথাটা কণ্ঠ অবধি ঠেলিয়া উঠিতেছিল, মন্ত্র চিকিৎসার অব্যর্থ প্রয়োগের ন্যায় তাহা মুহূর্ত্তে নিবৃত্ত হইয়া গিয়া শরীরে যেন নব বলের সৃষ্টি করিল। পরিত্যক্ত আলবোলার নলটা তুলিয়া লইয়া ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিলেন—"আর কেউ এসেছে ?"

রজনীনাথ শ্যামাকান্তের মুখের পাণ্ডুতা লক্ষ্য করিয়া ঈষৎ কুণ্ঠিতভাবে মৃদুস্বরে কহিলেন—"মেঘ দেখে একাই এলেম, আপনি ভাল আছেন তো ?"

হতাশভাবে শ্যামাকান্ত কেদারার পৃষ্ঠে মস্তক নিক্ষেপ করিয়া অধীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন—"আরও ভাল থাকবো ? মৃত্যু ভুলে রয়েচে, তা'ই বেঁচে থাকা—মরণের তো সময় হয়েছে।"

এই কথা কয়টা রজনীনাথকে এমন প্রবলভাবে আঘাত করিল যে, তিনি ব্যথিত ও লজ্জিত মস্তক নীরবে হেঁট করিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শ্যামাকান্ত কোন কথাই কহিলেন না, রজনীনাথও চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, বক্তব্য বিষয় সহজ করিয়া লইতে আজ তাঁর অত্যধিক বিলম্ব ঘটিতেছিল।

ক্রমে স্তব্ধ গাছপালা দোলাইয়া একটা সন্ সন্ শব্দ উঠিল। কড় কড় মহাশব্দে মেঘ ডাকিয়া মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইতে থাকিল। তখনও ঝাঁক বাঁধিয়া পাখীগুলা ওপারের আশ্রয়াভিমুখে নদীর উপর দিয়া সাঁ সাঁ করিয়া উড়িয়া চলিয়াছে, এপারের ছায়াময় ঘাটের পথে পল্লীবধূগণের মল ও চুড়ির শব্দ মুখর হইয়া উঠিয়াছে, সঙ্কোচকুণ্ঠিতভাবে রজনীনাথ সহসা বলিয়া ফেলিলেন—"আপনি বোধ হয় তাদের ক্ষমা করেছেন ? সে এ রকম ব্যবহার করবে তা—"

শ্যামাকান্ত প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চাহিয়া বাধা দিলেন—"কাদের ক্ষমা করেছি ?"

আবার রজনীনাথ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, একটু থামিয়া বলিলেন—"যা'রা আপনার কাছে অমার্জ্জনীয় অপরাধে অপরাধী।—হেম বড় অন্যায় করেছে, কিন্তু তার চেয়ে—"

যে নামটা তাঁর জিহ্বা অপরাধী শ্রেণীর সহিত সংযুক্ত করিতে জড়াইয়া আসিতেছিল, সেটা তাঁর জোর করিয়া উচ্চারণ করিবার প্রয়োজন হইল না, শ্যামাকান্ত বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন—"ক্ষমা? আমি তো রাগ করি নি, ক্ষমা কিসের জন্য? বরং ধরতে গেলে আমিই অপরাধী—"

বৃদ্ধ যেন ধরা-ছোঁয়া দিতে রাজি নহেন। রজনীনাথ হতাশ হইয়া চুপ করিলেন।

এই সময় বড়রকম একটা ঝড়ো হাওয়া উঠিয়া ঘরের কাগজপত্র উলট পালট করিয়া দিয়া রজনীনাথকে একটা কাজ আনিয়া দিল ও পরক্ষণে গর্জ্জন শব্দে মেঘ ডাকিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হওয়াতে জানালা বন্ধ করিবার জন্য তাঁহাকে উঠিতে হইল। ফিরিবার সময় রজনীনাথ একখানা সংবাদপত্র টেবিলের উপর হইতে উঠাইয়া আনিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন, কিন্তু শোকাতুর বৃদ্ধের অভিমানাহত চিত্তের রুদ্ধ হতাশা তাঁহাকে ভিতরে ভিতরে আঘাত করিতে ছাড়িল না।

সেদিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শিবানী ভিজা চুল পিঠের উপর ছড়াইয়া দিয়া নিজের শয়ন-কক্ষে নদীর উপরকার জানালাটার কাছে বসিয়াছিল। এখানে অমূল্যের কোন ভারই তাহাকে লইতে হয় না। দাসী চাকর আত্মীয় আশ্রিতদের কোলে কোলে ঘুরিতেই তার মাটিতে পা পড়ে না। শিবানীর হাতে কোনো বিশেষ একটা কাজও নাই। সংসারের ছোট বড় শত কার্য্য শত দিকে ছড়ান রহিয়াছে, কত দিকে কত বিশৃঙ্খলা কত অপব্যয়, কিন্তু তার জন্য একটিও কাজ খালি ছিল না। সে যে কাজে

হাত দিতে যায়, চারিদিক হইতে মাসী, পিসী, দিদির দল বাঘিনীর মত ছুটিয়া আসিয়া হাত চাপিয়া ধরে, শুষ্ক চক্ষে জল আনিয়া জিভ কাটিয়া কান্নার সুরে বিনাইয়া বলিতে থাকে—"ওমা, তুমি কি দুঃখে কুটনো কুটবে মা? ওমা, আমার বিনুর বৌ আমি থাকতে পান সেজে হাত ময়লা করবে আর আমি তাই পোড়া চক্ষে বসে বসে দেখব?—ও আমার অভাগ্যির দশা!" শিবানীর আর কাজ করার প্রবৃত্তি থাকে না। এমনি করিয়া কোন একটা জায়গায় সে আপনার বিপর্য্যস্ত হৃদয়কে আবদ্ধ করিবার অবসর বা সাহায্য পর্য্যন্ত পাইতেছিল না। যেটাকে সে কাছে টানিতে যায়, সেইটাই যেন নদীস্রোতের বিপরীত মুখে চলিয়া গিয়া তাহার দিকে উপহাসের দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখে। কাজের মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করিয়া দিয়া যে একটি আত্মতৃপ্তি সে এতদিন উপভোগ করিয়া আসিয়াছিল, পূর্ব্বের কর্ম্মশ্রান্ত শরীরের পক্ষে মধ্যাহ্ন ও রজনীর বিরাম অবসরটুকু বেদনায় কল্পনায় প্রতীক্ষায় ও নিরাশায় যেরূপ বাঞ্ছনীয় ছিল, সেটুকু তার এই নূতন অবস্থা কাড়িয়া লইয়াছে। বন্ধনহীন দীর্ঘাবকাশের স্মৃতির দাহের কাছে সেই স্বল্পাবসর কত লোভনীয় শিবানী এখন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে।

বৃষ্টি থামার পর মেঘ কাটিয়া যাইতেছে, মহাজনী নৌকা ইট বোঝাই লইয়া অনিচ্ছুক গতিতে ও খেয়ার নৌকা দ্রুতগমনে গন্তব্য পথে চলিয়াছে। তাদের দাঁড়ের উত্থানপতনের শব্দ ও তটপ্রান্তে নিপতিত ভগ্ন তরঙ্গের অস্ফুট আর্ত্তনাদের সহিত গৃহস্থ-গৃহের সন্ধ্যার শঙ্খ-ধ্বনি মিলিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে বর্ষার বাতাস নদীতীরের বাঁধা ঘাট হইতে হুহু করিয়া ছুটিয়া আসিল। সেই সাড়ায় চমকিয়া শিবানী একবার মুখ তুলিল, সম্মুখের দেওয়ালে চওড়া ফ্রেমে আঁটা বিনোদকুমারের অপরিচিত বালকমূর্ত্তি অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া আসিয়াছে, হাঁফ ছাড়িয়া

সে আবার মুখ ফিরাইল। এখন আর সন্ধ্যা তাহাকে চকিত করিয়া প্রদীপের কাছে টানিয়া আনে না, সন্ধ্যা-শঙ্খ অভিমানে মৌন পড়িয়া থাকে।

এমন সময় দীপহস্তে সিদ্ধেশ্বরী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"ঢের ঢের চেহারা দেখেছি বাবা, এমন ধারা কিন্তু আমার বাপ চোদ্দপুরুষে কখন দেখে নি! মিন্‌সে কোন্ মুখ নিয়ে আবার ওকেলাতি করতে এলো গা?"

শিবানী যেন ঈষৎ চকিত হইয়া উঠিল—জিজ্ঞাসা করিল—"কে, মা?"

কন্যার এই অনুসন্ধিৎসায় সিদ্ধেশ্বরী উৎসাহিত হইয়া প্রসন্নভাবে কহিলেন—"হেমার শ্বশুর মিন্‌সে এয়েচে যে, তা জানিস্ নে? সেই অবধি বেই-এর কাছে হত্যে দিয়ে পড়ে আছে, ওঠবার নামটি নেই! কি যে সলাচ্চেন কলাচ্চেন, তা' কেষ্ট জানে! একে তো বুড়োর তা'দের উপরেই সাতটা প্রাণ—আমার গুঁড়োটুকু যেন ওর—"

শিবানী বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় মুহূর্ত্তে ফিরিয়া বলিল—"তিনি কি একলা এসেচেন মা?"

সিদ্ধেশ্বরী সাদা পাথরের টেবিলে তৈলদীপটা নামাইয়া রাখিয়া মুখ বাঁকাইয়া অপ্রসন্ন সুরে উত্তর করিলেন—"আপাতক একলাই বটে, তা বেশিক্ষণ আর একলা থাকচে না, মিন্‌সে আমাদের জন্মান্তরের শত্রু ছিল। তা' দেখ্ মা শিবু, একটা কাজ কর দেখিন্—তোর শ্বশুরকে গিয়ে বল, আমি ওদের সঙ্গে থাকতে পারব না—থাকতে হয় ওরা অন্য কোথাও থাকুক—

দীপ্ত সূর্য্যালোকের উপর মেঘ আসিয়া পড়িলে যেমন এক মুহূর্ত্তে ম্লান হইয়া যায়, শিবানীর মুখ তেমনি হইয়া গেল। মার কথা শেষ

হইবার পূর্ব্বেই ফিরিয়া উদ্ধতভাবে বলিল—"আমি বলবো না।" তার মুখের উপর ঘন লাল রঙের একটা তপ্ত শোণিতের উচ্ছ্বাস স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, দীপের আলোকে সিদ্ধেশ্বরীর নিকট তাহা অগোচর রহিল না। তিনি মনে মনে একটু ভয় পাইলেও হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া উঠিলেন, অথচ কন্যার এই আসন্ন ঝড়ের মত স্তব্ধ মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে তার জিদের বিরুদ্ধে লওয়াইতে চেষ্টা করা যে কত বড় দুঃসাধ্য তাহা বুঝিলেন, এ যে তাঁর চেনা! তিনি মনে মনে জ্বলিতে লাগিলেন, কিন্তু যাহা আর কখনও ঘটিতে দেখা যায় নাই, আজ তাহাই ঘটিল, এক মুহূর্ত্তে শিবানীর মুখের রং বদলাইয়া গেল, সে চকিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ব্যস্ত হইয়া বলিল—"রজনীবাবুর খাবার বন্দোবস্ত ক'রতে হ'বে তো মা! তাঁ'কে বোধ হয় খাওয়ান হয় নি?"

"কে' জানে, বাছা, আমার অত সাতকুটুমের খবর রাখবার রস পড়েনি, যা'দের পড়চে, তাঁ'রা করুক গিয়ে! আমি নিজের জ্বালায় বলে নিজেই জ্বলে মরচি—নেহাৎ সন্ধ্যাবেলায় 'বাড়ী বন্ধনে'র ভুকটি না করলে নয়, তা'ই এই শরীর নিয়েও মরতে মরতে আসি—বলি, কোন দিন আবার চোর ডাকাতে সর্ব্বস্থি লুটে নে' যা'বে!—থাকগে—যদ্দিন আছি কেউ বুঝুক, আর না বুঝুক, আমার কর্ম্ম তো আমি করি—তা'র পর যা'র কপালের যা লেখন আছে, সে ভুগবে। হরি হে দীনবন্ধু!"

সিদ্ধেশ্বরী গলায় অঞ্চলের প্রান্ত দিয়া নদীর দিকে মুখ করিয়া দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া নদীতীরস্থা সন্ধ্যাদেবীকে প্রণাম করিতে করিতে দেখিলেন শিবানী চলিয়া যাইতেছে। এক মুহূর্ত্তে সিদ্ধেশ্বরীর পায়ের তলা হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত রাগে ঝাঁ ঝাঁ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। হতভাগা মেয়ে তাঁর একটা সৎ পরামর্শ লইবে না—আবার উল্‌টিয়া বিশেষ করিয়াই তাঁর শত্রুপক্ষের সঙ্গেই আলাপ আপ্যায়ন করিবে? এ পেটের

শত্রুই তাঁর সব চাইতে যন্ত্রণার কারণ হইয়াছে। নিজের ভালো মন্দ নিজে যখন দেখিবে না, তখন মায়ের চেয়ে তো আর কেউ আপন হ'বে না, তা' সেই মাকেই তোর লাভ লোকসান ভাববার ভার দিয়ে যা বলি তা' চুপ করে মেনে নে—তা নয়!—যিটিতে নিজের ক্ষেতি হ'বে, সেইটিই যেন খুঁজে খুঁজে বার কর্ব্বে!—প্রকাশ্যে ক্রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিয়া বলিলেন—"শোন্ শিবানি! তোর ভাল যদি চাস্ এখনও বুঝে চল্, ওদের এ বাড়ীতে ঢোকবার পথ বন্ধ কর্, না হ'লে এখানে তোর থাকা হ'বে না, তা আমি এই দিব্বি গেলে বলে দিচ্চি—দেখে নিস্—"

শিবানী যাইতে যাইতে বিদ্যুৎবেগে ফিরিয়া দাঁড়াইল, তার দুই চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সে কঠিন স্বরে বলিল—"নাই বা হ'ল, আমি এ-বাড়ীতে স্থান চাই নে।"

আজন্ম ধরিয়া চিনিয়া আসিলেও শিবানীর আজিকার এই কয়টা কথায় সিদ্ধেশ্বরী একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন। এই ঘর-বাড়ী, এই দাসী-চাকর, এই বাগান-বাগিচা, সোনাদানা, রাজ-ঐশ্বর্য্য—সে এ সব চাহে না?—বলে কি শিবানী?—সে পাগল হইয়াছে? অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"সত্যি কি তুই তা'দের জন্যে পেটের ছেলেটাকে ফাঁকি দিতে চাস্ নাকি?" সংসারে যে এ রকম অনাসৃষ্টি বুদ্ধি থাকিতে পারে, সে কথা যেন তিনি এতখানি বয়সে আজ প্রথম জানিলেন।

শিবানী দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল—"হ্যাঁ।"

সিদ্ধেশ্বরী দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া গালে হাত দিলেন! এ মতের বিরুদ্ধে কোন যুক্তিতর্ক প্রযুক্ত হইতে পারে বলিয়া তাঁর আর আশা রহিল না। শিবানী নীরবে ঘর ছাড়িয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

মুখে যতখানি দেখাক্ ভিতরে ভিতরে শত্রু-নিপাতে যে সেও খুসী

না হইয়া পারে না—এমনি একটা বিশ্বাস সিদ্ধেশ্বরী এতদিন ত্যাগ করিতে পারেন নাই, কিন্তু আজ তাঁর সংশয় দূর হইল। সে যে জুয়াচোর রজনীনাথের জালে জড়াইয়া নিজের সর্ব্বনাশ করিয়া বসিবে, তার আহাম্মকিতে এই বাড়ী, এই ঘর, সমুদয় চুলচেরা করিয়া তাঁর অসহায় দুধের শিশুর সহিত ভাগ করিয়া লইয়া পোষ্যপুত্র হেমেন্দ্র আবার এখানে আসিয়া বসিবে, তাহা তিনি দিব্য দৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন, তখন যে সে একদিন কোন ছুতায় শিশুকে নিজের ঘরে লইয়া গিয়া তাহার গলাটি টিপিয়া মারিয়া আম-বাগানে ঐ ভাঙ্গা পাতকূয়াটার মধ্যে ফেলিয়া দিবে না, তাই বা কে বলিবে? এই কাঁড়ি কাঁড়ি পিতল-কাঁসার বাসন, সিন্দুক সিন্দুক শাল দোশালা, সোনারূপার বস্তা এ সবই তো তাঁর নিকট হইতে অর্দ্ধাঅর্দ্ধি ছিনাইয়া লইবে? এমন কি, রান্নাঘরের অমন কাঁঠাল কাঠের পিঁড়িগুলি পর্য্যন্ত ভাগের হাত এড়াইবে না—এ অত্যাচার অসহ্য! যে হতভাগারা বিনি অপরাধে তাঁর গরু মারিতে কোমর বাঁধিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে, তাদের কি ভাল হওয়া উচিত? ভাল হইবে? সিদ্ধেশ্বরী রাগে গস্ গস্ করিতে করিতে নীচে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, শিবানী রান্নাঘরে গিয়া কাহারও নিষেধ না মানিয়া নিজের হাতে মাছের কালিয়া রাঁধিতে বসিয়াছে। মাসীমা কহিলেন—"এত করে বারণ করলুম, কিছুতেই বৌমা শুনলেন না।—দেখ দেখি কি সাহস এই গরমে—"

সিদ্ধেশ্বরীর মুখ কালো হইয়া উঠিয়াছিল, ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন—"মরুক গে, পোড়া মেয়ে যাঁ'দের বাঁদিগিরি করতে জন্মেচেন করে মরুন! নেহাৎ মায়ের প্রাণ তা'ই ওর জন্যে শরীর পাত করে মরি—কুপুত্তুর হ'লেও তো কুমাতা হ'বার যো নেই—তা' অধম্মি মেয়ে একবার ভাবে? রাধা-মাধব, রাধা-মাধব!"

মাসীমা হরিনামের মালা ফিরাইতে ফিরাইতে সহানুভূতির স্বরে কহিলেন—"ও কথা আর বল কেন বে'ন, ঐ দুঃখেই মরে আছি! মনটা আমার এক রকম, কারু কষ্ট দেখলে চোখের জল সামলাতে পারি নে, ওই যে বলে—'আপন দুঃখ অসম্বরি, পরের দুঃখ সইতে নারি'—আমার হয়েছে তা'ই! তা' বে'ন ভাল কথা, আমায় আজ তোমার সেই জল-পড়াটি শিখিয়ে দাও না ভাই! বিধুর ছোট মেয়েটা বিকেল থেকে পেট কামড়ে খুন হয়ে যাচ্ছে, অমন গুণ তো কোন জ্যান্ত ওষুধেরও দেখতে পাই নে'। সেদিন কেষ্টা ছোঁড়াটার কি কান্নাটাই থামিয়ে দিলে!"

সিদ্ধেশ্বরীর মনের অবস্থা তখন মন্ত্রদানের উপযোগী না থাকিলেও মন্ত্র-মাহাত্ম্য শ্রবণে মনটা তাঁর হঠাৎ গলিয়া পড়িল। খুসী হইয়া কহিলেন—"তা' তোমায় শেখাতে পারি, বে"ন! কিন্তু যেন ছ'কান না হয় তা' হ'লে সব ব্যর্থ্য হবে, এ মন্তর কি অমনি পেয়েছি? আমার পিস্ শাশুড়ীর ননদের যা কত সাধ্যি সাধনায় তবে মরবার সময় আমায় দিয়ে গেছে। এ আর কেউ জানে না, এই তুমিই যা' আজ শুনে নিলে। কানের কাছে চুপি চুপি বল্‌তে হ'বে কেউ কোথা দিয়ে না শুনে ফেলে—

রাম লক্ষ্মণ সীতে যান কিষ্কিন্ধ্যের পথে,
সাথে নিলেন হনুমান আর সুগ্রীব মিতে;
সুগ্রীব বলেন, মিতে আমি মন্তর এক জানি,
পেটের ব্যথায় অব্যথা হয়ে যায় প্রাণী।

তিনবার মন্তর বলে জলে তিনটি ফুঁ দিয়ে ছেঁচতলায় দাঁড়িয়ে খাওয়াতে হ'বে, এ একেবারে অব্যর্থ্য বে'ন—অব্যর্থ্য!"

কোন কাজ করিব মনে করিলেই করিয়া বসা শিবানীর পক্ষে সহজ নয়। আকস্মিক উত্তেজনায় সে যে পথটা অবলম্বন করিয়াছে, সেটাকে যত সহজ ভাবিয়াছিল, দেখা গেল তত সহজ নয়।

কিন্তু কার্য্য শেষে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা তার বদ্ধ ওষ্ঠে নীরবে ফুটিয়া উঠিল। বাহিরে খবর পাঠাইয়া থালায় খাবার সাজাইতে লাগিল।

জলখাবারের আসনের কাছে দাঁড়াইয়া রজনীনাথ যখন প্রত্যাশাপূর্ণ উৎসুক নেত্রে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, তখন সে ঘরের অসম্পূর্ণতা তাঁহাকে প্রায় বিহ্বল করিয়া তুলিল, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে এক হাতে পাথরের গ্লাসে বরফ দেওয়া জল ও অপর হস্তে পুত্রের হাত ধরিয়া শিবানী প্রবেশ করিল। রজনীনাথ সস্নেহে তাদের দিকে চাহিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। যেখানটাকে মরুভূমি ভাবিয়া সন্দেহ জাগিয়াছিল, সেটা যদি হঠাৎ নদী-তীরের বালুকা বলিয়া জানা যায়, তৃষ্ণার্ত্ত যেমন স্বস্তির নিশ্বাস গ্রহণ করে, তাঁহারও সেইরূপ হইল। শিবানী জলের গ্লাস নামাইয়া রজনী-নাথের পায়ের কাছে প্রণাম করিল। ছেলেও মায়ের দেখাদেখি মাটিতে মাথা ঠুকিয়া দীর্ঘচ্ছন্দের প্রণাম করিয়া অভ্যাসমত এই অপরিচিতের সম্মুখে চুম্বনের দাবীতে মুখ বাড়াইয়া দিল। প্রণামের পরিবর্ত্তে চুম্বন গ্রহণ যে অকাট্য রীতি সে বিষয়ে তার সন্দেহ ছিল না। হাসিয়া রজনীনাথ বিনোদের পুত্রকে কোলে তুলিয়া লইলেন। তার মুখের ধরণ, গায়ের রং, চোখের দীপ্তি তাঁর স্মৃতিসাগর মথিত করিয়া আবার একটা নিশ্বাস বহিয়া আনিল। কিছুই ফুরায় না—পুরাতন নূতন হইয়া দেখা দেয় মাত্র! নিজের রেকাব হইতে ফল ও মিষ্টান্ন দিয়া শিশুকে বশ

করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ন্যায়পরায়ণ হাকিমের মত শিশু সে ঘুষের প্রলোভন সংবরণ করিয়া নিজের পাওনামাত্র মিটাইয়া লইয়া মার কাছে ফিরিয়া আসিল। রজনীনাথও তখন ভাল করিয়া সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন। এ কি! তপস্যাপরায়ণা উমার জীবন্ত যোগিনী মূর্ত্তি কো'নো সুনিপুণ চিত্রকর কি এখানে সাজাইয়া গিয়াছে? এই কি বিনোদ-কুমারের অনাদৃতা পত্নী? রজনীনাথ অত্যন্ত বিস্ময় অনুভব করিলেন। বিনোদকে তিনি জানিতেন। শুধু তার বাহিরটা নয়, অন্তঃপ্রকৃতির সহিতও তাঁর কিঞ্চিৎ পরিচয় ছিল, তা'ই তাঁর কল্পনায় যে ঈষৎ স্থূলাঙ্গী গৌরবর্ণা লজ্জা-সঙ্কুচিতা অশ্রুম্লানা নারীমূর্ত্তি কোন্ এক অজ্ঞাত সময়ে আপনা হইতে চিত্রিত হইয়া গিয়াছিল—অত্যন্ত অতর্কিতে এই নারীমূর্ত্তি তাহাকে ধিক্কারের সহিত বিদূরিত করিয়া পূর্ণ মহিমায় সেইখানে ফুটিয়া উঠিল। উৎকট আত্মগ্লানি অনুভব করিয়া এই স্বামী পরিত্যক্তা নারীর দিকে চাহিয়া রজনীনাথ তেমনি অনুশোচনায় মাথা নত করিলেন। এ তো উপেক্ষিতার মুখ নয়! এ দৃষ্টিতে নির্ভীকতা, আত্মনির্ভরশীলতা ও দৃঢ়তা সুস্পষ্ট। তিনি সবিস্ময়ে ভাবিলেন, তবে কি বিনোদ সাধারণ লোকেরই মত খেয়ালি যুবক মাত্র? তার চিত্ত যে পরিমাণে বিনোদের পরিত্যক্তা স্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ মমতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, সেই পরিমাণেই বিনোদের চরিত্রের লঘুতা তার প্রতি তাঁকে বীতশ্রদ্ধ করিল। এই স্ত্রীর মর্য্যাদা বুঝিল না, সে! শিবানী আপনার আনত নেত্র তুলিয়া ঈষৎ সঙ্কোচের সহিত কহিল—"আপনি খেতে বসলেন না?"

শিবানীর কথায় ও স্বরে রজনীনাথ একটু কুণ্ঠিত হইলেন; কিন্তু বিস্ময়বোধ করিলেন না, এই রকম সুরই যেন এ কণ্ঠে মানায়, অনুযোগ-পূর্ণ আদেশের স্বর! হাত' ধুইয়া রেকাবটা তিনি নিকটে টানিয়া ও তা'র পর একটু কি ভাবিয়া হঠাৎ মুখ তুলিয়া শিবানীর দিকে

চাহিয়া কহিলেন—"আমার ছোট মেয়ের তার দিদির কাছ থেকে ক্ষমা পেতে দেরি হয় নি, মা শিবানী ?"

শিবানী কখনও পিতৃস্নেহ জানিত না, শ্বশুরের নিকট আসিয়া সে তাঁর স্নেহোদ্বেলিত হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছিল কিন্তু সে স্নেহে সান্ত্বনা ছিল না। যেখানে অধিকারের অকুণ্ঠিত গর্ব্বে সে স্থান পায় নাই, সেখানে চোরের মত প্রবেশ করিয়া সে অপরাধ-কুণ্ঠিতা হইয়া আছে। পরের পূর্ণ অধিকারকে খর্ব্ব করায় সে নিজের মনে দারুণ আত্মগ্লানি অনুভব করিতেছিল, তাই এখানকার কোন পাওনাই তার বিবেক তাকে হাসিমুখে লইতে দেয় না, কিন্তু রজনীনাথের কথা কয়টা তাহাকে আজ অপ্রত্যাশিতরূপে চকিত করিয়া তুলিল। কে' জানে কেন সহসা তার সর্ব্ব শরীর কণ্টকিত করিয়া আনন্দের একটা তাড়িত শিরার ভিতর দিয়া বহিয়া গেল ও আচমকা কঠিন নেত্র অশ্রুজলের প্রবল উচ্ছ্বাসে স্পন্দিত হইয়া উঠিল।

শিবানী মুহূর্ত্তকাল স্থির থাকিয়া কম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিল—"তাকে কি আমি জানি নে, বাবা ? ঠাকুরপো আমার সঙ্গে বাস করতে ইচ্ছুক ন'ন, আপনি আমার একটা কিছু বন্দোবস্ত করে দিন, আমার জন্যে এত বড় সংসারটা না নষ্ট হয়ে যায়—"

শিবানী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আসিলেও সঙ্কোচ ও আত্মাভিমান তার মুখ চাপিয়া ধরিতে লাগিল, তার সমস্ত শরীরের ভিতরটা যেন হিম হইয়া আসিল, কিন্তু কোন বাধাই আজ সে মানিল না। শিবানীর কথাগুলা রজনীনাথের কানে একটু হেঁয়ালীর মত শুনাইল। কি এক অজানিত আশঙ্কায় চিত্ত স্পন্দিত হইল; ধীরে ধীরে শিবানীর দিকে ফিরিয়া সস্নেহ কণ্ঠে কহিলেন—"মা! জগতে ন্যায়, সত্য ও ভালবাসাই জয়ী হয়, অন্যায়ের প্রশ্রয় বা পুরস্কার বিধাতার হাতে কেউ

পায় নি, সে হইয়া রজনীনাথ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন—"কেন? গড়ে নেক!"

সে ব"এখানে শান্তি কোথায়? তারা তো কদিন হ'ল, আপনার কাছেই গেছে।"

রজনীনাথের বুকের ভিতরে ধক্ করিয়া একটা কঠিন ধাক্কা লাগিল, "সেকি! আমি যে তা'দের সেই রাত্রেই এখানে ফিরিয়ে পাঠিয়েছি, তারা আসে নি?"

রজনীনাথের বিলম্ব দেখিয়া ও নিজের মনের দুর্ব্বলতায় তাঁর প্রতি সমুচিত সমাদর দেখাইতে না পারায় অনুতপ্ত শ্যামাকান্ত তাঁহার অনুসন্ধানে আজ কয় দিন পরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, দ্বার হইতেই রজনীনাথের কথা কয়টা তাঁর কর্ণে প্রবেশ করিল, তিনি কম্পিতশ্বাসে বলিয়া উঠিলেন—"হরি! হরি!—কি করেছ রজনী! সে পাষণ্ড সকল আক্রোশ আমার মার উপরে মেটাবার জন্যে তাঁকে আটক করেছে—"

বৃদ্ধ হতাশ্বাসে কপাট ধরিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। বাসার কাছে আসিয়া পক্ষী-মাতা আপনার অসহায় শাবকগুলিকে অপহৃত দেখিলে এইরূপই নিরুপায় ক্ষোভে বুঝি লুটাইয়া পড়ে! শ্বশুরের আগমনে শিবানী আত্মসংবরণ করিয়া লইয়াছিল, মাথার কাপড় যথাস্থানে স্থাপন করিয়া রুক্ষ চুলগুলাকে অবহেলার সহিত হস্ত তাড়নায় বিতাড়িত করিয়া সে কম্পিতপদে উঠিয়া দাঁড়াইল। তার চিত্তের সমস্ত ব্যাকুলতা মুহূর্ত্ত মধ্যে জমাট নৈরাশ্যে পরিণত হইয়া কঠিন মুখে তাহাকে ধিক্কার দিল।

অমূল্য ব্যাপার কিছু না বুঝিলেও মায়ের কাপড়ের একটা প্রান্ত শক্ত করিয়া ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া সকলকার মুখের দিকে এক একবার চাহিয়া দেখিতে লাগিল, তার প্রতি সকলকার এতটা অবহেলার ভাব

বড় একটা ভাল লাগিতেছিল না, সকলকার মুখেই যেন একটা আসন্ন ঝড়ের চিহ্ন। অভিমানে তার রাঙ্গা ঠোঁট ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। রজনীনাথ শিশুর নিকটে আসিয়া আদর করিয়া বলিলেন—"এস দাদা! আমরা বাইরে যাই, ঘরে তোমার গরম হচ্ছে!" বলিয়াই তার সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া তাকে কোলে তুলিয়া অগ্রসর হইতে হইতে শ্যামাকান্তের দিকে না ফিরিয়াই কহিলেন—"আসুন চৌধুরীমশাই। ভাইটিকে নিয়ে একটু খেলা করা যাক্—"

শিবানী ও শ্যামাকান্ত উভয়েই সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন।

সকলে চলিয়া গেলে ঝড়ের মত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সিদ্ধেশ্বরী সক্রোধে কন্যাকে বলিয়া উঠিলেন—"হ্যাঁ লা শিবি! তোর জ্বালায় কি আমি গলায় দড়ি দেব না কি লা? বলি এই কি তোর বুদ্ধি? এতদিন ধরে যে এত শেখানু পড়ানু, তার কি এই প্রিতিফল দিলি?"

শিবানী চোখ তুলিয়া দৃঢ় স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"কি করেছি?"

"কি করিস্ নে', তাই বল? মিন্‌সেকে অত আপ্যায়িত করে তোর কি লাভ হলো বল দেখি? শত্তুর গেছে—সাতটা সরষে দে' গঙ্গাচ্চান করে আসবি—তা' না মেয়ের যেন সপ্ত সিন্ধু উথ্‌লে উঠেছে! দেখ্ ও সব অ-সইরণ আমি:সইতে পার্ব্বো না।—এখন ছেলে যে ডাইনের হাতে পড়লো তার হুঁস আছে? যা—শীগ্‌গির গিয়ে ছেলেকে চেয়ে আনা, যদি ছেলে বাঁচাতে চাস্ তো ওঠ।

শিবানী পা দিয়া মাটি চাপিয়া কঠিনভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল, তার শীতল হাত ও পায়ের তলা আগুন হইয়া উঠিয়াছিল, কঠিন কণ্ঠে কহিল—"না, ছেলে চেয়ে আনাব না—কেন—তুমি অমন করে কেবল কেবল ওদের অপমান কর? কেন তুমি—কেন তুমি ও সব কথা বল? আমিও আর সইবো না।"

বলিতে বলিতে সহসা সে রুদ্ধবাক হইয়া দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল, সিদ্ধেশ্বরী অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।—শ্রীহরি! এত করিয়াও তিনি মেয়ের মন পাইলেন না? এমন বোকা একগুঁয়ে মেয়েও গর্ভে ধরিয়াছিলেন? একেই বলে—"যার বে' তার মনে নেই, পাড়াপড়্সির ঘুম নেই। চুলোয় যা'ক!—তোর যদি পেটের পো'র উপর দরদ নেই তবে আমারই বা কিসের?—আমার তোরা কি করবি? ব'লে, 'বড় কল্লেন পেটের পো, আর কর্ব্বেন নাতি!' আমার যা আছে, তাই থায় কে তার ঠিক নেই! হরি বল মন."—অভুক্ত আহার্য্য পাত্রটার দিকে চোথ পড়ায় এবং বারান্দায় মাসীর গলার সাড়া পাইয়া তাঁহাকে শুনাইয়া বলিলেন—"মিন্‌সের দেমাক দেথোচো? মেয়েটা এতথানি থেটে-খুটে নিজের হাতে থাবার তৈরি করলে, একটু খুঁটেও মুথে দিয়ে দেখলে না। এ হিংসে—শুধু হিংসে!—পোড়া মেয়ে ওদের জন্তেই দুঃথে মরে যাচ্চেন!"

মাসীমা শুচিতা রক্ষাপূর্ব্বক এক হাতে হরিনামের মালা ও অন্য হাতে বস্ত্রপ্রান্ত ধরিয়া উঁকি দিয়া ঘরের মধ্যে চাহিয়া দেখিয়া একটু ম্লান হাসি হাসিয়া কহিলেন—"কলকেতার লোকেদের বে'ন, ধরণই ঐ!"

তাঁহার মনে পড়িল, এই ঘরেই রজনীনাথকে তিনি নিজে কাছে বসিয়া কত যত্ন করিয়া থাওয়াইয়াছেন, তাঁর পুরানো কালের রসিকতায় যোগ না দিয়া রজনীনাথ কুণ্ঠিত হইলে বে-রসিক বলিয়া সেদিনও তিনি কত উপহাস করিয়াছেন, আপনার রন্ধনের সুখ্যাতি শুনিবার জন্য—'তোমার থাবার কষ্ট হ'ল, যে ছাই রান্না—থাবে কি করে'—বলিয়া নানা ছলে অজস্র প্রশংসা লাভ করিয়া মন খুলিয়া সার্টিফিকেট দিয়াছেন, "থাইয়ে এমন সুথ কিন্তু কারুকে হয় না!"

আজ সঙ্গে সঙ্গেই সেই রজনীনাথের রুচি হইতে চরিত্র পর্য্যন্ত

মসীলিপ্ত করিবার পক্ষে সাক্ষ্য দিতে তাঁহার মনেও একটু বিঁধিল—তাই ঠিক সায় দিয়া যাইতে পারিলেন না।

সেদিন 'বাড়ী বন্ধনে'র মন্ত্রটি মাসীমার পরিবর্ত্তে মামীকে শিখাইবার প্রতিজ্ঞা করিয়া সিদ্ধেশ্বরী অপ্রসন্ন নীরস মুখে সন্ধ্যা করিবার জন্য ঠাকুর-ঘরে যাইবার সময় তুলসীতলায় প্রণাম করিয়া কন্যার মতিগতি পরি-বর্ত্তনের মূল্যস্বরূপ এককালীন সওয়া পাঁচ টাকার হরির লুট তুলসী ঠাকুরকে মানত করিয়া গেলেন। নিজের দ্বারা যাহা সাধন করা যায় না, মানুষমাত্রেই সেখানে দেবতার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া থাকে। সিদ্ধেশ্বরী এতখানি বয়সের অশ্রান্ত চেষ্টা দ্বারাও যখন একচোখো জিদী মেয়েকে আয়ত্তগত করিতে পারিলেন না, তখন আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারাইয়া অসহায়ভাবে দেবতার শরণাপন্না হইয়া মাথা খুঁড়িতে খুঁড়িতে বলিতে লাগিলেন—"দেখি তুমি কত বড় জাগ্রত ঠাকুর! ওর যাতে সংসারের উপর টান হয়, সুবুদ্ধি জন্মায় তাই কর ঠাকুর! তাই কর।"

৩১

নদীটি নিতান্ত সঙ্কীর্ণ না হইলেও তেমন বেশি চওড়া নয়। বর্ষায় পাহাড়ে ঢল নামিয়া যতটা পূর্ণ দেখায়—শীতের প্রারম্ভে অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়া দু'ধারের তীরে নুড়ি, শামুক ও বালি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তকতকে জলের নীচে বাতাসের হিল্লোলে জলের সঙ্গে নুড়িগুলিও কাঁপিয়া উঠিতেছে, তীরে মৃদু ঢেউ ক্রীড়াচ্ছলে আঘাত করিতে করিতে অস্ফুট-বাক্-শিশুর মত আধ আধ

কণ্ঠে কতই সোহাগের কাকলী তুলিতেছে। স্নেহময়ী মার মত জননী ধরিত্রী কখনও সন্তান্তের আদরের আলিঙ্গন, কখনও অভিমানের ক্রন্দন, কখনও ক্রোধের নিষ্ফল তাড়না—অচঞ্চল হাসিমুখে চিরদিন ধরিয়াই গ্রহণ করিতেছেন।—বিকার নাই, বিরাগ নাই, মাতৃস্নেহের মতই তাহা অকুণ্ঠিত সহিষ্ণুতাপূর্ণ ও দ্বিধাহীন। মা! জননীর জননী! তোমার ঐ নীরব স্নেহধারায় অভিষিক্ত হইয়া আমরা পলে পলে কতখানি যে গ্রহণ করিতেছি তার কতটুকুই বা ভাবিয়া দেখি মা! মাতৃস্তন্য যেমন সন্তানের মুখে দুগ্ধদান করিয়াই তৃপ্ত, তুমিও তেমনি শুধু দিয়াই আসিয়াছ, ডাকিয়া জানাও নাই, চাহিবার প্রতীক্ষা কর নাই।

নদীর নাম বিরূপাক্ষী।—বিরূপাক্ষীর পূর্ব্বতীরে একটি নূতন বাঁধান ঘাটের উপর আম্র পনস নারিকেল তাল প্রভৃতি ঘন-বিন্যস্ত বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়া একটি দোতালা বাড়ী দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বে এইখানে নীলকুঠি ছিল, তারপর নীল আন্দোলনের ফলে যত না হোক রংয়ের প্রতিযোগিতায় বাঙ্গালা দেশ হইতে নীলের চাষ উঠিয়া গেলে—সাহেব কুঠি তুলিয়া দেন। সেই পর্য্যন্ত ইহা পরিত্যক্ত। বাগানটা জঙ্গলে ও বাড়ীটা ভগ্নস্তূপে পরিণত হইবার যখন অধিক বিলম্ব ছিল না, সেই সময়ে বিরূপাক্ষীর যাত্রিগণ নৌকা হইতে সকৌতূহলে চাহিয়া দেখিল, বাড়ীখানা দেখিতে দেখিতে নূতনভাবে তৈরী এবং জঙ্গল কাটিয়া দিয়া একটি ফল ফুলের বাগান গড়িয়া উঠিল। নদীতে বর্ষা ভিন্ন নৌকাও বেশি চলে না, কিন্তু যারা যাতায়াত করে—সবিস্ময়ে নব নির্ম্মিত উদ্যানে ক্রীড়াপরায়ণ বালকগুলির দিকে চাহিয়া দেখে। ছেলেরা নিজের হাতে মাটী নিড়ায়, নিজের হাতে গাছে গাছে জল ঢালে, নিজেরাই গাছ কাটে, গাছ বসায় আবার ফুল তুলিয়া মালাও

গাঁথে, লাফাইয়া, খেলিয়া, হাসি কথার স্রোত বহাইয়া নির্জ্জন নদীতটে স্বপ্নরাজ্য রচনা করিয়া উপকথার পরীবালকদিগের মত বিচরণ করিয়া ফিরে। নিজ্জীব রোগক্লিষ্ট বালকেরা ম্লান পাণ্ডুর মুখে তাদের দিকে চাহিয়া ভাবে, এরা কি আরব্য উপন্যাসের মধ্য হইতে বাহির হইয়াছে? মৃত্তিকা কলসে জল আহরণ বেড়া বাঁধা হইতে সমকণ্ঠে সন্ধ্যা-বন্দনা, সংস্কৃত শ্লোকাবৃত্তি মুগ্ধ যাত্রিগণকে বিস্মিত নেত্রে প্রাচীনকালের পুণ্যাশ্রমবাসী ঋষিকুমারগণের সৌম্য সুন্দর তরুণ মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া তুলিত।

নিকটে লোকাবাস নাই, কয়েকটা শস্য ক্ষেত্র পার হইলে গ্রামের সীমানা চোখে পড়ে ও জনরব শোনা যায়। সকালে সন্ধ্যায় বিরূপাক্ষের নির্জ্জন তট—হাসি, কাশি, কলহ বা ইষ্টমন্ত্র পঠনের ক্ষুদ্র বৃহৎ শব্দ জালে মুখরিত হইতে থাকে। গ্রাম্য শিশুদের বাহু-তাড়িত ঘুমন্ত তরঙ্গ-শিশু ছলছল কলকল শব্দে হাসিয়া কাঁদিয়া উছলিয়া পড়ে, সুন্দরীর সুন্দর প্রতিবিম্ব বক্ষে ধরিয়া কৃতজ্ঞতা স্বরূপ শীতলতা দানে পরিতৃপ্ত করে, বৃদ্ধার ঐকান্তিক ভক্তির জলাঞ্জলি ইষ্ট দেবতার চরণে পৌছাইয়া দেয়।

তারপর নদীতীরের গাছগুলি যখন দীর্ঘচ্ছায়া জলে ফেলিয়া ক্লান্ত শ্বাস ফেলিতে থাকে এবং আমবাগানের পার্শ্বস্থ বাঁশঝাড়ের মাঝে মাঝে নিমগাছের ছায়াবহুল বন শাখাপল্লবের শীতল অঙ্ক দিয়া, বটফল বিছানো শেফালিকা-ছড়ানো আঁকাবাঁকা পথ ধরিয়া রূপার পৈঁচে থাড়ু কলসীর গায়ে বাজাইয়া সিক্তবসনা হাস্যাধরা গ্রাম্যবধূগণ পরস্পরের সুখদুঃখের আলোচনা করিতে করিতে গ্রামে ফিরিয়া যায় ও গ্রামের কৃষাণের দল কাঁচা লঙ্কা ও লবণের সাহায্যে বাসীভাতে উদর পূর্ণ করিয়া প্রফুল্লচিত্তে বাগানের উত্তর দিকে ফিরিয়া মেঠো সুর হাঁকিয়া ক্ষেতের পথ ধরে সেই সময় হইতেই এই নির্জ্জন নদীতীর, যোগাশ্রমের মত নিস্তব্ধ হয়।

নিঃশব্দ প্রকৃতি তার করুণ চক্ষুদুটির পাতা মুদিয়া বিশ্রাম শয়নে যেন নিশ্চিন্তচিত্তা বালিকার মত ঘুমাইয়া থাকেন, রৌদ্রতপ্ত বাতাস নিবিড় বৃক্ষচ্ছায়ায় স্নিগ্ধ হইয়া ললাটে মৃদু মৃদু হাত বুলাইতে থাকে, দূর শস্যক্ষেত্র বা ছায়া-নিবিড় বটবৃক্ষতলস্থ বিশ্রাম শয্যা হইতে কচিৎ কোন পরিচিত রাগিণীর একটি চরণ আকুল করুণ সুরে ভাসিয়া আসিতে থাকিলেও সে বিশ্রাম সুখের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় না। শ্যামল লতা-গুল্মের ফাঁকে ফাঁকে সূর্য্যালোক ঝিলমিল করিয়া সকৌতুকে উঁকি দিয়া রাঙ্গামুখে চাহিয়া সরিয়া যায়। কোণের মধ্যে লুকাইয়া পাখীরা কূজন করিয়া উঠিলে বাতাস ঈষৎ চঞ্চল হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাসে তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া আবার নিজের সস্নেহ পরিচর্য্যা গ্রহণান্তর ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতে থাকে। কোলের ছেলেটিকে ঘুম পাড়াইয়া মা যেমন সতর্ক স্নেহে সজাগ থাকেন, সেও যেন তেমনি স্নেহভরে জাগিয়া মাথার কাছে বসিয়া আছে, কোথাও একটা সাড়া পাইলে নিশ্বাস টানিয়া উৎকর্ণ হইয়া ফিরিয়া চাহে ও নিঃশব্দে তর্জ্জনী তুলিয়া নিবারণ করে।

কিন্তু দ্বিপ্রহরের নিস্তব্ধ প্রকৃতির বিশ্রাম-সুখ অব্যাহত রাখিয়া ও সেই শান্ত তপোবনমধ্যস্থ গৃহ হইতে একটি অস্ফুট শব্দলহরী তার স্তব্ধতার কেন্দ্রে কেন্দ্রে প্রতিধ্বনিত হইয়া সুদূর মধুচক্রে মধুমক্ষিকার গুঞ্জনের মতই একটা মৃদুতানযুক্ত শব্দ বহন করিয়া আনে। শিশুকণ্ঠের অস্পষ্ট আবৃত্তি হইতে বিভিন্ন ভাষার সুস্পষ্ট উচ্চারণ আবার একবার সেই পুরাকালের স্মৃতি জাগাইয়া দেয়—সে শব্দ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার—এই বাড়ী একটি স্কুলবাড়ী বা স্কুল-বোর্ডিং।

অপরাহ্ণের ক্ষীণ ছায়া দূরে সরাইয়া হীনতেজা সূর্য্যকিরণ দেওয়ালের উপর হইতে সরিয়া সরিয়া ক্রমে ছাদের আলিসার উপর—আরও দূরে—অবশেষে নদীতীরের উচ্চশীর্ষ নারিকেল গাছের মাথার উপর হইতে

নদীর শীতল স্থির জলের উপর ছায়া ফেলিয়া ওপারের বিস্তীর্ণ বালুকা-তীরে ছড়াইয়া পড়ে, কিছু জল রৌপ্যময় করিয়া তীরের নুড়িপাথর, ভাঙ্গা পাত্র ও বালুকাকণায় সেই রশ্মি হীরকখণ্ডবৎ জ্বলিতে থাকে, নদীজলের একভাগে ভাসমান সাদা মেঘে সূর্য্যালোকের লাল ছায়া প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠে, কোথাও নীল আকাশের সৌম্যতা স্থির হইয়া নীল জলে মিশিয়া যায়, শীত-সায়াহ্নের অন্ধকার এপারের গাছপালাকে কাছে টানিয়া আঁচলে ঢাকিয়া ঘুম পাড়াইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিতে থাকে।

সেদিন স্কুলের ছাত্রগণের মধ্যে সকলের ছোটরা মিলিয়া তাদের পণ্ডিত মশাইকে বুড়ি করিয়া লুকোচুরি খেলিতেছিল, কয়েকজন বালক একদলে এবং যুবক-ছাত্র ও মাষ্টার কয়জন ফুটবল খেলিবার জন্য সমবেত হইয়াছিল, একদিকে কয়েকটি বালক কপিচারায় জল দান ও ঘাস নিড়াইয়া দিতে দিতে বৃক্ষতত্ত্ব ও কৃষিবিজ্ঞান সম্বন্ধে একজন মাষ্টারের সঙ্গে আলোচনা করিতেছিল, সকলেই কোন না কোন কার্য্যে নিযুক্ত, উৎসাহে প্রফুল্ল এবং কর্ত্তব্যের নিয়ম-শৃঙ্খলাপূর্ণ শাসনে সংযত। কেবল রুগ্ন-সুধীর একটি কাঠের বেঞ্চে বসিয়া বিষণ্ণমুখে সব দেখিতেছিল, সে বহুদিন ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া জ্বরগায়েই আসিয়াছে, ভাল চিকিৎসায় প্লীহা যকৃতের বৃহৎ আয়তন ঈষৎ হ্রস্ব হইলেও এখনও শরীর সারে নাই। উদ্দীপনাপূর্ণ মুখগুলি তার নিরুদ্যম হৃদয়কে ভবিষ্যতের সঞ্চয় দান করিলেও বর্ত্তমানকে সমধিক নিরানন্দ করিয়াছে। চারিপাশের কর্ম্মপ্রবাহের মধ্যে সে একা কর্ম্মহীন।

গাছে জল দেওয়া হইয়া গেল। ওদিকে গ্রাউণ্ডে একটা 'গোল' হইয়া হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছিল, সেটাও থামিয়াছে। ননী 'চোর' হইয়া রাগিয়াছিল, বুড়ি তাদের সে কোন্দলেরও সামঞ্জস্য করিয়া দিয়াছেন;

ঠিক হইয়া গিয়াছে, ননী কাপুরুষের মত পলাইয়া আত্মরক্ষা না করিয়া সম্মুখ বিচারে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিবে।

দুই একটি ক্রীড়াশ্রান্ত বালক নূতন দলের উপর ভার দিয়া ক্রীড়াস্থল ত্যাগ করিয়া একটু দূরে একখানা বেঞ্চের উপর আসিয়া বসিল, নলিন অন্য একজনকে প্রশ্ন করিল—"গুরুদেবকে যে দেখচি না?" নলিন 'গুরুদেব' বলার লোভটুকু দমন করিতে পারে না, তার গুরুদেবের অপছন্দ সত্বেও এই শব্দটার প্রচলন করিয়া তুলিয়াছে।

সতীশ বলিল—"আজ স্বামীজী এসেচেন যে।"

এমন সময় চশমা পরা একজন তরুণ মাষ্টার ও তাঁহারই প্রায় সমবয়স্ক একটি ছাত্র আসিয়া উত্তেজিতকণ্ঠে প্রশ্ন করিয়া উঠিল—"বল তো নলিন! কুরপ্যাটকিনের চেয়ে অ্যাডমিরাল টোগো বড়টা কিসে? ওরা আজ হেরে গেছে বলে কি বীরের অসম্মান করতে হ'বে? এ, আপনার নেহাৎ পক্ষপাতিত্ব স্যার!"

মাষ্টার আর একটু গলা চড়াইয়া কহিলেন—"Oh no, sir, no! শুধু তর্ক করলেই হ'বে না, প্রমাণ করা চাই—কুরপ্যাটকিন্ কিসে অ্যাডমিরাল টোগোর চাইতে বড়?"

বাড়ীখানার দরজার একপাশে সাদা পাথরের গায় ঘন কালো অক্ষরে লেখা—'আশ্রম', আশ্রমের পশ্চাতে বাগানের শেষ প্রান্তে পেয়ারা জামরুল ও লিচু গাছের মধ্যে একটি সুপরিচ্ছন্ন পর্ণ কুটীর; সেই কুটীরে ছেলেদের কথিত "স্বামীজী" আসিলে বাস করেন। তকতকে মাটির দাওয়ায় মৃগচর্ম্মে উপবিষ্ট সন্ন্যাসীর নিকট কম্বলের আসনে শিষ্য বসিয়া। বাঁশের খুঁটি জড়াইয়া মালতী ও ঝুমকাফুল গোলপাতার চালে উঠিয়া সবটাই প্রায় ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। মাটির দেওয়াল লতাজালে জড়িত হওয়ায় ছবির মত দেখাইতেছে।

শীতের স্বল্পায়ু সূর্য্যকিরণ শাখা-নিবিড় বৃক্ষান্তরাল দিয়া সাদরে গুরুশিষ্যের অঙ্গ বেষ্টন করিয়াছে। গাছে গাছে বুলবুল, পাপিয়া, চড়াই, টিয়া পাখীরা আনন্দ কলরব করিতেছে, একটি চক্রবাক মিথুন নদীতীরে বোধ করি সারা রজনীর আসন্ন বিচ্ছেদাশঙ্কায় মৌন বিষাদে মুখোমুখি বসিয়া আছে। মাছরাঙ্গা ও বকগুলা শিকারের চেষ্টায় জলের মধ্যে পা ডুবাইয়া উৎসুক নেত্রে চাহিতেছে—সংসার কর্ম্মক্ষেত্রের প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রাণী প্রতিনিয়ত কর্ম্মকেন্দ্রের চারি দিকে ঘুরিতেছে—কোথাও কেহ কর্ম্মহীন নয়।

শিষ্য কিছুক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া সেই সমস্ত দেখিল, তা'র পর ফিরিয়া চাহিল, কহিল—"তবে কি কর্ম্মযোগই প্রধান ও গৃহস্থাশ্রমই শ্রেষ্ঠ আশ্রম বলছেন?"

গুরু কহিলেন—"ধারণা তাই।"

"মার্জ্জনা করবেন—তা'ই যখন ধারণা, তবে কেন এ পথে এলেন?"

সন্ন্যাসী একটু হাসিয়া বলিলেন—"কর্ম্মের প্রেরণায়! সওয়াল করো না। কর্ম্মসৎ সূক্ষ্মগতিই সে কখন্ কাকে কোন্ পথে টেনে নিয়ে যায় তা সে নিজেও জানে না। তবে মহাজনদের নির্দ্দেশই আমরা মানতে পারি।"

"সে উপদেশ তো—'শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ, মা কুরু যত্নং বিগ্রহ সন্ধৌ'—তা' তো আপনি বলচেন না!"

"নীরদ! তুমি যে ভুল পথ ধরেছ! তোমার যাবা'র দরকার সীমলে পাহাড়, তুমি পঞ্জাব মেলে না চড়ে চড়লে মাদ্রাজ মেলে। সে তোমার গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দিতে পারে না তা' নয়, কিন্তু বিস্তর ঘুরিয়ে ও সময়ক্ষেপ করিয়ে তবে। ভেবে দেখ নি—অগত্যা যতটা এগিয়েছ, সেইখান থেকে ফিরে পঞ্জাব মেল ধরাই ভাল না?—তোমাদের মহাজন তো ভগবান্ শঙ্কর নন্? রামচন্দ্রই হিন্দু গৃহস্থের আদর্শ।"

শিষ্য ঈষৎ চমকিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া কণ্ঠোত্থিত দীর্ঘ-শ্বাস অল্পে অল্পে মোচন পূর্ব্বক আত্মগত ভাবে বলিল—"রামচন্দ্র, পিতৃবৎসল—পত্নী প্রেমিক—গুরুদেব! যে পথে মুক্তিমার্গে পৌছুতেই শত বাধা, সেই পথকেই বলচেন সোজা পথ?"

গুরু হাসিয়া বলিলেন—"বিশ্বামিত্র ভরত ও রামচন্দ্র দু'জনকেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন—একটা পথ বিপদসঙ্কুল—কিন্তু সেই পথেই শীঘ্র পৌছান যায়, আর একটা নিরাপদ পথ আছে সেটায় অত্যন্ত বিলম্ব হ'বে। ভরত কি বলেছিলেন জান?" একটু থামিয়া আবার বলিলেন—"নীরদকুমার! মনে কর তুমি আমি সকলেই আমরা সংসারত্যাগী হয়ে এই বিরূপাক্ষের দুই তীরে যোগাসনে বসে রইলাম, আমাদের আহার যোগাবে কে? তখন যদি ধার্ম্মিক গৃহস্থ আমাদের খেতে না দেন—সাধন, ভজন, যোগ, উপাসনা নদীগর্ভে বিসর্জ্জন দিয়ে খাবার খুঁজতে ছুটতে হবে না? যে নিজে নিষ্কাম থেকে অন্যের ধর্ম্মের সহায় হয়, সে বড়, না যে অন্যের উপর ভার চাপিয়ে নিজের ভাবনা নিয়ে থাকে সে বড়?"

শিষ্য ভাবিতে লাগিল, কথা কহিল না।

গুরু কহিলেন—"নিজেরই উদাহরণ দিই—পূর্ব্বে আমি দশজনকে অন্ন দিতাম, নিজের সঙ্গে অন্য পাঁচজন আত্মীয়-স্বজনেরও জীবনোপায় করতাম, কিন্তু এখন? নিজের আহার বন্ধ হয় নি, অন্যে সেটা যোগাচ্ছে, কিন্তু অন্যের জন্য কর্ব্বার যেটুকু ক্ষমতা ছিল সেইটুকুই ত্যাগ করেছি। —ধার্ম্মিক গৃহীই যথার্থ ত্যাগী। সে যা করে, অপরের জন্য করে। অন্ততঃ পিতা মাতা পত্নী পুত্র আত্মীয় পর—কা'রও না কা'রও জন্য করে—কিন্তু সন্ন্যাসী যাই করে সে কেবল নিজের জন্য!—গৃহীর ধর্ম্মই কি বড় নয়?"

নীরদ কুণ্ঠিত ভাবে কহিল—"কিন্তু সে রকম কর্ম্মযোগী গৃহস্থ এখন আর কি আছে?"

গুরু বাধা দিলেন—"অনেক—কিন্তু সংখ্যা হ্রাস হচ্চে বলে কি আদর্শকে ছোট করতে হ'বে? সন্ন্যাসী দ্বারা জাতি গঠিত হয় না। যে দেশ ধ্বংসের মুখে পড়েছে সে দেশে এখন কর্ম্মযোগই প্রধান—কর্ম্ম ভিন্ন রক্ষা পাবার দ্বিতীয় পন্থা নেই—শুদ্ধ চিত্তে পবিত্র কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠানের দ্বারা ভবিষ্যদ্বংশ স্থাপনের জন্য একনিষ্ঠ হয়ে 'বীজরক্ষায়' যত্নবান হতে হবে। এই এ যুগের তপ।—আর যদি যথাযথভাবে এই মহা সাধনা করা হয় তবে এতেই সেই পরম পদও প্রাপ্তি ঘটে। ভগবান, নিজেই বলেছেন, কর্ম্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাস পাওয়া অসম্ভব।"

আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা বহুক্ষণ নীরব রহিল। ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া অবশেষে দিনান্তের শেষ আলো শীত শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নাজড়িত ম্লান কুহেলিকায় মিলাইয়া গেল। বারান্দার সম্মুখে শুক্লা ও তৃতীয়ার চাঁদ কুয়াশার জাল ভেদ করিয়া অন্ধকার বনানীর ওপার হইতে ভাসিয়া উঠিল, শীতের হাওয়া ঝির ঝির করিয়া স্তব্ধ স্থির গাছের পাতা কাঁপাইতে লাগিল, পল্লীবধূগণের ওষ্ঠপূত মঙ্গল শঙ্খ থামিয়া গেল। আগ্রহ ব্যাকুল কণ্ঠে নীরদ জিজ্ঞাসা করিল—"যদি আমি আমার কর্ত্তব্যপালন করতে গিয়ে অন্যের ক্ষতি করে ফেলি?"

"রামচন্দ্র বনবাসে যাবার সময় পরিজনের শোকদর্শনে কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হন নি। নিজের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর পরিবর্জ্জনে রাজকর্ত্তব্য পালন করেছিলেন নীরদকুমার! যা'র দেশে কর্ত্তব্যের এমন উজ্জ্বল চিত্র বর্ত্তমান, সে কোন্ দুঃখে সন্দেহ পোষণ করে কষ্ট পায়? তোমাদের আধুনিক শিক্ষা তোমাদের যে রকম 'ত্যাগে'র দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছেন, প্রাচীন ভারত তা' বর্জ্জন করতে শিখিয়েছিলেন, প্রাচ্য প্রতীচ্যের প্রভেদই এই!

কর্ত্তব্য ত্যাগ করে যত বড় ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাও, সে ত্যাগ 'ত্যাগ' বলে অভিহিত হ'তে পারে না, সে মোহ। তুমি সত্য সন্ন্যাস গ্রহণ করতে চাও?"

লজ্জাবিজড়িত স্বরে উত্তর হইল—"সাধ ছিল।"

"সন্ন্যাস শব্দের অর্থ জানো নীরদ?—সম্যক্‌রূপে ন্যাস অর্থাৎ ত্যাগ করার নাম সন্ন্যাস—সন্ন্যাস গ্রহণ কালে কি প্রতিজ্ঞা করতে হয় জান? সন্ন্যাস ব্রত যে কায়মনোবাক্যে পালন করতে না পারে তা'র স্থান কোথায় নীরদ?

নীরদকুমার অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, অস্থির কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"আপনার সন্ধ্যা বন্দনার সময় চলে যাচ্ছে, বিদায় নিই।" প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় দিল এবং গুরুর আশীর্ব্বাদ শেষ হইবার পূর্ব্বেই দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

সন্ন্যাসী ঈষৎ বিস্ময়ে বারেক চাহিয়াই গৃহ প্রবিষ্ট হইলেন।

নীরদকুমার অনেকক্ষণ দক্ষিণের খোলা বারান্দায় পদচারণ করিয়া বেড়াইল, অনেকদিন পরে আজ আবার তার স্মৃতি-সাগরের তলদেশ পর্য্যন্ত আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে। তার বৈচিত্র্যময় জীবন-নাটিকা অঙ্কের পর অঙ্ক অভিনীত হইতে হইতে আজ এমন একটি সমস্যাপূর্ণ স্থানে পৌছিয়াছে যে এখানে আটকাইয়া থাকা বা পাশ কাটানো সম্ভব নয়। মহাসমুদ্রে যে ভেলা ইচ্ছাস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল, আজ হঠাৎ চড়ায় ঠেকিয়াছে। সে তো সারাজীবনই ভাসিতে সম্মত ছিল, কিন্তু যে কঠিন শাসন হস্ত—তার বাহু ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছে, যে অদৃশ্য শক্তি অলক্ষ্যে থাকিয়া তাকে তীব্রবেগে বিপরীত মুখে ফিরাইতে চাহিতেছে, সেই কঠিন হস্ত তার অলঙ্ঘ্য অঙ্গুলী সঙ্কেতে যে পথ নির্দ্দেশ করিতেছে, সে প্রকৃতির বিরুদ্ধে, এমন কি নিজের বিবেকের

বিরুদ্ধেও এতদিন প্রাণপণ বলে যুঝিয়া আসিতেছিল, পরাজিত হইয়াও পরাজয় স্বীকার করে নাই। ক্ষত-বিক্ষত শোণিতাক্ত হৃদয়—হোমকুণ্ডের অনল শিখায় আহুতি দিয়া সে ভাবিয়াছিল, তার সারাজীবনের বুঝি পূজা শেষ হইয়াছে। মানুষ যাহা ত্যাগ করিল, দেবতা গ্রহণ করিয়াছেন, এইখানেই সমাপ্তি!—কিন্তু হায়, আবার এ কি সমস্যা আজ তার জীবনে জাগিয়া উঠিল? দেবতাও কি সে দান পায়ে স্থান দিতে কুণ্ঠিত! দেবতাকে পাইতে হইলে পাইতে হইবে কাহাকে?

নীরদের সর্ব্ব শরীর পুনঃপুনঃ কাঁটা দিল—কাহাকে? যার কাছে মুখ দেখাইবার এতটুকু উপায় সে হাতে রাখে নাই—যার প্রতি ব্যবহার মনে করিলে জগতের সমুদয় অন্ধকার দিয়াও তার লজ্জিত মুখ ঢাকা পড়ে না, কেমন করিয়া সে এই অপরাধের কালিমাখা মুখে তার সেই অবিচলিত অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইবে?—সে কি তাকে ক্ষমা করিবে? সে কি তার কাছে ক্ষমা পাইয়াছিল?

না—না—দ্বিধা নয়—লজ্জা নয়—বল চাই—সবটার বিনিময়ে অন্তরে বল চাই—এ হৃদয় দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করিতেই হইবে, কৃতকার্য্যের দণ্ড মাথা পাতিয়া লইতেই হইবে, যে মূঢ় অহঙ্কার এতদিন ধরিয়া এই নরক-যন্ত্রণা সহ্য করাইল, সেই গর্ব্বকে ভূলুণ্ঠিত না দেখিলে বুঝি তার জীবন দেবতা প্রসন্ন হইবেন না?—তবে তা'ই হোক, তাই হোক!

নীরদ একটা থামের গায় মাথা রাখিয়া নীরবে অনির্দ্দেশ্য অন্ধকারে চাহিয়া রহিল, কিন্তু যদি সে—না—এখন আর প্রায়শ্চিত্ত করা যায় না।—চিরজীবন অনুতাপ করা ভিন্ন ফিরিবার পথ নাই!

একখানা পাতলা মেঘ ভাসিয়া চাঁদকে ঢাকিয়া ফেলিল, ঝোপের ভিতর শৃগাল ডাকিতে লাগিল, আকাশে একটিও নক্ষত্র দেখা যাইতেছিল না। বর্দ্ধিতান্ধকারে গাছের গায় জোনাকীর পুঞ্জ ঝিকিমিকি জলিতেছিল,

শ্বাস যেন আটকাইয়া আসিল, জোর করিয়া নিশ্বাস টানিয়া নীরদ অস্ফুটধ্বনি করিয়া উঠিল—"মা!"—সহসা বক্ষের ভার শতমণ পাষাণের মত চাপিয়া ধরিল।—হায়, যদি মা তার থাকিতেন! মা বলিতেই এক সঙ্গে অনেক দিনের অনেক কথাই মনে জাগিল, হায় মা! কি স্নেহময়ী মাই তার গিয়াছেন—সেই মার সঙ্গে সঙ্গেই তার সবই চলিয়া গেল। ক্রমে তার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল, আবার সে মৃদুস্বরে উচ্চারণ করিল —"মা! মা! মা!"

কে' স্পর্শ করিল? সে স্পর্শ কি স্নেহপূর্ণ, কি অপরিসীম সান্ত্বনা-মাখান!—নীরদ ফিরিল না, অভিভূতভাবে কেবলমাত্র তাঁর বাহু মধ্যে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া মুদ্রিতনেত্রে গভীর নিশ্বাস সহকারে ক্ষীণকণ্ঠে কহিল—"মাগো!"

সন্ন্যাসী মাটিতে বসিয়া সস্নেহে ছোট ছেলের মত তার মাথাটা নিজের কাঁধের উপর রাখিয়া প্রশ্ন করিলেন—"তোমার মা আছেন?"

নীরদের দুই চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া তখন জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, সে মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল—"না।"—তা'র পর সন্ন্যাসীর কোলে মুখ লুকাইয়া এতদিনকার অবরুদ্ধ বেদনার তীব্র জ্বালা—সংসার-ত্যাগীর গৈরিক বস্ত্রে নিঃশব্দ ধারায় ঢালিয়া দিল। বক্ষের ভার কমিয়া আসিতেছে বুঝিয়া সন্ন্যাসী বাধা দিলেন না, গম্ভীর মুখে বসিয়া শুধু মাথায় পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন। নীরদের মনে হইল, যে মাকে সে এইমাত্র দারুণ জ্বালায় অস্থির হইয়া ডাকিয়াছিল, বুঝি তাহার আকুল আহ্বান অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া কোন্ অদৃশ্যলোক হইতে তাঁর এই হতভাগ্য বঞ্চিত সন্তানকে সান্ত্বনা দিবার জন্য মাতৃহৃদয়ের সমস্ত স্নেহধারা নিংড়াইয়া এই স্পর্শের মধ্যে ঢালিয়া দিয়াছেন! প্রত্যেক অঙ্গুলীটি প্রতি শিরার ভিতর দিয়া অপূর্ব্ব তাড়িত সঞ্চালিত করিতেছিল। এ

স্পর্শ সে কত দিন অনুভব করে নাই। শুধু এইটুকুর জন্যই যে তার সমস্ত প্রাণ মন দারুণ তৃষ্ণায় শুকাইয়া উঠিয়াছে, হৃদয় মরিয়া গিয়াছে—সমস্ত জীবনের বিনিময়ে সে যে পাগল হইয়া এইটুকুই চাহিয়াছে—তাহা আজ সুস্পষ্টরূপেই বুঝিল। সারা জীবনটা এই পাওনাটুকুর অভাবেই তার এমন ব্যর্থ হইয়া গেল! এইটুকু দাবীই বুঝি তার চিত্তে চিরদিন দুর্জ্জয় অভিমানরূপে জাগিয়া আছে। মাতৃকরতলের স্নেহ-তাড়নায় তারা প্রসুপ্ত হইবার অবসর তো পায় নাই। কল্যাণময় উদার হৃদয়ের স্পর্শে, উদার দৃষ্টি না পাইয়া—সে সঙ্কুচিত সন্দেহে কেবল নিক্তির কাঁটার দিকেই লক্ষ্য রাখিয়া ওজনের ফাঁকি ধরিয়াছে। অন্ধ সে—প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ের কাণায় কাণায় ভরা, অথচ সে জানে না যে সে কিসের অভাবে এমন ধূলি-মলিন, কণ্টক-ক্ষত, ক্লান্তচরণ, ঘূর্ণিত-মস্তক, জীবনযুদ্ধে পরাভূত! আজ বুঝিল, তার হৃদয় কেন ত্যাগের আনন্দ, ক্ষমার শান্তি উপভোগ করিতে পারে নাই। পৌরুষ, ঐশ্বর্য্য যশ সব যেন তার কাছে ছায়াবাজির মত অস্পষ্ট, স্বপ্নের মত অসাড়।

এত বড় আত্মপ্রতারণা দ্বারা পবিত্র সন্ন্যাসধর্ম্মকে সে কলঙ্কিত করিতে চাহিয়াছিল? অন্তর্য্যামী গুরুদেব তার নিজেরও অজ্ঞাত গোপন মনের গুহানিহিত বার্ত্তা জানিয়া তাই বুঝি তাকে বাধা দিলেন? হায়, শঙ্করভাস্য! উপনিষদ! এতদিন তোমরা কি শিক্ষাই দিলে? তৃষ্ণায় যার বুক ফাটিয়া উঠিতেছে, সে প্রতিজ্ঞা লইয়া বলিবে—জল চাহি না?

পরমানন্দ স্বামী মাথায় ঘন ঘন হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"আজ তোমার আহার হয় নি, শীতে কষ্ট পাচ্চো;—এসো, তোমার ঘরে যাই।"

নীরদ কলের পুতুলের মত উঠিয়া বসিল, তখন সে প্রায় শান্ত হইয়াছিল, তথাপি চোখ দিয়া তখনও জল ঝরিতেছে। বোধ করি জানিতে

পারে নাই, অন্ধকারে দুইজনে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাহাকে উঠিবার চেষ্টা-বিরহিত দেখিয়া সন্ন্যাসীও আর কিছু বলিলেন না, নিঃশব্দে তার শিথিল একখানা হাত নিজের হাতে তুলিয়া একটু নিকটে সরিয়া আসিলেন। ঘরের ভিতর হইতে একটা ঘড়ি বাজিয়া একবারের জন্য নিস্তব্ধতাকে আঘাত করিয়াই থামিয়া গেল, আকাশে তরল কুহেলীর আবরণ সরাইয়া চাঁদ একবারটি পূর্ণ কৌতূহলে চাহিয়া দেখিলেন, নীরদ এতক্ষণে কথা কহিল—"গুরুদেব!"

সকরুণস্নেহে মাথায় হাত রাখিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন—"বল—"

"দূরে থেকে কি প্রায়শ্চিত্ত করা যায় না? কাছে যা'বার উপায় তো নেই—"

"তা'তে কি প্রায়শ্চিত্ত হ'বে নীরদ?—তা'ই কি কর্ত্তব্য?"

আবার সেই কর্ত্তব্য!—অধীর হইয়া নীরদকুমার বলিয়া উঠিল—"তবে কি হ'বে? অনেক যে দেরি হয়ে গেছে। এখন এ ভুল কেমন করে শোধরাব, সে যে কিছুতেই ভেবে পাচ্চি নে?"

একটু হাসিয়া সাধু কহিলেন—"কাল নিরবধি! ভুল যেমন করে হোক শুধরে নাও।"

নীরদ এবার দুই হাতে মুখ ঢাকিল, তার যে হাত সন্ন্যাসীর হাতে ছিল, সে টানিয়া লইয়াছিল।

সন্ন্যাসী কহিলেন—"নীরদ! মানুষকে তার পূর্ব্ব কষ্ট পদে পদে প্রলুব্ধ করে থাকে, তা'ই বলে কি তারই হাতের ক্রীড়নক হতে হবে? বিলম্বে অন্যায়ের মাত্রা বর্দ্ধিত হয় মাত্র!" উত্তর প্রতীক্ষায় কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন, সাড়া না পাইয়া পুনশ্চ কহিলেন—"পথ খুঁজে ছিলে—সত্যের সরল পথ সামনে—সাহস হয়—দ্বিধাহীন হয়ে চলে যাও, না পার—"

মুখ হইতে হাত সরাইয়া অবরুদ্ধ স্বরে নীরদ কহিল—"যদি কেউ আমার কার্য্যফলে অসুখী হয় ?"

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'—এই মহাবাক্য ভুলে গেলে ? কর্ত্তব্য কর্ম্মে এত কুণ্ঠা কেন ? মনে বল কই ? কি শিখলে এতদিন ? উপনিষদ্ তোমায় ডেকে বলেন নি কি—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত:' ?"

চাঁদের আলোয় যে মুখ মরণাহত রোগীর মত ম্লান দেখাইতেছিল, মুহূর্ত্তে তাহা নবীন স্বাস্থ্যের উজ্জ্বলতায় দীপ্ত হইয়া উঠিল। মাটীতে মাথা রাখিয়া সে তাঁকে প্রণাম করিল, তা'র পর উঠিয়া দৃঢ়স্বরে কহিল—"তাই হোক, আপনার আদেশই শিরোধার্য্য করলেম। যা' হবার হোক।"

সন্ন্যাসী শ্রদ্ধানত মস্তকে হাত রাখিয়া প্রসন্নকণ্ঠে কহিলেন—"ঈশ্বর তোমার কল্যাণ করুন।"

৩২

সারারাত্রি জাগিয়া ভোরের সময় ঘুমাইবার চেষ্টায় কৃতকার্য্য হইতে না পারায় বিরক্ত চিত্তে নীরদকুমার বিছানা ছাড়িয়া জানালার নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন সময় বাহিরের দরজায় ঘা পড়িল। কোন ছাত্র কোন প্রয়োজনে ডাকিতে আসিয়াছে, মনে করিয়াছিল, কিন্তু প্রবেশ করিল যোগেন্দ্র। যোগেন্দ্র এখন আরও একটু মোটা হইয়াছে, মাথার চুলও দুই চারি গাছা সাদা হইতে আরম্ভ করিয়াছে, বেশভূষার পারিপাট্য সে রকম নাই ; কিন্তু মুখের সেই সরল প্রাণখোলা

হাসিটুকুর অভাব ছিল না। এখন কিন্তু ঘরে ঢুকিয়া বন্ধুর মুখের দিকে চাহিতেই হাসির পরিবর্ত্তে মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। সেইখানে থমকিয়া দাঁড়াইয়া সাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিল—"একি! কি হয়েছে?"

নীরদ বিস্ময়ের কারণ বুঝিয়া তাড়াতাড়ি মুখের ভাব বদলাইবার চেষ্টায় হাসিয়া কহিল—"কি?—ভূত দেখলে নাকি?" তার হাসিটা যে আত্মগোপন প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিল সেটুকু সে কিন্তু নিজেই বুঝিয়া ছিল।

"ভূত আমি দেখেচি, কি কাল রাত্রে তুমি ঐ জানালায় দাঁড়িয়ে দেখেছিলে, তা' ঠিক বুঝতে পারচি নে'। মোদ্দা তোমার কিছু একটা হয়েছে! অসুখ?"

সত্য সত্যই খুব একটা কঠিন পীড়া—যাহা মানুষকে অতি অল্পক্ষণে বহু বর্ষের পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়—নীরদের মুখে সেই রকম একটা দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধির আক্রমণ চিহ্ন সুপরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। যোগেন্দ্র মুখের দিকে চাহিয়া আছে দেখিয়া সে একটু বিচলিতভাবে সরিয়া আসিল, আবার হাসিবার চেষ্টা করিয়া উত্তর দিল—"হ্যাঁ, মাথা ধরেছে!" বলিয়া খাটের ডাণ্ডার উপর মস্তক রক্ষা করিল। মাথা ধরিবার অপরাধ ছিল না!

"সেই জন্যে বুঝি কাল খেলে না? ঠাকুর বল্লে তুমি সন্ন্যাসীঠাকুরের কাছে আছ, অগত্যাই আর ওদিকে—বুঝেছ তো? আহা, আমি তো জানি নে' তোমার অসুখ করেচে—একি! বিছানায় শোও নি? ঐ জন্যেই তো বলি দাদা! সাধু সন্ন্যাসীতে কি আর তোর আমার ধাত বোঝে! সারারাত্রি হঠযোগ হচ্ছিল বুঝি? মৎস্যাসন ইত্যাদি?"

যোগেন্দ্রের আক্ষেপোক্তি শুনিয়া নীরদ হাসিল, বলিল—"রজ্জুতে সর্প ভ্রম করে শিউরে উঠলে যে!"

যোগেন্দ্র গম্ভীর হইয়া কহিল—"বাঁচালে। সর্পে তো রজ্জু ভ্রম করি নি?"

নীরদ আবার হাসিয়া ফেলিল—"ও একই কথা! মোদ্দা ভ্রম তো বটে।"

"আচ্ছা, না হয় আমারই ভ্রম, কিন্তু তোমার এসব কি ধ্রুবযোগ? মাদুরার অমন হাসিখুসী—আমোদ আহ্লাদ—খাসা বাড়ী, তোফা চা, কফি, পাঁঠার কোপ্তা কালিয়া—কোথাও কোন ফাঁকটি ছিল না—দেশের কাজ, নিজের সুখ একত্রে চলছিল, হুড় হুড় করে টাকা আসছিল, আলাদীনের দীপের থেকে, হঠাৎ উল্টোমুখো এক দৈত্য এসে ঘাড়ে চাপল রাতারাতি সব ফক্কা!"

যোগেন্দ্র আসন গ্রহণ করিয়া সদুঃখে শ্বাস মোচন করিল।

নীরদ পরিহাস করিয়া বলিল—"সে কষ্ট যে ভুলতে পারচ না? শুনেছিলুম সময়ে সয়ে যায়, তোমার দেখচি বিপরীত। দিনে দিনে বিয়োগ বেদনা বৃদ্ধিই পাচ্চে!"

"ভুলতে দিলে কৈ! সেও তো তোমারই কীর্ত্তি! মাছ—এমন তোফা টাট্‌কা মাছ চোখের উপর দিয়ে জেলে ব্যাটারা ধরে নিয়ে যা'বে, রোজ দু'বেলা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে দেখবো—উপায় নেই!—যত জিভে তত চোখে জল ঝরে, কাছে কেউ থাকলে বলি, চোখে পোকা পড়েছে! নিজে তো আলোচাল ধরেছ, যেন মা কি বাপ—"

নীরদ সকৌতুক হাস্যে যোগেন্দ্রের দুঃখ কাহিনী শুনিতেছিল, শেষ কথায় চমকিয়া বাধা দিল—"যোগেন! আঃ! যা খুসী তা'ই বলো না!"

যোগেন্দ্র আশ্চর্য্য হইল, বন্ধুর উত্তেজিত মুখের পানে তাকাইয়া ঈষৎ অপ্রতিভভাবে একটু হাসিয়া বলিল—"একি, তুমি যে অবাক্ করে দিলে! তামাসা করে কি না কি বলেছি, তা'তে চটবার কি পেলে? ঐতেই বলে, 'উচিত কথায় দেবতা তুষ্ট, উচিত বল্লে মানুষ রুষ্ট।' সত্যি সত্যি তো আর তোমার স্বর্গগত বাপ দ্বিতীয়বার তোমায় কাছা পরাবার জন্যে ফিরে আসচেন না।—উঃ ভক্তি কত! বৎসরান্তে এক গণ্ডুষ জলও তো কই দিতে দেখিনে।"

নীরদ যোগেন্দ্রের পিঠে অধীর চপেটাঘাত করিয়া ঈষৎ ঠেলা দিয়া অসহিষ্ণুভাবে বলিয়া উঠিল—"ও সব কথা ছেড়ে দাও যোগেন! তুমি সত্যি যদি ক্লান্ত হয়ে থাক, তা হ'লে সে কথা স্পষ্ট করে বলে অবসর নাও না?"

যোগেন্দ্র সাভিমানে কহিল—"বলে নাও! ভগবান মুখ দিয়েছেন বলবার জন্যে, বলো। জানো কিনা, হতভাগাটাকে বঁড়সিতে বিঁধে রেখেছ, ঘাই মারবার উপায় নেই, তা'ই মাঝে মাঝে খেলিয়ে দেখে নেওয়া হয় না? তা'ই যদি পারবো, নীরদ! তা হ'লে মাদুরার চাকরী খুইয়ে তোমার সঙ্গে বনবাসী হই? তবু তুমি বল তোমায় ছেড়ে যেতে চাই?"

নীরদ লজ্জা বোধ করিল। যোগেন্দ্র যাহা বলিতেছে, সে কথা সম্পূর্ণ সত্য। যোগেন্দ্রের স্বার্থত্যাগ ও বন্ধুপ্রেম যথার্থ অনুকরণীয়। নীরদ জানিত, যে কয়জন যুবক তার নবপ্রতিষ্ঠিত আশ্রমের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া নিজেদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিয়াছে যোগেন্দ্র তাদের মধ্যের নয়। অন্য সকলে দেশকে ভালবাসিয়া, কর্ত্তব্যকে ভালবাসিয়া অথবা যশোলিপ্সা লইয়া যে কার্য্যের জন্য তাহার সহিত যোগ দিয়াছে, যোগেন্দ্র সেই কার্য্য স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছে, শুধু তাহাকে

ভালবাসিয়া। ইহাও জানিত সে বেচারা এর জন্ত নির্য্যাতন ভোগ করিতেছে। পাছে নীরদ মণিমালার চরিত্রের এই সঙ্কীর্ণতা জানিতে পারে সেই ভয়ে সে তাকে এখানে আনিতে সাহস করে নাই, এ কথাও নীরদ যে না বুঝিয়াছিল এমন নয়, একবার সে তাকে সাবধান করিতে চেষ্টা করিয়াছিল—"গিন্নির কাছে অভিশপ্ত করো না যেন। বুঝে কাজ করো!"

যোগেন্দ্র কথাটা হাসির মধ্যে চাপিয়া ফেলিয়া কষ্ট কল্পনায় জানাইয়াছিল, স্ত্রী তাঁর তেমন মেয়েই নয়! বিশ্বাসের ভাণ করিলেও নীরদ বিশ্বাস করে নাই। আজ কথাটা একটু কঠিন হইয়া গিয়াছে। বিদ্রূপ বলিয়া যোগেন্দ্র উড়াইয়া না দিয়া অভিমান প্রকাশ করিল, এ ক্ষেত্রে দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কথা যোগাইল না। যোগেন্দ্র ইহাতে আরও একটু আশ্চর্য্য হইয়া বার বার তার পানে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কিছুই বুঝিল না। নীরদের ব্যবহার আজ তার মনে আঘাত করিল। সে তো তার কাছে জীবনের কোন সামান্ত কথাও লুকায় না, কিন্তু নীরদ নিজের চিন্তা লইয়া এত দূরে সরিয়া থাকে যে, কোনও খান দিয়া তাহাকে যেন স্পর্শ করা সম্ভব নয়।

অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া হঠাৎ মনে পড়িল, আজ সে অসুস্থ এবং রাত্রে তার আহার হয় নাই। মুহূর্ত্তের জন্তও যে বিরুদ্ধ ভাব তার হৃদয়ে স্থান দিয়াছিল, ভাবিয়া অনুতাপের ধিক্কারে চিত্ত তার পূর্ণ হইয়া উঠিল, ব্যগ্র হইয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল—"ডাক্তারকে ডাকতে পাঠাই—"

নীরদ মুখ তুলিল, মাথা নাড়িয়া নিষেধ করিল—উঁ হুঁঃ—ডাক্তার কি হ'বে? কিছুই তো হয় নি।"

"মুখের চেহারা দেখলে যে ভয় করে! থার্ম্মোমিটারটা আনি, নিশ্চয়ই তোমার জর হয়ে থাকবে—"

যোগেন্দ্র উঠিল। নীরদ ডাকিল—"না, না, ওসব কিছুই করতে হ'বে না, যোগেন! যোগেন! আহা!—শোন, ওহে—এস একটু গল্প করি, একটা কথা আছে—"

যোগেন্দ্র রাগ করিয়া বলিল—"অসুখ বাড়িয়ে কি লাভ আছে?"

"বেশ তো তোমরা না হয় একটু সেবাই করবে।"

'রা' অর্থে?—'রা' আর আছি কই?"

নীরদকুমার হাসিয়া কহিল—"হও না কেন—'তোমরা', আমি কি বারণ করেছি? বিরহের পালা সাঙ্গ করে মিলনান্ত নাট্য রচনা কর, আমি বরং দেখে যাই—"

"কি বল্লে—'দেখে যাই'—অর্থাৎ?"

"ঐযে বল্লুম 'একটা কথা আছে—' এটা তারই সূচনা।"

সূচনা শুনেই তো হৃৎকম্প উপস্থিত! এখন আরম্ভ কর, দেখা যা'ক, কোথাকার জল কোথায় যায়!"

প্রভাতে নীরদের গুরুদেব বিদায় লইলেন। নীরদ সঙ্গে করিয়া পরপারে ট্রেণে তুলিয়া দিয়া আসিল। সেই দিন বৈকালে পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিয়া একটু অন্যমনস্ক হইবার আশায় প্রত্যাশিত নেত্রে চাহিয়া দেখিল। দুই কোণে দুই আলমারি পুস্তক। বাংলা, সংস্কৃত, ইংরাজী—সকল ভাষার কিছু কিছু ভাল বই-ই সংগৃহীত ছিল। ম্যাক্স-মূলারের অনুবাদ ও মূল সংস্কৃত ধর্ম্ম পুস্তকের উপরই ইদানীং অনুরাগ জমা হইয়াছে, কাব্য সাহিত্যও অনাদৃত। আজ ম্যাক্সমূলারের উপনিষদের সংগ্রহ একবার হাতে করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া যখন সে ক্লান্তভাবে উপরের 'তাকে' দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, তখন একখানি ক্ষুদ্রাকৃতি পুস্তিকা নিজের পূর্ব্বস্মৃতির সবটুকু মাধুর্য্য ঢালিয়া দিয়া উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে হাসিয়া আহ্বান করিল। যন্ত্রচালিতের মত বইখানা তুলিয়া

নীরদ আলমারি বন্ধ করিয়া ঘরের মাঝখানে টেবিলের কাছে ফিরিয়া আসিল। টেবিলের উপর সাদা কাপড়ের আস্তরণ বিছানো। পিতলের সুন্দর কারুকার্য্যখচিত ফুলদানিতে এক গুচ্ছ হাসনাহানা ফুল শুষ্ক হৃদয়ের মধ্য হইতে শেষ সুরভি দান করিয়া সফলতার গৌরবে চাহিয়া ছিল। আসন্ন মরণকে লক্ষ্য করিয়া সে যেন বলিতেছিল—'সব দিয়া দিয়াছি, কিছু বাকি নাই, এখন আমায় তুমি গ্রহণ করো, আমার কাজ শেষ হইয়াছে!' বাতাস তাহারই সুরভি স্মৃতিতে পূর্ণ হইয়া প্রাণপণে তাহাকে তাজা রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল। সেও শুধু লইতে চাহে না, প্রতিদান দিতে চায়। বইখানা খুলিতেই চোখে পড়িল—

"All look for thee, Love, Light and Song
Light in the sky deep red above,
Song in the Lark of pinions strong,
And in my heart, true Love,
Apart we miss our nature's goal,
Why strive to cheat our destinies ?
Was not my Love for thy Soul ?
Thy beauty for mine eyes ?
No longer sleep, oh, listen now :
I wait and weep, but where art thou ?"

ছত্রগুলি বড় ভাল লাগিল। 'And in my heart, true Love' সে দুইবার উচ্চারণ করিল। True Love! হ্যাঁ, সত্যই তা'ই! ইহাকেই true love বলে। স্বার্থ সিদ্ধি, রূপের মোহ, মিষ্টতার স্বাভাবিক আকর্ষণ—সে সব কি প্রেম? ভুল, ভুল, সে ভুল বুঝিয়াছিল। সত্য বলিয়া পূর্ণ মিথ্যাকে আশ্রয় করিতে উর্দ্ধ বাহু হইয়া ছুটিতেছিল তা'ই সত্যিই

অধীশ্বর তার সে বাতুলতা সহ্য করিতে পারেন নাই। তাঁর অমোঘ বজ্র নিক্ষেপে গতি প্রতিহত করিয়া সত্যের গৌরব রক্ষা ও সেই সঙ্গে তাহাকেও রক্ষা করিয়াছেন। নীরদ অন্তরের মধ্যে একটু সুস্থ বোধ করিল। যাহা বজ্রাহত ভাবিয়া মনে ভয় ছিল, তাহা আদৌ ভস্মচিহ্ন নয়!

পিছন হইতে যোগেন্দ্র হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"হরি তুমিই সত্য! দেখ—আছ কি না আছ এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করেও এসেছি, আজ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি তুমি আছ—আছ—আছ, পৃথিবীটাকে আড়ে দিয়ে ব্যেপে আছ!"

নীরদ হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল—"একি, বেল্লিকের মুখে হরিধ্বনি! লক্ষণ তো বড় শুভ মনে হচ্চে না, যোগেন?"

যোগেন্দ্র নীরদের পৃষ্ঠে একটা প্রবল চপেটাঘাত করিয়া সোৎসাহে বলিল—"শুভ মনে হচ্চে না?—আমার কিন্তু লক্ষণটা বড়ই সু' ঠেকছে! কি বলব দাদা! যদি তোমার মত ছিপছিপে শরীরখানি হতো তা' হ'লে একবার 'ফেক্‌ট্রিক' নৃত্য করে আহ্লাদটার বহিঃপ্রকাশ করতুম!"

"কেন? হঠাৎ হ'ল কি? শ্রীমতী মণিমালা দেবী আজই আসছেন?"

"তিনি আসছেন কাল, কিন্তু তা নয় নীরদ? কি বলব—তোর ওই রুচি পরিবর্ত্তন দেখে আমার যে কি আনন্দই হচ্ছে ভাই!" যোগেন্দ্র সোৎসাহে আবার বন্ধুর পিঠ চাপড়াইয়া বলিল—"বেঁচে থাক দাদা ভাই আমার! আবার আশা হচ্চে—"

নীরদ দেহ সঙ্কুচিত করিয়া সরিয়া গেল, ঈষৎ কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল—"পিঠটাকে কি বেওয়ারিস মাল পেয়েচ, যোগেন? হঠাৎ অত উচ্ছ্বাস ভাল নয়, একটু রেখে খরচ কর।"

যোগেন্দ্র নীরদের পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিয়া উচ্ছ্বসিত ভাবে

কহিল—"যাই বল আমি হাঁপিয়ে উঠেছিলুম। গম্ভীর মুখ, আর 'ভাস্ম-ভস্ম' আমার প্রাণটাকে দুমড়ে মেরে ফেলছিল। তোর মুখে শেলি, বায়রণ্স্, রবীন্দ্রনাথ কত মিষ্টি শোনায়; ও গলা কি মোহমুদ্গর আবৃত্তি করবার জন্যে? তুমি যে খোদার উপরও খোদগারী করছিলে, তিনিও—বেশ বুঝতে পারছিলুম—তোমার অতটা বিদ্রোহ বরদাস্ত করতে পারছিলেন না।"

নীরদ সহসা যেন পাপ-ভীত শিশুর মত চমকিয়া উঠিল—"সত্যি যোগেন। তা'ই কি? আমি কি বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি করেছি?"

যোগেন্দ্র কহিল—"ছোটবেলা থেকে শিবপূজা করে করে কুমারী মেয়েরা তা'দের কল্পনা-মন্দিরে যে দেবতার মূর্ত্তি স্থাপনা করে এসেছে, সেই তা'দের সকলকে ফাঁকি দিয়ে ভগবান এমন কন্দর্প কান্তিকে ছাই ঢাকা দেবার জন্যে তৈরি করে রেখেছেন? তিনি কি এমনি অবিবেচক? না, না, নীরদ, যা'কে যা মানায় না, জেনো, সেটা তা'র জন্যে নির্দ্দিষ্ট নয়। আর সেটা তা'র বেশি দিন সয়ও না।"

নীরদ চুপ করিয়া রহিল, নিজের অতখানি প্রশংসার প্রতিবাদও সে করিতে পারিল না। যোগেন্দ্র একি বাতুলের মত কথা বলিতেছে? তার জন্য ব্যগ্র কে? উপেক্ষিত অপমানিত সে, তারই এত স্তব গান? তার ওষ্ঠপ্রান্তে এক ফোঁটা তীব্র বিষাদের ক্ষীণ হাসি ফুটিতে ফুটিতে মিলাইয়া গেল।

যোগেন্দ্র তাহার মুখে বিদ্রূপের তরল উচ্চ হাস্যের পরিবর্ত্তে ওইটুকু ক্ষীয়মাণ, হাস্যাভাষ দেখিয়া বিস্ময় বোধ করিল। 'রাখিয়া খরচ' করিবার কথাটা মনে পড়িয়া গেল। কথা ফিরাইবার চেষ্টায় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"আহা! ভাল কথা—সেই যে তুমি একটা কি কথা বলবে বলেছিলে?"

নীরদ এতক্ষণ যোগেন্দ্রের কথায় বেশ একটু কৌতুক অনুভব করিতেছিল। শেষ প্রশ্নে ত্রস্ত হইয়া বলিল—"বলবো'খন'।"

"কখন্? পাঁজি আনিয়ে?—দুখানা নৈবিদ্যি, একটা শাঁক, ফুল চন্দন—"

নীরদ হাসিয়া ফেলিল, বলিল—"জ্বালিও না—থামো, কি বলবো?"

"যা' বলবে বলেছিলে।"

নীরদ সহসা বলিয়া উঠিল—"কি বুঝতে পারচি নে'—" তার চোখ মুখ গরম হইয়া উঠিল, মাথার মধ্যে উত্তপ্ত রক্ত ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল।

যোগেন্দ্র কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় দুইটি স্কুলের ছেলে ঘরে ঢুকিয়া একটু মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইল। নীরদ তাহাদিগকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল—"কিছু বলচো, সুধীর! বিনয়?"

সুধীর সোজা তার মুখের দিকে চাহিয়া অকুণ্ঠিতভাবে কহিল—"হ্যাঁ, আপনি আজও কি বাগানে যা'বেন না? রোজ রোজ আপনি না থাকলে কেমন করে চলবে?"

বালকের এই কথা কয়টা আচমকা নীরদকে যেন প্রহার করিল। ছি ছি, কি স্বার্থপর সে, নিতান্ত কাপুরুষের মত নিজের অন্তর্দাহ লইয়া এ কোণে ও কোণে লুকাইয়া ফিরিতেছে!

তার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই যোগেন্দ্র একটু ব্যস্ত হইয়া বলিল—"আজ ওঁর শরীর ভাল নেই। সুধী, বিনু—তোমরা খেলতে যাও।"

বালক দুইটি একসঙ্গে নীরদের স্তম্ভিত মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, বেদনার একটা অশ্রু সজল রেখা তার মুখের উপর কম্পিত হইতেছিল। বিনয় ধীরে ধীরে ব্যথিত নেত্র নামাইয়া বলিল—"তবে থাক্,—এসো সুধীর!" তাহারা ফিরিল, কিন্তু তাদের মৌন অভিমানের প্রচ্ছন্ন ব্যথা নীরদের অপরাধী চিত্তকে তাদের মত সহজে ক্ষমা করিতে পারিল না।

সে অনুতপ্ত হইয়া তাড়াতাড়ি বলিল—"না, না, চলো—আমিও যাচ্ছি—আজ তোমাদের ম্যাচ্ আছে, না ?"

বিনয় ফিরিয়া হাসিমুখে উত্তর দিল—"সে তো কাল হয়ে গেছে।" সুধীরের মুখ হইতে তখনও অভিমানের ছলছল ভাব সরিয়া যায় নাই, সে মুখ ফিরাইয়া রুদ্ধস্বরে দৃঢ় বচনে বলিল—"আপনার শরীর যে ভাল নেই—থাক।"

"তা হোক, আমার কষ্ট হ'বে না—এসো।" বলিয়া সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া পড়িল। যোগেন্দ্র একটু অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল, তা'র পর কার্য্যান্তরে উঠিয়া গেল। খেয়ালী লোকদিগের চরিত্র বুঝা তার সাধ্যাতীত, সে কথা সে তো পুনঃপুনঃই স্বীকার করিয়া আসিয়াছে, আজ আর নূতন করিয়া কি বলিবে ?

ছেলেরা ছুটাছুটি খেলিতেছিল, যারা খেলিতেছিল না, তাহারা দাঁড়াইয়া হাসিগল্প করিতেছিল। ছোট ছোট চারাগাছগুলি বিকাল-বেলায় বাতাসে তাজা হইয়া ঈষৎ মাথা কাঁপাইতেছিল। নদীপারে অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের রাঙা কিরণটুকু ঋষিপত্নীর ক্ষৌম বসনের রাঙা পাড়ের মত আসন্ন সন্ধ্যার তলে ফুটিয়া রহিয়াছিল, নীরদ সুধীরের হাত দৃঢ় করিয়া চাপিয়া ধরিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"আমি না দেখলে তোমাদের খেলতে ভাল লাগে না ?"

সুধীর এখন অভিমান ভুলিয়া গিয়াছে, সে সেই হাতখানার উপর ঝুঁকিয়া প্রবলভাবে মাথা নাড়িল—"একটুও না।"

"আমি যদি কিছুদিন না থাকি ?"

ক্ষুদ্র মুষ্টিতে সেই হাত চাপিয়া ধরিয়া সে গভীর কণ্ঠে শুধু কহিল—"না।"

এই পৃথিবী এত সুন্দর ! এই স্নিগ্ধ বায়ু, এই প্রসন্ন সূর্য্যকিরণ, ঐ

আকাশের গায় মিশিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে—ছোট ছোট পাখীগুলি, নদীতীর হইতে ভাসিয়া-আসা হাস্যমিশ্র কলরব—এখানকার কিছুই তো নিরাশার অন্ধকার গায়ে মাখে না? উত্তাপে ম্লান হয়, বাতাসে হাসিয়া উঠে, অন্ধকারে ঘুমাইয়া থাকে, আলোকস্পর্শে জাগ্রত হয় এই সজীব শান্ত আলোকিত জগতের মাঝখানে ইহাদের সহিত সে কেন মিশিয়া এক হইয়া যাইতে পারে না? আর সবার উপর—এই যে নিঃস্বার্থ ভালবাসা এই ভক্তি পুষ্পাঞ্জলির দুইটা ফুলই যে তার পক্ষে যথেষ্ট!—এর বেশী কে কি পায়? সে তো অনেক পাইয়াছে—তাহার জীবন তো ব্যর্থ নয়—সে ধন্য!

৩৩

সেদিন ও তা'র পরদিন নীরদ যোগেন্দ্রের হাত এড়াইয়া কোন রকমে আত্মরক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। প্রয়োজন তার নিজের, কথাটা সেই-ই তুলিয়াছে, বলিবার আবশ্যকতাও বিদ্যমান, অথচ যোগেন্দ্রকে দেখিলেই বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ করিয়া একটা ধ্বনি উঠিতে থাকে, হাতপায়ের তলা হিম হইয়া আসে, দুর্ব্বলতার হাত হইতে সে নিজেকে মুক্ত করিতে পারে না।

মণিমালা পুত্র কন্যা সঙ্গে আসিয়া পৌঁছিলে যোগেন্দ্রের হাত হইতে আপাততঃ রক্ষা পাইল মনে করিয়া সে একটু আরাম বোধ করিতে লাগিল। সন্ধ্যাবেলা ছেলেদের লইয়া গল্প করিয়া রাত্রে যখন শয়ন করিতে গেল তখন কল্যাণময়ী জননীর মত সর্ব্বসন্তাপহরা নিদ্রাদেবী তার শ্রান্ত ললাটে কোমল করপদ্ম সস্নেহে বুলাইয়া দিলেন।

প্রভাত আবার যুদ্ধের সাজে সাজিয়া আসিল। আবার সেই জীবন-

সংগ্রামে হৃদয়ের সহিত ধ্বস্তাধ্বস্তি, বিদ্রোহী চিত্তকে সহস্র প্রলোভনে ভুলাইয়া বশীভূত করিবার জন্য অন্তরের মধ্যে ক্ষতবিক্ষত হইতে হইতে আত্মপ্রকাশের শতছিদ্র হইতে আত্মগোপন করিবার প্রাণপণ প্রয়াস !

তখনও ঠিক সকাল হয় নাই। পূর্ব্বাকাশের এক প্রান্ত সবেমাত্র লাল হইতে আরম্ভ করিয়াছে, পাখীরা সদ্য জাগ্রত শিশু-শাবকগণের সহিত আলাপ শেষ করিয়া দিবসের মত বিদায় লইতেছে, একটি পক্ষী-দম্পতী গাছের ডালে কাছাকাছি বসিয়া এদিক ওদিক চাহিতেছে। মন্দিরের প্রাঙ্গণ হইতে বালকদিগের সমবেত কণ্ঠোচ্চারিত সংস্কৃত স্তব আবৃত্তির গাম্ভীর্য্যময় ঝঙ্কার দেখিতে দেখিতে স্তব্ধ প্রভাতের বাঁধা বীণার সুর চড়াইয়া দিয়া, বাতাসের ভরে আকাশেও কম্পিত হইতে লাগিল। মন্ত্রমুগ্ধের মত নীরদ এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে হইতে কোন এক সময়ে আসিয়া তাদের সঙ্গে যোগদান করিল। জননী প্রকৃতি যেন নিজে হাতে ধরিয়া তাহাকে আবার সমস্ত সঙ্কোচ মুক্ত করিয়া কর্ম্মের মধ্যে টানিয়া লইলেন।

আহারে বসিয়া যোগেন্দ্র চুপি চুপি প্রশ্ন করিল—"রান্নাটা কেমন লাগছে শুনি ? তুমি যা'ই বল, এই—'শৃঙ্খলা প্রাণভৃতাং হি নারী'—বিহনে আমি তো আধপেটা খেয়ে আধখানা শুকিয়ে গেছি।"

নীরদ ফুলকপির ডালনাটা আর একটু চাহিয়া লইয়া যোগেন্দ্রের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া দেখাইল এবিষয়ে তার সহিত তারও কিছুমাত্র মতানৈক্য নাই।

কেশব, মণীন্দ্র, সুরেন্দ্র সতীশ মিলিয়া তাদের রবিবারের বিশ্রাম অবসরটিকে যখন জমাইয়া তুলিয়াছে, এমন সময় নীরদ আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। ছেলেদের মধ্যে যাহারা কোন কিছু পড়িতেছিল—বই হইতে চোখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, যাহারা গল্প এবং তর্ক করিতেছিল,

তাহারা তার দিকে ফিরিয়া বসিল। কেশব একখানা মাসিকপত্র তুলিয়া ধরিয়া কহিল—"রজনীবাবুর একটা প্রবন্ধ আছে, দেখেছেন ?"

নীরদ চাহিয়া দেখিয়া বলিল—"না, দিও পড়বো।" কি যেন একটা কথা বলিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু সঙ্কোচ কাটাইতে পারিতেছিল না। কতকগুলি ছোট ছেলে নীরদের সাড়া পাইয়া ছবির খাতা ও সংগৃহীত দেশলাই বাক্সের ছবি ফেলিয়া উঠিয়া আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। নীরদ তাদের কাহারও মাথায়, কাহারও পিঠে একটু হাত বুলাইয়া কাহাকেও কাছে একটু টানিয়া আদর দেখাইল, তা'র পর বিনয়ের কোঁকড়া চুলের গুচ্ছ নাড়িতে নাড়িতে বলিয়া ফেলিল—"আমি কাল কিছু দিনের জন্যে এখান থেকে যাব। তোমরা আমার অনুপস্থিতির সময় সাবধানে থাকতে চেষ্টা ক'রো।

যে সাত বছরের ছেলেটি কাছে দাঁড়াইয়াছিল, সে কোলের মধ্যে ঘেঁসিয়া আসিল, যে হাত ধরিয়াছিল, সে হাতটা চাপিয়া ধরিল, মণীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—"কোথা যাবেন, বাড়ী ?"

"বাড়ী ? না, হ্যাঁ, বাড়ীই যা'ব।" এই 'বাড়ীই যা'ব" কথাটা বলিতে বলিতে পরিত্যক্ত গৃহের একটি স্মৃতি-চিত্র তার মানস নেত্রে ফুটিয়া উঠিয়া তার পানে যেন দুই স্নেহ-কণ্টকিত ব্যাকুল বাহুর বিস্তার করিয়া দিল। ডাকিয়া বলিল—"এসো, এসো, ফিরে এসো—আমার কোলে এসো—তোমার ঘরে এসো—আর কেন ?—এসো, এসো, এসো !"

নীরদ অন্তরের মধ্য হইতে সাড়া দিল। জোর করিয়া বলিল—"যা'ব, তোমার কাছেই যা'ব।—যে দণ্ড দিতে হয়, তুমিই দিও।"

সেইদিন আসন্ন সন্ধ্যার ছায়াচ্ছন্ন কানন পথে ফিরিতে ফিরিতে গ্রামের বৈরাগী যখন খঞ্জনি বাজাইয়া আপন মনে গাহিয়া চলিয়াছিল—

"সামাল মাঝি এই পারাবারে, বান ডেকেছে সাগরে—
এবার তোমার দফা হ'ল রফা পড়ে গেলে ফাঁপরে—"

তখন বাগানের অপরাজিতা লতা বিজড়িত বেড়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া নীরদ আপনার মনের সহিত শত শত প্রশ্নোত্তর করিতেছিল। যুদ্ধ শেষ হইয়া আসিয়াছে। জীবনব্যাপী মহাসমরের কাল প্রাতেই হয়ত পরিসমাপ্তি। তারপর—? আঃ—কি অপূর্ব্ব মুক্তি, গোপনীয়তার হাত হইতে মুক্তি! চিরমুক্তি!—লুব্ধ বালকের মত সে আপনাকে আপনিই ভুলাইতেছিল। গান—একটা সামান্য ভিক্ষাজীবীর অশিক্ষিত কণ্ঠের কয়টা কথা মাত্র! সারাদিনের ধূলি-রৌদ্র-মাখা ক্লান্ত চিত্তেই একটুখানি আত্মতৃপ্তি—কিন্তু নীরদের কানে ইহা আজ সংসারের মধ্যে সব চেয়ে মিষ্ট ও মধুরস সঞ্চারী ঠেকিল। সেও যেমন তার একান্ত সঙ্কট বুঝিয়াই এই দুরন্ত পারাবারে ভাসমান নৌকাখানিকে প্রাণপণে সামলাইতে বলিতেছে, বান ডাকিয়াছে, যদি সে সতর্ক না হয়, ক্ষুদ্র তরী বানচাল হইয়া যাইবে।

কয়দিন ভাঙ্গিয়া গড়িয়া আর সব বিষয় সে এক রকম মীমাংসা করিয়া আনিয়াছে, কিন্তু একটা দুর্দ্দমনীয় লজ্জা ও ক্ষোভ কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না। লক্ষ্মীপুরে সে কার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইবে? সে যে শান্তির স্বামীকে তার সর্ব্বস্ব দান করিয়া দিয়াছে, আবার কি সাহসে ফিরাইয়া লইবে?—নীরদের আরক্ত মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল, চঞ্চল হৃৎপিণ্ড পুনঃ পুনঃ নিশ্চল হইয়া পড়িতে লাগিল। ঘড়িতে দম যেন আর একটুও নাই, বুঝি সামলান দায় হয়। যাত্রী এবার ফাঁপরেই পড়িল! সদ্যফোটা ফুলের মত আকাশভরা নক্ষত্রগুলি তার লজ্জাক্লিষ্ট মুখের দিকে সকৌতুকে চাহিয়া রহিল, শীতের কনকনে হাওয়া গায়ে তীরের মত বিঁধিয়া ব্যঙ্গের হাসি হাসিল? দূর হইতে সঙ্গীতের ক্ষীণ ধ্বনি তখনও শূন্যে ভাসিতেছিল, কিন্তু ভাষা

বুঝা যাইতেছিল না। অনেকক্ষণ পরে অদূরস্থ অন্ধকার কলা ঝাড়ের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সুগভীর দীর্ঘ শ্বাসে লজ্জা দ্বিধা সে জোর করিয়া পরিত্যাগ করিতে চাহিল। আপনাকে আপনি সমঝাইয়া বলিল—"আমায় যেতেই হ'বে, আমি যা'ব—তাঁর সুমুখে দাঁড়িয়ে আমার প্রায়শ্চিত্ত করতেই হ'বে, আমি করবো! আমার যাওয়া ভিন্ন উপায় নাই।"

নীরদ যখন ঘরে ফিরিল, তখন তার অন্য দিকের ঘরগুলি হইতে ছেলেদের পাঠের সাড়া আসিতেছিল, তার ঘরের কাঠের ত্রিপদীর উপর দীপাধারে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল, এবং যোগেন্দ্র সেই আলোর কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া খপরের কাগজ হইতে পুনঃ পুনঃ চোখ তুলিয়া দরজার দিকে চাহিতেছিল।

নীরদ ঘরে ঢুকিতেই কাগজখানা ফেলিয়া দিয়া সে বলিয়া উঠিল—"হ্যালো ম্যান! তোমার যে আর পাত্তাই পাওয়া যায় না, হলো কি? কেবলই ঠাণ্ডা বাতাস, আর দীর্ঘশ্বাস—না, আর কিছু?"

নীরদ যোগেন্দ্রের চৌকি ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া হাসিল, কহিল—"না আর কিছু না।"

"Wait and weep but where art thou?—শুধু তা'ই?"

"শুধু তাই; কিন্তু যোগেন! তামাসা যা'ক, কাজের কথা বল, আমার কথার উত্তর কই?"

"আমার প্রশ্নটারই উত্তর কেন প্রথমে দেওয়া হোক না? তোমার মতলব কি?"

"কা'র মনে কখন্ কি মতলব ওঠে, তা কি সব সময় খুলে বলা যায়? তবে এই পর্য্যন্ত বলচি মতলব নেহাৎ মন্দ নয়—গুরুদেবের আদেশে যাচ্চি।"

যোগেন্দ্র শিহরিয়া উঠিবার ভাণ করিয়া কহিল—"ঐ তো—ঐখানেই

যে গলদ! তাঁর যে একটি তল্পি বইবার চেলার দরকার হয় নি, সে ভরসা করব কি করে? তোমার দেখছি 'ভাগ্যবন্ত' হ'বার আর দেরি নেই।"

লজ্জাই লজ্জাকে আকর্ষণ করিয়া আনে, মাথা নীচু করিয়া নীরদ কহিল—"ভাগ্য! হ্যাঁ, ভাগ্য বই কি, তবে সে ভাগ্য আর আমার হলো কই? পাপীকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, তা'র জন্যে অন্য পথ নেই যোগেন!"

যোগেন্দ্র বন্ধুর অন্তর্ভেদী দীর্ঘনিশ্বাসে কান দিল না, সে মাথা নাড়িয়া করুণ কণ্ঠে বলিতে লাগিল—"ওটাও যে একটা দুর্লক্ষণ! এটা জান না দাদা? মহা মহা পাপীরাই তো শেষকালে বড় বড় সাধু হ'ন। 'জগাই মাধাই পাপী ছিল, হরি নামের গুণে তরে গেল।' আর জান তো মহামুনি বাল্মীকির পূর্ব্ব ইতিহাসটা—যত দেখবে, বড় বড় নামের ঘটা, মাথার জট ততই তাঁ'র পূর্ব্ব লীলার সন্ধান নাও, দেখবে কেউ আর বাদ পড়বে না।"

নীরদ আর একখানা চৌকি টানিয়া বসিতে বসিতে ভর্ৎসনার স্বরে কহিল—"ছিঃ যোগেন!"

"সত্যমপ্রিয়ম্—বলতে শাস্ত্রকারের মানা আছে জানি, কিন্তু আমার ওটা স্বভাব—সব সময় আমি বিধি-নিষেধগুলো মেনে চলতে পারি নে, সত্যকথা মনে এলে বলেই ফেলি।"

তারপর একটু গাম্ভীর্য্যের চেষ্টা করিয়া বলিল—"আচ্ছা—তা হ'লে ব্যাপারটা একটু বুঝতে চেষ্টা করাই যাক।—ব্যাপার হচ্চে এই যে, আপাততঃ তুমি কোন অজ্ঞাত মতলবে কিছুদিনের জন্য গা ঢাকা দিচ্চ! —আহা! না হয় পর্য্যটনেই বেরুচ্ছ—ভদ্র করেই বললুম—ও একই কথা! এখন তোমার অনুপস্থিতে আমরা এখানকার সব দায় ভার নিজেদের স্কন্ধে বহন করি, এই তোমার অনুরোধ—উঁ হুঁঃ, তা'ই বা কি

করে বলি—এই তোমার হুকুম।—তা' মহাশয়ের এ খেয়ালের সম্বন্ধে আর এক টুক্‌রো আলো পেতে পারি কি?"

"ও সব ছেঁদো কথা ছেড়ে সাদা কথাটা কি বলে ফেল দেখি?"

"আমি তো সাদা কথা কইতেই চাই, তোমরাই কইতে দাও না। এই ভারবাহী গর্দ্দভ কতদিন এ রকম শিকলি বাঁধা থাকবে?"

নীরদ একটু ভাবিয়া বলিল—"তা' তো জানি নে—হয় তো খুব শীগ্‌গিরও হ'তে পারে—আর হয় তো অনেক দেরিও হয়ে যেতে পারে; কি জানি—যোগেন, কি যে হবে!"

নীরদের স্বর আবেগে কম্পিত হইতেছিল। যোগেন্দ্র জানিত, ভাবুক লোকদের কথাবার্ত্তা, চালচলন সাধারণ লোকদের সহিত ঠিক সমান তালে চলে না, এ রকম সব হয়। সে কহিল—"তোমার আদেশ কবে অমান্য করেচি—কিন্তু একটা কথা, এই বৎসবৃন্দ নিয়ে দিনরাত গোষ্ঠলীলা করতে করতে যে সময় পরিত্রাহী ডাক ছেড়ে উঠতে হ'বে, সেই সময় মানভঞ্জনের পালা গাইতে খুব মিষ্টি লাগবে কিনা বলা যায় না, তা'ই ভাবচি উপরের ঘরগুলো ওঁদের খাসমহল করে দিয়ে তোমার এই নারী-বর্জ্জিত পরম পবিত্র গৃহে আস্তানা গেড়ে এক একবার জিরিয়ে নে'ওয়া যাবে—নৈলে হয়ত সামলাতে পার্ব্বো না। কি বল?"

নীরদ তীক্ষ্ণ শ্লেষের সহিত ব্যঙ্গ করিল—"যো থায়া, উওভি পস্তায়া!"

"বল—বল—আর যো নেহি খায়া—দেখতে পাচ্চি মশায়! নেহাৎ অন্ধ নই—'উওভি পস্তায়া'!—যা হোক, প্রশ্নময় জগতে দেখচি প্রশ্নের জড় মরে না, দ্বিতীয় প্রশ্নটার উত্তর তুমি ইচ্ছা করলে দিতে পারো, কোথায় যাবে?—কোন্ মুলুকে?"

নীরদ হঠাৎ ঘামিয়া উঠিল। বুকের মধ্যে এমন ভাবে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দ্রুত হইয়া উঠিল যে শ্বাস রোধের উপক্রম হয় হয়। কষ্টরুদ্ধশ্বাসে

মাটির দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে উত্তর দিল—"আর আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করো না, ক্ষমা করো।"

যোগেন্দ্র বিস্মিত হইল, কিন্তু তাহা প্রকাশ না করিয়া কহিয়া উঠিল—"এত লুকোচুরি কিসের বল তো? তা' যাও, যাও, যদি একটি সঙ্গিনী-সংগ্রহের ইচ্ছা হয়ে থাকে তো বলেই যাও না কেন, মণিকে দিয়ে বরণডালা সাজিয়ে রাখাই। আর যদি—ওকি, চমকালে যে? ঠিক ধরেচি নাকি?—দেখ, আজ তোমায় খুলেই বলি—শান্তিকে অতটা ভালবেসেও তুমি যখন তা'কে পা'বার চেষ্টা মাত্র করলে না, তখনি আমার সন্দেহ হয়েছিল তোমার আত্মলীলার কোথাও বিশেষ গলদ আছে! কে' সে ভাগ্যবতী শুনি, এতদিন পরে যা'র কপাল ফিরলো? নিশ্চয়ই কোন ব্রাহ্ম মেয়ে হ'বে? নৈলে এখনও তোমার জন্যে বসে আছে!—ওকি! নীরদ! নীরদ! রাগ কল্লে?" যোগেন্দ্র সহসা লজ্জাজড়িত আবেগে এই কথা বলিয়া হাত ধরিবার জন্য তার দিকে দুই বাহু প্রসারিত করিল, কিন্তু বন্ধু তার উহা লক্ষ্য পর্য্যন্ত না করিয়া বেত্রাহতের মত সেই চমকিয়াই তত্‌ক্ষণে পাশের ঘরে চলিয়া গিয়াছে। সেখানে কিছুক্ষণ অস্থিরভাবে ঘুরিয়া বেড়াইয়া পরে শুব্ধভাবে জানালার নিকট আসিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন বাহিরের পানে চাহিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল।

যদি তার বন্ধু যোগেন্দ্র তখন হতবুদ্ধি না হইয়া গিয়া একটা আলো হাতে উঠিয়া আসিয়া তার সম্মুখে দাঁড়াইত, তাহা হইলে তার বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিয়া উঠিত, ইহাতে সন্দেহ নাই। যেহেতু সে মুখে লজ্জার যে নিবিড় ছায়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা অমার্জ্জনীয় অপরাধেরই প্রকট চিহ্ন। যোগেন্দ্র তার এই বন্ধুকে দেবতার মত পবিত্র ও শুদ্ধসত্ত্ব বলিয়াই মনে প্রাণে বিশ্বাস করে, সে যখন জানিবে—সে তা নয়! ক্রমে অন্ধকার কাটিয়া কুয়াশাচ্ছন্ন ক্ষীণ জ্যোৎস্না ছড়াইয়া আকাশে চাঁদ উঠিল,

গাড়ী আসিয়া যথাস্থানে থামিলে দরজা খুলিয়া হেমেন্দ্র নামিয়া দাঁড়াইল। শান্তির নামিবার কোন চেষ্টা নাই দেখিয়া সে কহিল—“নেমে এসো—একখানা ট্রেন যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে।”

শান্তি নামিল না, বরং গদির উপর একটু শক্ত হইয়াই বসিল। হেমেন্দ্রের ললাট মেঘাচ্ছন্ন হইয়াই ছিল, শান্তির অবাধ্যতার গভীর বিরক্তিতে তাহা আরও কুঞ্চিততর হইয়া উঠিল, তথাপি সংযতভাবে শান্তির অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ডাকিল—“শুনছ, নেমে এসো।” শান্তি ক্রুতকণ্ঠে বলিল—“কোথায় আমায় নিয়ে যাচ্ছ, তা, না বল্লে আমি নামবো না।”

শান্তির স্বরের দৃঢ়তায় ও কথার ধরণে হেমেন্দ্র প্রথমটা একটু থতমত পাইয়া গেল, তার মুখের উপর এমন জোরের সহিত প্রতিবাদ করা যে কাহারও পক্ষে সম্ভব হইতে পারে ইহা তার মনেও হয় নাই, বিশেষতঃ শান্তির মুখে এমন উদ্ধত স্বর সে একদিন শুনিয়াছিল বটে, কিন্তু সেদিনকার সে ভৎ্সনা নারীহৃদয়ের উদ্গত অভিমানাশ্রুরাশির মতই প্রেমপূর্ণ, কিন্তু আজ তার মধ্যে একি কঠোরতা, একি অলঙ্ঘ্য আদেশের কঠিন সুর! হেমেন্দ্র ঘোর বিরক্তিতে আরক্ত হইয়া উঠিল, সামান্য কীটপতঙ্গগুলাও তাহাকে এখন হইতে অপমান করিতে ছাড়িবে না বোধ হয়? অদূরে গাড়ী ছাড়িবার বাঁশি বাজিয়া উঠিল, স্বল্পসংখ্যক লোক—কেহ মাথায় মোট, কেহ ব্যাগ হাতে, ছাতা বগলে প্লাটফরমের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, হেমেন্দ্র উদ্গত রোষাগ্নি হৃদয়ে চাপিয়া ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল—“শীগ্‌গির এসো এখনও, যদি এ গাড়ী না পাই, সকাল অবধি বসে থাকতে হবে।”

শান্তি নামিয়া আসিল, কিন্তু হেমেন্দ্রের অনুসরণ করিল না, প্রাচীরের গায় পিঠ রাখিয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। গাড়ী ভাড়া চুকাইয়া

দিয়া হেমেন্দ্র দ্রুতপদে ষ্টেশনের ভিতর চলিয়া গিয়াছিল, মনে করিয়াছিল, শান্তিও তাহার পশ্চাতে আসিতেছে, কিন্তু টিকিট কিনিতে গিয়া একটু ভাবিবার জন্য যখন দাঁড়াইল, তখন হঠাৎ পিছনে চাহিয়া দেখিল— শান্তি আসে নাই। দারুণ বিরক্তি ও অপমানে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া টিকিট না কিনিয়াই সে ফিরিয়া আসিল—ট্রেণও ছাড়িয়া দিল।

তখন ভোর হইয়া আসিয়াছে, দূরে আলোকের মালা হীনপ্রভ, লোক বেশি চলিতেছে না, ষ্টেশনে প্রবেশ পথের সম্মুখে কতকগুলি থার্ড ক্লাশের যাত্রী ছোট বড় বোচকা পাশে রাখিয়া ঘুমে ঢুলিতেছে, ক্রুদ্ধস্বরে হেমেন্দ্র বলিল—"এ কি কাণ্ড শান্তি? শুধু শুধু ট্রেণটা ফেল করালে!"

শান্তি ক্ষিপ্রহস্তে অশ্রু মুছিয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিল—"বলেছি তো কোথায় নিয়ে যাচ্ছো, না বল্লে আমি যা'ব না, কোথায় যেতে চাও তুমি?"

হেমেন্দ্র এবারও বিস্ময় বোধ করিল কিন্তু নিজেকে পুনঃপুনঃ অপমানিত করিতে আর সাহস করিল না, দিনের আলোয় কোন পরিচিতের চোখে এই অবস্থায় যদি পড়িয়া যায়, তার চেয়ে অপমান আর হয় না, স্বরটা ঈষৎ কোমল করিয়া বলিল—"কোথা যাচ্ছি তা' কেমন করে বল্‌বো? আমাদের স্থান কোথায়? যেখানে হয়, কোথাও যাই এসো।"

শান্তি রুদ্ধস্বরে বলিল—"না, আমরা লক্ষ্মীপুরেই যাব। কেন, তুমি আমায় এখানে নিয়ে এলে? চল, ফিরে যাই। সেখানে না গিয়ে কোথা যেতে চাইছ?"

শান্তির চোখ জলে ভরিয়া আসিল। তাহার স্বর কাঁপিতেছিল। হেমেন্দ্র পরুষ শ্লেষের তীব্রকণ্ঠে কহিল—"এ জন্মে আর নয়! জাহান্নমে যাবো সেও ভালো, তবু সেখানে যাবো না। তোমার খুসী হয় তুমি যাও।"

চারিদিকের আলোকমালা নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়া ঊষার অস্নোজ্জ্বল মূর্ত্তি প্রকাশ পাইল। আকাশে মেঘ ছিল না, কিন্তু গত দিবসের বৃষ্টির চিহ্ন রাজপথকে পিচ্ছিল করিয়া রাখিয়াছিল। লোকের ভিড় ও গাড়ীর শব্দে ষ্টেশন ভরিয়া উঠিল। শান্তির ঠোঁট কাঁপিতেছিল, প্রথমটা সে কথা কহিতে পারিল না, পর-মুহূর্ত্তে আত্মসংবরণ করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল, স্থির স্বরে কহিল—"বেশ, তা'ই হোক, আমি জ্যেঠামশায়ের কাছেই যাবো।" রোষে ক্ষোভে গুমরিয়া হেমেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। এ সংসারে তা'র কোন দাবী নাই? যে স্ত্রী ভিন্ন যথার্থ আপনার বলিতে কেহই নাই, সেও তাকে পরিত্যাগ করিতে চায়? সে এতই অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়িল?—কিন্তু না! হেমেন্দ্র তাকে কিছুতেই হাত ছাড়া করিতে পারে না, সেই তার অভীষ্ট-সিদ্ধির একমাত্র উপায়।

হেমেন্দ্র বড় বিপদেই পড়িল। শান্তি ক্রমেই বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে, এখন তাহাকে বুঝাইয়া ভুলাইয়া নিজের মতে লইয়া আসা সম্ভব নহে। এদিকে আর কতক্ষণ এমন করিয়া সাধারণের কৌতূহল দৃষ্টির সম্মুখে পথের ধারে দাঁড়াইয়া থাকা যায়? কিছুক্ষণ এদিক ওদিক বেড়াইয়া আসিয়া আবার একটু কোমলভাবে কহিল—"দিনকতক পশ্চিমে বেড়িয়ে আসি চল।" কথাটা এমন অসঙ্গত যে নিজেই কেমন সঙ্কোচে জড়াইয়া আসিল। শান্তির মুখেও একটা অবজ্ঞার ছায়া ফুটিয়া উঠিল—সেটুকু হেমেন্দ্রের দৃষ্টি এড়াইল না, অপ্রতিভ হইয়া সে থামিয়া গেল, তা'রপর আবার বলিল—"যা'বে না?"

শান্তি কথা কহিল না, শুধু তার দিকে চাহিয়া মাথা নাড়িল—"না।" ক্রোধে অপমানে হেমেন্দ্রের আপাদমস্তক কাঁপিতেছিল; কিন্তু সে কেমন করিয়া এই শান্ত শিষ্ট, লজ্জানম্র শান্তিকে—যে তার একটা মিষ্ট

কথার জন্য লালায়িত, তার কৃপাদৃষ্টির উপর যার সমস্ত জীবনের সুখশান্তি নির্ভর করিতেছে—কেমন করিয়া তাকে আজ নিজের মতে লইয়া আসে—ইহা ভাবিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। এত লোকের মাঝখানে তো জোর করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে পারে না ?

চারিদিকের লোক 'হাঁ করিয়া' তাদের দিকেই চাহিয়া আছে, হেমেন্দ্র অস্থির হইয়া পড়িল। এই সময় একখানা মেল আসিয়া প্ল্যাট-ফরমে প্রবেশ করিল। কোলাহলে ষ্টেশন মুখরিত করিয়া আরোহীরা ক্রমে বাহির হইয়া যাইতেছিল, হঠাৎ তার মধ্য হইতে যোগেশ আসিয়া হেমের হাত ধরিল—"আরে, ছোটবাবু যে! কোথায় ?" বলিতে বলিতে হেমেন্দ্রের অসহায় দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া শান্তির পানে চাহিল—"এই যে, বৌ'দিও সঙ্গে! ব্যাপারখানা কি ব'ল তো? যাওয়া হচ্চে কোথায় ?"

শান্তি যোগেশকে দেখিয়াই মুখে ঘোমটা টানিয়া দিয়াছিল। হেমেন্দ্র সেদিকের ভাবনা হইতে অংশতঃ মুক্ত হইয়া হাঁপ ফেলিয়া বাঁচিল। যোগেশকে পাইয়া সে এই সঙ্কটের মধ্যে যেন একটা কূল পাইয়াছিল, কিন্তু নিজের স্বভাবসিদ্ধ আত্মাভিমান ত্যাগ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়, ঈষৎ গাম্ভীর্য্যের সহিত উত্তর দিল—"পশ্চিম।"

"পশ্চিম!" বলিয়া যোগেশ একবার চারিদিকে চাহিয়া লোকজন বা লগেজ-পত্রের অনুসন্ধান করিল—"কই, কাউকে তো দেখচি নে ? আর এমন সময় পশ্চিমের গাড়ীই বা কোথা ?" যোগেশ সকৌতুহলে হেমেন্দ্রের পানে চাহিল। হেমেন্দ্র বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, একটু মাথা চুলকাইয়া ঢোক গিলিয়া উত্তর করিল—"তা বটে এখন তো কোন ট্রেণই নেই, তা হ'লে যোগেশ কি করা যায়—বলো দেখি ?"

যোগেশ অনুমানে ব্যাপারটা বুঝিয়াছিল, চট করিয়া মাথায় বুদ্ধি

খেলিল, হেমেন্দ্রকে একটু আড়ালে লইয়া গিয়া প্রশ্ন করিল—"ব্যাপারটা কি? শ্বশুরবাড়ী গেলে না কেন?"

হেমেন্দ্রের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল কিন্তু সব কথা খুলিয়া না বলিয়া কেবল উত্তর দিল—"না।"

"বাড়ীতে আর বনবে না তা আমি জানতুম। তা' কোন্ জায়গায় যাওয়া ঠিক করেছ?"

হেমেন্দ্র মুখ নীচু করিয়া ধীরে ধীরে উত্তর দিল—"ঠিক কিছুই করি নি।"

"ঠিক না করেই টিকিট কিনবে নাকি? সঙ্গে কে' আছে? জিনিষ পত্র কই?"

এ কি পরিহাস! হেমেন্দ্রের লোকজন, জিনিষপত্র—তা'র কি আছে?—কে আছে?

ম্লান মৃদু হাসিয়া বলিল—"সঙ্গে কে' থাকবে যোগেশ? যখন বাড়ী থেকে এসেছিলুম, সঙ্গে কে' এসেছিল? যেমন এসেছিলুম তেমনি যাচ্ছি। শুধু যে বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন, সেইটাই বইতে হবে।"

"এর নাম তোমার পশ্চিম যাওয়া? পশ্চিমে গিয়ে কি করবে, চলবে কেমন করে?"

হেমেন্দ্রের আরক্ত মুখ বিবর্ণ হইয়া আসিল। সম্মুখে দিগন্তপ্রসারী সংসার-সমুদ্র, সে গলায় কলসী বাঁধিয়া তাহাতে ঝাঁপ দিতে আসিয়াছে, সাঁতার জানে না। তথাপি গর্ব্বের সহিত কহিল—"কোথাও একটা চাকরী দেখে নে'বো, ভিক্ষের ভাত আর খাব না।"

যোগেশ মৃদু হাসিল, বলিল—"ভিক্ষে?"—সবই তো তোমার। বুড়োর ভীমরতি হয়েচে বলে দেশের আইন আদালতও কি উঠে গেল? ওই আদালতে প্রমাণ করুক গে না, কেমন সে বিনোদের স্ত্রী।"

হেমেন্দ্রের চোখের সম্মুখ হইতে যেন একখানা কাল পর্দ্দা কে টানিয়া লইল। তাই তো—হস্তী মূর্খ বিনোদের মত সেও অভিমানে দেশ ছাড়া হইবে নাকি? তাহাতে ক্ষতি কার?—সাগ্রহে বলিয়া উঠিল—"কিন্তু শ্বশুর তো আমাদের সাহায্য কর্ব্বে না, আমার তো কিছুই নেই—"

যোগেশ বন্ধুর পিঠ চাপড়াইয়া উৎসাহিত করিয়া কহিল—"কিছু ভেব না, আমি সব ঠিক করে দেব। এখন কোথায় থাকবে? ফরেসডাঙ্গায় আমার এক শালীর বাড়ী আছে, চল—তোমাদের সেখানে নিয়ে যাই, ড়ীখানা খালি পড়ে আছে।

একটু পরেই একখানা প্যাসেঞ্জার গাড়ী ছাড়িবে, যোগেশ গিয়া শান্তিকে বলিল—"বৌদি! এখানে দাঁড়িয়ে কেন? গাড়ীতে এসে বসুন চারদিকে ভদ্রলোকের ভিড় দেখছেন না?"

শান্তি দ্বিরুক্তি না করিয়া যোগেশের সহিত আসিল। হেমেন্দ্র দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত ভাবিল, যোগেশ না জানি কি উপায়েই তাহার মন ফিরাইয়াছে!

ট্রেণ ছাড়িয়া দিলে একে একে জনকোলাহলময়ী নগরীর দৃশ্য চক্ষের মুখ হইতে সরিয়া গেলে—শান্তি যখন মুখ ফিরাইল, হেমেন্দ্র দেখিল, রাত্রির ভিতর তার যে পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, বহু বৎসরেও তেমন হয় না। সে ভিতরে ভিতরে একটু শিহরিয়া উঠিল। একবার মনে করিল—"কাজ নেই—শান্তিকে লক্ষ্মীপুরেই ফিরিয়ে দিই!" কিন্তু দারুণ আত্মাভিমান পরমুহূর্ত্তে তিরস্কার করিয়া উঠিল—ভীরু! স্ত্রীর জন্য নিজেকে লোকের কাছে হেয় করিবে?—হেমেন্দ্র জোর করিয়া মনের কোমলতাটুকু পদদলিত কীটের মত দূরে নিক্ষেপ করিয়া যোগেশের কাছে সরিয়া বসিল।

যোগেশ বন্ধুকে মৃদুস্বরে নানাবিধ পরামর্শ দিতে দিতে মধ্যে মধ্যে

শান্তির ভাব লক্ষ্য করিতেছিল? হেমেন্দ্র না বুঝিলেও সে বুঝিয়াছিল, শান্তি বাহিরের লোকের সম্মুখে আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্যই শুধু আসিয়াছে, তার মুখে আশাহীন অকথ্য ব্যথার নিদারুণ চিহ্ন কশাঘাত-চিহ্নের মতই সুস্পষ্ট রেখায় ফুটিয়া রহিয়াছিল। সকরুণ নেত্রে যোগেশ মনে মনে বলিল—"তোমার ভাগ্যে অনেক দুঃখ আছে, তুমি য'ার হাতে পড়েছ, সে তোমায় চিনবে না, তোমার মূল্য বুঝবে না, তবে আমি যেটুকু পারি, তোমার মঙ্গল চেষ্টাই করব।—আমি তোমার বন্ধু।"

৩৫

চন্দননগর ষ্টেশনে নামিয়া একখানা ভাড়াটে গাড়ীর সাহায্যে মাইলটাক পথ অতিক্রম পূর্ব্বক হেমেন্দ্র ও শান্তিকে যোগেশ তার শ্যালী-গৃহে আনিয়া উপস্থিত করিল। গ্রাম প্রান্তে জনবিরল এক গলির ভিতর কলমীদল, পদ্ম ও পানাভরা পুষ্করিণীর পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইটে গাঁথা ছোট একখানি বাড়ী। দেওয়াল আগাছায় ভরা, দ্বারে তালা লাগান। যোগেশ বলিল—"তালাটা ভেঙ্গে ফেলা যা'ক।" হেমেন্দ্র আপত্তি করিয়া কহিল—"না, না, তালা ভেঙ্গে পরের বাড়ী ঢোকে না। আর তা ছাড়া যোগেশ, এই পচা পুকুরের ধারে—এই নোংরা জায়গায় একদিন থাকলে আমি প্লেগে মারা যা'ব, এখানে আমায় তুমি কি করতে আনলে?"

যোগেশ মুখ টিপিয়া একটু হাসিল—"হ্যাঁ, বাড়ীটা তেমন ভাল নয়, তা দু'দিন কষ্ট করে থাকলে হতো? টাকাকড়ি তেমন কিছু তো

আমাদের সঙ্গে নেই, এই দেখ না—মোটে সতের টাকা পাঁচ আনা তিন পয়সা আর বাকী আছে।”—ইহা বলিয়া হেমেন্দ্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত মনিব্যাগ খুলিয়া তাহাকে দেখাইল। আকস্মিক একটা লজ্জার আঘাতে হেম আরক্ত হইয়া উঠিল। লজ্জার আবরণ সে যেন আর নিজের উপর টানিয়া রাখিতে পারিতেছিল না, জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের ন্যায় কেবল তার মধ্য দিয়া ফাঁক বাহির হইয়া পড়িতেছিল। আহতগর্ব্ব হেমেন্দ্র—মন্ত্রনিরুদ্ধ বীর্য্যহীন সর্পের মত মনের মধ্যে গুমরিতে লাগিল। জীবনে যে বিনা সংগ্রামে পূর্ণজয়ী হইয়া নিজেকে কমলার বরপুত্র বলিয়া জানিয়াছিল, তার সেই প্রচণ্ড অহঙ্কারে এত শীঘ্র এমন করিয়া আঘাত-দান—এ কি বিধাতার বিড়ম্বনা নয়!

তালা ভাঙ্গিয়াই গৃহ প্রবেশ করা হইল। যোগেশ শান্তিকে একটা ঘর দেখাইয়া দিয়া কহিল—“আপনি ঐ ঘরে গিয়ে খাটের উপর একটু শুয়ে নিন, বড্ডই ক্লান্ত হয়েছেন। আমি এখনি সব জোগাড় করে ফেল্‌লুম বলে!” শান্তি নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল—মানববর্জ্জিত গৃহ ধূলায় ও ঝুলে ভরিয়া গিয়াছে। ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণে দু’চারটে কৃষ্ণকলি, ও ডেঙ্গোশাকের সঙ্গে বিস্তর আগাছা জন্মিয়াছে, এক ধারে তুলসীহীন তুলসী মঞ্চ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, যোগেশ সম্মুখের ঘরের শিকল খুলিবামাত্র দুইটা চামচিকা ভাঙ্গা জানালা দিয়া উড়িয়া গেল। ঘরের ঠিক সম্মুখেই পাখীর পালক প্রভৃতিতে নিতান্ত অপরিষ্কৃত ঘরের মধ্যে একখানি তক্তাপোষ ও বড় একটা কাঠের ভাঙ্গা সিন্দুক পড়িয়া আছে, একটা কুলুঙ্গীতে গোটা দুই মুণ্ডভাঙ্গা পুতুল ও ঘরের মেঝেয় খানকতক ছেঁড়া কাগজ ভাঙ্গা হাঁড়ি ও আবর্জ্জনার রাশি। হেমেন্দ্র ঘরে ঢুকিয়াই দুই পা পিছাইয়া আসিল, ভারাক্রান্ত বদ্ধ বায়ুতে মুহূর্ত্তেই সে হাঁপাইয়া উঠিতেছিল, যোগেশ জানালাগুলা খুলিয়া কোঁচার কাপড়ে তক্তাপোষের ধূলা ঝাড়িয়া

ব্যবহারোপযোগী করিয়া দিল, এবং স্তম্ভিত হেমেন্দ্রের দিকে ফিরিয়া বলিল—"এসো ছোটবাবু! তুমি এইখানে বসে বিশ্রাম কর, আমি একটা লোক ও কিছু খাবারের চেষ্টা দেখি।" হেম চৌকাঠের নিকট হইতে খুব সাবধানে কোঁচা গুটাইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভীতভাবে বলিয়া উঠিল—"এ যে ভয়ানক ড্যাম্প! ডিপথিরিয়া হয়ে মরতে হ'বে দেখচি!"

যোগেশ মনে মনে হাসিল কিন্তু বাহিরে সহানুভূতি দেখাইতে ত্রুটি করিল না, বলিল—"কি করবে ব'ল, বিধির বিড়ম্বনা একেই বলে! দু'দিন কষ্ট সহ্য কর, আবার দিন ফিরে আসবে, তখন সুদ শুদ্ধ মেটাবো, যে তোমাকে এতটা কষ্ট দিলে, তা'র কি ভাল হ'বে, ভগবানই বিচার করবেন।"

হেমেন্দ্র আবেগের সহিত যোগেশকে আলিঙ্গন করিয়া গদ গদ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"ভাগ্যে তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল যোগেশ! তুমিই জগতে আমার প্রকৃত বন্ধু।

যোগেশ বলিল—"ও কথা বলো না, ছোটবাবু! আমরা চিরকাল তোমাদের দোরেই মানুষ, ক্ষমতা কতটুকু।—তবে হঁ্যা, এ প্রাণটা দিয়েও যদি তোমাদের বংশের মানমর্য্যাদা রক্ষার সাহায্যটুকুও কর্‌তে পারি, তা'তেও আমি পিছুব না। শাস্ত্রে বলে—'রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ।'—তা আমি রাজদ্বারে দাঁড়াবার সব ব্যবস্থা করে দেব—কোন ভাবনা নেই।"

হেমেন্দ্র আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে পুনশ্চ কহিল—"তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই যোগেশ, ভাগ্যে তোমায় পেয়েছিলুম!"

যোগেশ একজন দাসী ও কিছু আহার্য্য যোগাড় করিয়া যখন বাড়ী ফিরিল, তখন হেমেন্দ্রের ঘড়িতে দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা

ও ক্লান্তিতে অবসন্ন হইয়া সে সেই শয্যাহীন তক্তাপোষের ধূলিলাঞ্ছিত-বক্ষ আশ্রয় করিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, পদশব্দে জাগিয়া উঠিল। কিনিয়া আনা কাঁচের গ্লাসে ঠাণ্ডাজল ও কিছু কেনা খাবারে জ্বলন্ত ক্ষুধা নিবৃত্ত করিয়া হেম বলিল—"কি জঘন্য জিনিষই কিনেচ হে! কলেরা না হয়। —তুমিও কিছু খেয়ে নাও, তা'রপর এসো, একটা কিছু পরামর্শ দাও, আমি তো ভাই, দু'দিন এ অবস্থায় থাকলে মারা পড়ব।"

যোগেশ হঠাৎ ঈষৎ রুক্ষস্বরে বলিয়া ফেলিল—"বৌদিকে একবার দেখবে না? আশ্চর্য্য লোক তো তুমি! সে বেচারা এখনও মুখে একটু জলও দেয় নি, আমরা তো তবু শ্রীরামপুরে চা-টা খেয়ে নিয়ে ছিলুম।" হেমেন্দ্র একটু অপ্রতিভ হইল, তা'র পর একটু ভাবিয়া কহিল—"তুমিই গিয়ে ব'ল না।" যোগেশের সমস্ত হৃদয় তাহাকে তৎক্ষণাৎ সেই দিকেই টানিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি সে সেই প্রলোভন হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টায় চঞ্চলস্বরে বলিল—"তা কি হয়? তুমি যাও, আমি ঝিটাকে দিয়ে খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।" হেমেন্দ্র অগত্যা উঠিল। তাকে উঠিতে দেখিয়া যোগেশ বিশেষ খুসী হইল না।

হেমেন্দ্র আসিয়া দেখিল, রুদ্ধদ্বার ক্ষুদ্র গৃহে ধূলির উপর শান্তি চুপ করিয়া বসিয়া আছে। সে তার মুখ দেখিতে পাইল না, কিন্তু ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিল, সে কাঁদে নাই, এবং অনেকক্ষণ হইতেই এই অবস্থায় রহিয়াছে। মনে মনে একটু সঙ্কুচিত হইয়া ডাকিল—"শান্তি!"

শান্তি উত্তর দিল না, হেমেন্দ্রও অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এমন বিপদেও সে পড়িয়াছে। অথচ রাগ করাও অনর্থক! সে রাগই বা বুঝিবে কে?—এবার একটু উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—"শান্তি—" শুন্‌চো?" শান্তি মুখ ফিরাইল, প্রশ্নহীন মৌনদৃষ্টি একবারমাত্র স্বামীর

মুখে স্থাপন করিয়া আবার চোখ নত করিল, ঈষৎ লজ্জার সহিত হেম তার হাত ধরিয়া কহিল—ওঠ, মুখে একটু জল দাও—এসো—উঠে এসো।” কোন কথা না কহিয়া শান্তি শুধু হাত টানিয়া লইল, নির্ব্বাক ওষ্ঠ একটু কম্পিত হইয়াই থামিয়া গিয়াছিল, চোখের পাতা আর একটুখানি নামিয়া আসিল মাত্র। নিতান্ত অপমান বোধ করিয়া হেমেন্দ্র দ্রুতপদে চলিয়া গেল। যোগেশকে গিয়া বলিল—“বল্লুম তুমি বলগে, তা'হ'ল না।” ব্যর্থরোষে জ্বলিয়া যোগেশের প্রতিই সে আক্রোশ মিটাইল। “আমায় জ্বালাতন কর্ব্বার ফন্দি বৈত নয়!” যোগেশ বিরক্ত হইল না, খুসী হইয়াই উঠিয়া গেল।

দ্বারের নিকটে আসিয়া যোগেশ 'বৌদি' বলিয়া ডাকিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। তার সম্মুখে কোন ক্ষমতাপন্ন চিত্রকর নির্ব্বাসিতা সীতার চিত্রটি কি আঁকিয়াছে? করুণস্বরে কহিল—“বৌদি! উঠে আসুন, মুখ হাত ধুয়ে একটু জল টল খেয়ে নিন্, নৈলে যে আমি প্রসাদ পাই নে”—এবার শান্তির নিষ্ফলপ্রায় হৃৎপিণ্ড সহসা চঞ্চল হইয়া উঠিল, তুষার যেমন সূর্য্যকিরণে সহসা গলিয়া জলে পরিণত হয়, তার বুকের মধ্যকার জমাট বাঁধা বেদনা তেমনি সেই সহানুভূতির স্বরটুকুতে গলিয়া পড়িল, কষ্টে অশ্রুরোধ করিয়া সে মাথার উপর ঘোমটা টানিয়া দিল। যোগেশ একবার চকিত কটাক্ষে তার মুখের দিকে চাহিয়া আবার বলিল—এবার স্বর ছোট করিয়া একটু কাছে আসিয়া বলিল—“আমার কথা শুনুন, আমায় বিশ্বাস করুন, আমি প্রকৃতই আপনাদের হিতাকাঙ্ক্ষী—আমি শীগ্‌গিরই সব ঠিক করে দোব, দু'দিনেই আবার আপনি লক্ষ্মীপুরের লক্ষ্মীরূপে সেখানে ফিরে যা'বেন, আমার প্রাণ থাকতে আপনাদের কোন ক্ষতি হ'তে দোব না, এই আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করলুম।” যোগেশের স্বর কাঁপিতেছিল, হঠাৎ সে চুপ করিল।

শান্তির চোখে তখন অশ্রু ঝরিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে বিস্ময়ের সহিত যোগেশের প্রতি চাহিয়া তার উৎসাহিত মুখের সাগ্রহ দৃষ্টিতে কিছু আশ্বস্ত হইল। যোগেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পুনশ্চ আবেগের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"বলুন, আমি আপনার জন্যে কি করতে পারি? আমায় লজ্জা করবেন না, আপনি লক্ষ্মীপুরে যেতে চা'ন না রজনীবাবুর কাছে? বলুন—আমি তা'র ব্যবস্থা কর্ব্বো—

শান্তির শিরায় শিরায় উত্তেজনার আনন্দ—স্রোতের মত বহিয়া গেল। বালিকার মত সরল বিশ্বাসে উৎফুল্ল হইয়া বলিল—"জ্যেঠামশায়ের কাছে যাবো—"

যোগেশ আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়া সসম্ভ্রমে কহিল—"আমি চেষ্টা করবো, বিশ্বাস করুন, সে চেষ্টা আমার সফলও হবে।"

এদিককার একরকম বন্দোবস্ত ক'রিয়া যোগেশ হেমকে বলিল— "টাকার জন্যেই তো বড় মুস্কিল দেখচি, ছোটবাবু। এখনও মশারি আর একটা ড্রেসিং টেবিল কিনতে বাকি—এর মধ্যেই তো দেড়শো টাকা ধার হয়ে গেছে, কি করি?"

হেমেন্দ্র বিছানায় পড়িয়া অপরিচ্ছন্ন দেওয়াল ও ছাদ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল, যোগেশের অভিযোগ শুনিয়া তার অপ্রসন্ন চিত্ত আরও অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল, অধীরভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল—"আমার কি কোথাও তালুক মুলুক আছে?"

"তা'ই তো, শুধু হাতে এখানে যে কেউ ধার দিতে রাজী হয় না। বলে, সত্যি জমিদার হ'লে কি ঐ বাড়ীতে থাকে?—এ আবার ফরাসী মুলুক, ওরা ভয় পায়, যদি এর পর কিছু গোল বাধে।—আমার তো জান—'অভ্যভক্ষ্যধণুর্গুণ'।"

হেমেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। সে কি বলিবে? তার নিকট তো একটি

কপর্দ্দকও নাই, সে কি হাতে কিছু রাখিত? হাত খরচ যা পাইত তাহার খরচই কুলাইত না—উপায়?

এমন ভয়ঙ্কর স্থান এই সংসার যে, এক মুহূর্ত্ত মাত্র তার মধ্যে বাস করিতে হইলেও অর্থের প্রয়োজন? একটা দিনের জন্তও কেহ কাহারও পাওনা মাপ করিবে না? বেশ,—তবে সেই বা কেন ছাড়িবে? এ অপমান, এ কষ্টের প্রতিশোধ সেই বা কেন লইবে না? যে প্রতারিকা নারী তার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে আসিয়াছে, তাকে চূড়ান্ত শাস্তি দিবেই দিবে।

হেমেন্দ্রকে নীরব দেখিয়া যোগেশ বলিল—"এক কাজ কর, তোমার শ্বশুরকে লেখ কিছু টাকা পাঠাতে।"

গভীর ঘৃণার সহিত তীব্রস্বরে হেমেন্দ্র বাধা দিল—"চুপ! ওর নাম করো না। এই ঘড়ির চেনটা রেখে কোথাও থেকে টাকা আনো। জানো তো, ওর দাম বড় কম নয়।"

রাত্রে সুন্দর জ্যোৎস্না ফুটিয়াছিল, আকাশ একেবারে মেঘশূন্য, চাঁদের আলোয় আকাশভরা নক্ষত্র দীপ্তিহীন দেখাইতেছে। হেমেন্দ্রর শয়নকক্ষের খোলা জানালার মধ্য দিয়া গৃহতলে জ্যোৎস্নালোক প্রবেশ করিয়াছিল, অল্প অল্প বাতাস গৃহসম্মুখস্থ বাঁশ বনের পাতা কাঁপাইয়া, ঘরের মধ্যে মশারি ও জানালার কাপড় দুলাইয়া ফিরিতেছিল। যোগেশ শান্তির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, ডাকিল—"বৌদি!" ধ্যানমুগ্ধার মত শান্তি নীরবে জানালার নিকট বসিয়াছিল, চমকিয়া মুখ ফিরাইয়াই সে মাথায় ঘোমটা টানিতেছিল, যোগেশের অনুযোগে নিবৃত্ত হইল। যোগেশ বিস্ফারিত নেত্রে তার জ্যোৎস্না-বিধৌত মুখের পানে চাহিয়া রহিল, সে কি বলিতে আসিয়াছিল, বোধ করি মনে পড়িতেছিল না। প্রত্যাশিত নেত্রে তাহাকে মুখের দিকে ঠায় চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া

শান্তির চোখ আপনা আপনি নত হইয়া আসিল। ক্ষণপরে দৃষ্টি উঠাইয়া শান্তি দেখিল, তখনও সে তেমনি করিয়া চাহিয়া আছে। ঈষৎ অস্বস্তি অনুভব করিয়া একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, যোগেশ তার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত—তার একি আচরণ!

শান্তিকে উঠিতে দেখিয়া যোগেশ নিজের দুর্ব্বলতায় লজ্জিত হইয়া তৎক্ষণাৎ আত্মসম্বরণ করিয়া লইয়া কহিল—"আপনি শু'তে যা'ন, বৌদি! অনেক রাত হয়ে গেছে।" তার কথায় ও স্বরে শান্তির বিশ্বাস ও আশা আবার যেন হতাশান্ধকার হৃদয়প্রান্তে জাগিয়া উঠিয়া সেই এক মুহূর্ত্তের সন্দিগ্ধতার জন্য তাকে তীব্র তিরস্কার করিল। সে তখন সাগ্রহে বলিয়া উঠিল—"কবে আমি লক্ষ্মীপুরে যেতে পাবো আগে বলুন—"

যোগেশ আনন্দরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল—"শীগ্‌গিরই যা'বেন।—আমি —আমি সব ঠিক করে দেব। বিনোদবাবুর বউ সেজে যে মাগী আপনার এই কষ্টের কারণ হয়ে এসেছে, সেই জালিয়াৎনীকে জেল খাটাব, তবে আমার নাম যোগেশ মিত্তির।"

পথের মধ্যে চলিতে চলিতে বিশ্বাসী পথিক সহসা সম্মুখে দংশনোদ্যত কালসর্পকে ফণা ধরিয়া দাঁড়াইতে দেখিলে আতঙ্কে যেমন আঁৎকাইয়া উঠে, যোগেশের কথায় শান্তিও ঠিক তেমনি করিয়া চমকাইয়া আড়ষ্ট হইয়া গেল। তবে তার কোন আশা নাই? তবে সে যে এতক্ষণ নূতন আশায় কল্পনা-কানন সৃজন করিতেছিল, সে মরীচিকা?

তার মনের অবস্থা ঠিক না বুঝিলেও সে যে তার এই কথায় খুসী হয় নাই, যোগেশ সেটা বুঝিল, কিন্তু তাকে কি বলিলে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে বুঝিতে পারিল না। দূরে বারদোয়ারীর পেটা ঘড়িতে রাত্রি দ্বিপ্রহর ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে অদূর পথে চৌকিদার হাঁকিয়া গেল, যোগেশ একটু

সরিয়া দাঁড়াইয়া সসম্ভ্রমে কহিল—"যা'ন—আপনি শু'তে যা'ন, অনেক রাত হয়ে গেছে—"

কলের পুতুলের মত সে ঘর হইতে শান্তি বাহির হইয়া গেল। হেমের ঘরে ঢুকিতে তার পা জড়াইয়া আসিতেছিল, বিদ্রোহী চিত্ত পুনঃ পুনঃ বিমুখ হইয়া সবলে তাকে বিপরীত দিকে টানিতেছিল, তথাপি সে অনিচ্ছামন্থরগতিতে ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিয়া বিছানার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। হেমেন্দ্র তখনও ঘুমায় নাই, শান্তির চুড়ির শব্দে চাহিয়া দেখিল—"এতক্ষণ ও ঘরে কি হচ্ছিল, শান্তি?" প্রশ্ন শুনিয়াই শান্তির হাতখানা মুহূর্ত্তে মশারির প্রান্ত হইতে সরিয়া আসিল। সে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইল, বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া ক্রুদ্ধস্বরে হেমেন্দ্র বলিল—"যোগেশ আমার খুব বন্ধু তা' সত্যি, কিন্তু তাই ব'লে রাত দুপুর পর্য্যন্ত তা'র সঙ্গে গল্প করা আমি পছন্দ করি নে, এ রকম নির্ল্লজ্জতা তোমার বাপ তোমায় শিখিয়েছেন, তা' জানি, কিন্তু আমার স্ত্রী হয়ে ও চলবে না।"

মানুষের শরীর কিংবা মনের যেখানটায় খুব বড় রকমের আঘাতের বেদনা দপ্ দপ্ করিতেছে, ঠিক সেইখানে সামান্য আঘাত লাগিলেও অত্যন্ত সহিষ্ণু যে, সেও আচমকা একটা যন্ত্রণা ধ্বনি করিয়া উঠে, আজিকার এই হীন তিরস্কারের মধ্য দিয়া হেমেন্দ্র প্রতিহিংসার বিষ নিষ্ঠুরভাবেই ঢালিয়া দিয়াছিল, পিতা ও কন্যার—তার প্রতি ব্যবহার সে ভুলে নাই—সুযোগ পাইলে প্রতিশোধ না লইয়া ছাড়িবে কেন?

কিন্তু আজিকার এ আঘাত শান্তির পক্ষে সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিয়াছিল, সে এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া ঘর হইতে দ্রুত বাহির হইয়া গেল, মনের ঝাল ঝাড়িয়া লইতে পারায় হেম ঈষৎ লঘুচিত্তে শয্যা

আশ্রয় করিল। সমস্ত দিন ধরিয়া সে শান্তিকে অপমানিত করিবার একটা পথ খুঁজিতেছিল।

তখন পাশের ঘরে শান্তির পরিত্যক্ত ভূমিতে শয্যা বিছাইয়া যোগেশ জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নক্ষত্রবিভূষিত আকাশের দিকে চাহিয়া ভাবিতে ছিল—"হেমের কাজে আমার প্রাণ দিতে হয়, তাও আমি দেব, আহা!—আমার দ্বারা যদি শান্তির একটু উপকারও হয়, তা হ'লে আমার জন্ম সফল হবে। হেমটা কি হতভাগ্য, এমন রত্ন সে চিনলে না!"

৩৬

মাটিতে লুটাইয়া মন খুলিয়া কাঁদিবার ইচ্ছা প্রবল হইলেও প্রাণপণ বলে শান্তি সে ইচ্ছা দমন করিয়া দেওয়ালে পিঠ রাখিয়া পাথরের মত শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গভীর রাত্রি—বাঁশবন হইতে শৃগালের ডাক ভিন্ন কোন জীবিতপ্রাণীর অস্তিত্ব জানা যাইতেছিল না, মাথার উপর আকাশ ভরিয়া নক্ষত্র ফুল ফুটিয়া আছে, তাদের মধ্যে রৌপ্য-কিরণবর্ষী চাঁদ হাসিতেছে, এই বৈচিত্র্যময়ী সুখোজ্জলা ধরণী—এই পরিপূর্ণ আশা নীরব রাত্রির বিহ্বল-রাগিণীর অফুরন্ত তান, এ সমস্তই দলিত চিত্ত শান্তির নিকট কুহেলিকা-সমাচ্ছন্ন নিরানন্দময় বোধ হইল।

নিস্তব্ধ জ্যোৎস্না ধারার মধ্যে একা দাঁড়াইয়া স্পন্দহীন চক্ষে সে একবার অতীতের পানে ফিরিয়া চাহিল—সুখের অতীত—সাধের অতীত সে কত না আনন্দের, কি না গৌরবেরই ছিল! কি মধুর তার স্মৃতি! সেই তারা দু'টি ভাই বোনে একসঙ্গে খেলা করিত,

একসঙ্গে ঘুমাইত, একসঙ্গে ছোট দু'টি প্রজাপতির মতই তাদের বাগানে ছুটিয়া বেড়াইত, ছোট পাখীগুলির মতই আপনার মনে সম্মিলিত কণ্ঠে দুজনে গান গাহিত, হাসিত, খেলিত—চিন্তা দুঃখবিহীন কি নিশ্চিন্ত সানন্দ সে জীবন! সে সব আজ নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। ক্ষুদ্র একখানি হৃদয় মাত্র—তার উপর কত দিক হইতে কত স্নেহ বর্ষিত হইত! শান্তির চোখ দিয়া হুহু করিয়া জল ঝরিতে লাগিল।—সে স্বপ্ন তার কেন ভাঙ্গিল?—কোনও রূপেই কি আর সে অতীতকে ফিরাইয়া আনা যায় না?—হে ভগবান! একবার, শুধু—একবার!—"এখনও আপনি জেগে আছেন, বৌদি?"—সহসা এই কথা শুনিয়া চমকিয়া সে চাহিয়া দেখিল—সম্মুখে তার যোগেশ। যোগেশের আবির্ভাবে সহসা সচেতন হইয়া শান্তি শিহরিয়া উঠিল—দেখিল, অতীত সুখ স্বপ্নের পরিবর্ত্তে কঠোর বাস্তব তার বিরাট অন্ধকার ও অপর্য্যাপ্ত বেদনা লইয়া শুদ্ধ রজনীর অবিচ্ছিন্ন রাগিণীর তালে তাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে—ইহার মাঝখানে সে একেবারে নিঃসহায় একা! যোগেশের দ্রুত নিশ্বাসের শব্দ সহসা সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া শান্তির নিস্পন্দপ্রায় শরীরে শক্তি সঞ্চার করিল, উত্তেজনায় মাথার মধ্যে রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। বিস্ময়-হীন কোমল কণ্ঠে যোগেশ কহিল—"বৌদি! তুমি কি চাও, আমায় ভাল করে বুঝিয়ে দাও তো! তুমি যা বলবে, আমি তাই করতে রাজী আছি—শুধু তুমি বল—নিজের মুখে হুকুম দিয়ে আদেশ করো—"

শান্তি অস্ফুটকণ্ঠে বলিল—"না, না—আমি কিছুই চাই নে, কিছুই না—আমার সঙ্গে কথা কইবেন না।"—বলিতে বলিতে সে পাগলের মত হেমেন্দ্রের ঘরের দিকে ছুটিয়া গেল। যোগেশ এই অদ্ভুত ব্যবহারের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া প্রথমে হতবুদ্ধি হইয়া রহিল, তারপর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া গেলে মুহূর্ত্তের মধ্যে সমুদয় ব্যাপারটা তার চোখের

সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল, শান্তি ঘরে প্রবেশ করিবার পরেই সে যেন হেমেন্দ্রের উত্তেজিত কণ্ঠের সাড়া পাইয়াছিল না? ঠিক হইয়াছে —যোগেশের নামটাও যেন শোনা গিয়াছিল! যোগেশ রোষে ক্ষোভে অধর দংশন করিল—"বটে, এটুকু পর্য্যন্ত সইল না?—আচ্ছা, দেখা যাক্, এই যোগেশ নইলে তোমার কেমন করে চলে! একবার মজা দেখাই তবে? অকৃতজ্ঞ!—এত সন্দেহ, এত ভয়, তোমার!"

যোগেশ সহসা একটু কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, ভাবিল—"সেও কি তাকে অবিশ্বাস করেছে? ছি ছি, না, এমন কি দোষ করেছি?—আমার উদ্দেশ্য কিসে মন্দ? শুধু মায়া হয়েছিল—ওদের অনেক খেয়েছি, পা'বারও আশা রাখি, তাই—তবে চাঁদকে দেখে চোখ বুজবে—এমন মূর্খ কে আছে? ফুলটি দেখে মন যে সুন্দর বলে' তারিফ করে—তা'তে মনের দোষই বা কি?"

খোলা জানালার মধ্য দিয়া সূর্য্যকিরণ চোখে পড়ায় অনভ্যস্থ প্রত্যূষে হেমেন্দ্রের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে ইচ্ছা ছিল না, জানালাটা বন্ধ করিতে বলিতে গিয়া হঠাৎ পূর্ব্ব রাত্রির ঘটনা মনে পড়িল, মনটা কাজেই একটু খারাপ হইল—শান্তি গেল কোথায়? অজানা যায়গা, বাড়ীর গায়েই একটা পচা পুকুরও আছে। নূতন করিয়া আর ঘুমান হইল না, বিরক্তিভরে উঠিয়া বাহিরে আসিতেই দেখিল, দ্বারের পার্শ্বে মাটিতে আঁচল পাতিয়া শুইয়া শান্তি ঘুমাইয়া আছে। আকস্মিক দুর্ভাবনার আতঙ্ক হইতে মুক্ত হইয়া হাঁপ ছাড়িল।

প্রভাত হইয়াছিল—সুন্দর উজ্জ্বল প্রভাত—উদার উন্মুক্ত আকাশে বিহঙ্গপক্ষের মত লঘু শুভ্র মেঘমালা প্রাতঃসূর্য্যের স্বর্ণময় কিরণে বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে, চারিদিকে গাছপালা হইতে পাখার কাকলি, পাতার

মর্ম্মর ও ভালমন্দ ফুলের গন্ধ একসঙ্গেই ভাসিয়া আসিতেছিল। হেমেন্দ্র চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়া কি ভাবিয়া দাঁড়াইল।

সেই ঈষৎ রাঙ্গামেঘের আরক্ত ছায়ায় শান্তির বিবর্ণ ললাটে গণ্ডে এক স্নিগ্ধ রক্তিমা ফুটিয়া উঠিয়াছে। আলুথালু কাল চুলের রাশি খুলিয়া পড়িয়া পত্রান্তরালস্থিত সাদা কেতকীর মত আধখানা মুখ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, মুখের উপর সর্ব্বসন্তাপহরা নিদ্রাদেবী যদিও সকল বেদনা সকল ক্লান্তি মুছিয়া লইয়া প্রশান্ত বিশ্রাম দান করিয়াছেন, তথাপি সেই নিদ্রা মুদিত চোখের কোলে—অশ্রুর দু একটি বিন্দু সকালবেলার শিশির কণাটির মত তখনও ঢলঢল করিতেছিল, প্রাতঃসূর্য্যের মত সেই গৌরবোজ্জ্বল মুখ একবার হেমেন্দ্রের অন্ধকার চিত্তে কিরণরশ্মি ছড়াইয়া দিয়া তার হৃদয়ে প্রেমের বাতি জ্বালিয়া তুলিল—হেম শান্তির মাথা কোলে তুলিয়া সেইখানে বসিয়া সন্তর্পণে তার মুখের উপর হইতে চুলের গোছাটা সরাইয়া অত্যন্ত আবেগের সহিত অনুতাপ ও আত্মগ্লানিপূর্ণ-চিত্তে তার ক্লিষ্ট অধরে চুম্বন করিল।

"শান্তি! আমায় মাপ কর, শান্তি! কাল আমার মাথার ঠিক ছিল না, কি বলতে কি বলে ফেলেচি—ভুলে যাও।"—জাগিয়া প্রথমটা শান্তি বুঝিতে পারে নাই, সত্যই তার স্বামী তাকে এতটা আদর করিতেছে—সে ভাবিতেছিল, সে বুঝি ঘুমাইয়া স্বপ্নই দেখিতেছে বা!

হেম আবার মুখের উপর নত হইয়া ডাকিল—"শান্তি! রাগ করো না—কথাটা বড় শক্ত বলে ফেলেছি—লক্ষ্মীটি আমার! ক্ষমা করো।"

শান্তি সাশ্চর্য্যে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল, সত্য!—হেমেন্দ্রের এই সম্ভাষণ? অকস্মাৎ তার বেদনাবিদ্ধ বক্ষ আলোড়িত করিয়া বহুদিনের সঞ্চিত আঘাত ও অভিমানের ব্যথা এক সঙ্গে জাগিয়া উঠিল—সে স্বামীর কোলে মুখ লুকাইয়া সহসা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

আজিকার অম্লান প্রভাত তার নবীন সূর্য্যকরটিকে কি জানি কি সম্মোহন শক্তিতে প্রভাবশালী করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিল, আকাশে বাতাসে না জানি আজ কি সকরুণ প্রেমের রাগিণী বাজিয়া উঠিয়াছে! হেমেন্দ্র শান্তির অশ্রুসিক্ত কপোলে পুনঃপুনঃ চুম্বন করিয়া আদর করিয়া বলিল—“আমি তোমায় লক্ষ্মীপুরেই পাঠিয়ে দেবো, শান্তি, কেঁদো না তুমি।” হরি, দীনবন্ধু!—এও কি সম্ভব?—সত্যই কি শান্তির দুঃখ তোমায় স্পর্শ করিয়াছে প্রভু?—শান্তি চোখের জল মুছিবার বৃথা চেষ্টা করিতে করিতে সাগ্রহে কহিল—“আজই তবে যা'ব কি?”—হেম তার চুলের উপর হাত রাখিয়া মুখের প্রতি দৃষ্টি স্থির করিয়াছিল, প্রশ্নটায় সে একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল, কিন্তু—তা ছাড়া উপায় কি? এমন করিয়া কয়দিন চলিবে? দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—“কাল তোমায় পাঠিয়ে দেব—আজ আমার কাছে থাক।” শান্তির ম্লান চোখে আনন্দের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। স্বামীর বক্ষে মুখ রাখিয়া দুই হাতে তার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া সাগ্রহে কহিল—“এবার আমরা দুজনে খুব সুখেই থাকবো—”

হেমেন্দ্র বাধা দিল—“তুমি সুখেই থেকো, আমি তো যাব না।” শান্তির বাহুপাশ মুহূর্ত্তে কণ্ঠচ্যুত হইয়া পড়িল, বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া সে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল।

হেমেন্দ্র উঠিয়া গম্ভীর হইয়া কহিল—“আমি সেখানে যাব না। আর নাই বা গেলুম, আমার জন্যে কা'র কি ক্ষতি? কে আমায় চায়? তুমি যাও—সুখে থাকো, আমার যা খুসী তাই করব। আমার প্রতি কারুরই তো মায়া নেই, আমার বেঁচে না থাকাই ভাল।” হেমেন্দ্রের শেষ কথাগুলা অভিমানে জড়াইয়া আসিল।

শান্তি দেখিল, তা'র মুখ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে—উঠিয়া বসিয়া বেদনাপূর্ণ লজ্জায় সে স্বামীর হাত ধরিল—“তোমার পায়ে পড়ি ও সব

কথা বলো না—তোমার উপর কার স্নেহ কম ? কেন ও রকম মনে কর ? ফিরে যাই চল, আমি সব ছেড়ে এবার থেকে তোমার কাছে কাছে থাকবো।" হেমেন্দ্রের চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিল—শান্তির সমস্ত হৃদয়টি—তার একান্ত পূজা—সযত্ন সেবা—আর কিছু না হোক ইহাও তো সে পাইবে, সেই কি সামান্য ? আজিকার এই মুহূর্ত্তটির মত আনন্দ তো ইহার পূর্ব্বে শত ভোগ বিলাসের মধ্যেও সে পায় নাই ? কি সুন্দর, কি কোমল, কি অনবদ্য তার এই স্ত্রী—আর অন্ধের মত এতদিন সে তার মুখপানেও কি ভাল করিয়া চাহিয়া পর্য্যন্ত দেখে নাই ? ব্যগ্র করে শান্তিকে বুকে টানিয়া লইতে গেল, আবেগজড়িত কণ্ঠে বলিতে গেল—"তোমার শক্তি তুমি আমায় দিও—তোমার জন্যে আমি সব সহ্য করবো।"—কিন্তু তার পূর্ব্বেই পাশের ঘরের দরজা খোলার শব্দে শান্তি চমকিয়া সরিয়া গেল এবং যোগেশ বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল, তাহাকে দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া শান্তি ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল, হেম ডাকিল—"যোগেশ !"

হেমেন্দ্রের জন্য চা তৈয়ার করিয়া নূতন রাঁধুনীকে রান্নার যোগাড় করিয়া দিয়া যোগেশ হেমেন্দ্রের ঘরে আসিয়া দেখিল, শান্তি ও হেম নিবিষ্ট মনে কি কথাবার্ত্তা কহিতেছে, দুইজনের মুখেই একটা উৎসাহের দীপ্তি, শান্তির অধরপ্রান্তে লজ্জা-বিজড়িত সুখের হাসি, হেমেন্দ্রের মুখে তার স্বাভাবিক রুক্ষ অপ্রসন্নতার পরিবর্ত্তে কোমলতা পরিব্যক্ত।

যোগেশ ভাবিল—"একেই বলে—'দম্পতি-কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া'।" সে ডাকিল—"হেম!" শান্তি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া চলিয়া গেল, হেমেন্দ্র প্রসন্নচিত্তে ডাকিল—"এসো যোগেশ!"

আসন গ্রহণ করিয়া যোগেশ কহিল—"আমায় তো এখনি বাড়ী যেতে হ'চ্চে, ছোটবাবু! ছেলেটার বড্ড ব্যায়রাম দেখে এসেছি।"

হেমেন্দ্র হাসিয়া উঠিল—"এতক্ষণে ছেলের কথা মনে পড়ল? তা বেশ তো যোগেশ, কাল একসঙ্গেই সকলে যাবো, আমরাও তো লক্ষ্মীপুরেই ফিরছি—"

বটে! আর তোমার যোগেশকে দরকার নাই! প্রকাশ্যে কহিল—"তা'ই চল, মিথ্যে কেন এমন ক'রে কষ্ট পা'বে,—তা'র চেয়ে বড়লোকের বাড়ী গোমস্তাগিরি করাও ভাল!—বৌদিকে বলে দিও—সিধুঠাকরুণের হবিষ্যি বেড়ে যেন একটু ভাল করে ঘি ঢালেন।"

মুহূর্ত্তের মধ্যে হেমেন্দ্রের ললাটের শিরা স্ফীত হইয়া উঠিল, মাথার মধ্যে এককালে ঈর্ষার সহস্র বৃশ্চিক দংশন করিয়া উঠিল, চোখের সম্মুখে একখানা কালো মেঘ ঘনাইয়া আসিয়া সব অন্ধকার করিয়া ফেলিল।

সান্ত্বনা ও সহানুভূতির সহিত ধীরকণ্ঠে যোগেশ বলিল—"তা যা হোক, ছোটবাবু! তোমার শ্বশুর লোকটা খুবই চালাক, কর্ত্তাকে তিনিই যে উইল করতে বারণ করেচেন, সেটা আমি নিজের কানেই শুনেচি, তাঁ'র মতলব বোধ হয় বুড়ো মরলে, তোমায় অক্ষম প্রমাণ

করে নিজেই না-বালকের অভিভাবক হয়ে বসবেন, তা'রপর বুঝেছ তো?"

হেমেন্দ্র স্তম্ভিত হইল। যোগেশ এ কি বলিতেছে? সত্যই তার বিরুদ্ধে ভিতরে ভিতরে ঘোরতর ষড়্যন্ত্র চলিতেছে নাকি? সম্ভব বটে—ঠিক তা'ই!—সে কি মূর্খ! ছিঃ—ভাগ্যে যোগেশ ছিল!—সে একটু নড়িয়া বসিল, ঈষৎ সন্দিগ্ধভাবে বলিল—"তা' কি করে হ'বে? আমায় না দেখতে পারলেও নিজের মেয়ে তো আছে? আর—সত্যি কথা বলতে হবে, রাগ করুক, যাই করুক, সেটা স্বভাব—মেয়েকে ভালও বাসে।"

"হাঁা; তুমিও যেমন! মেয়ে আছে—আছেই। মেয়ের উপর দেখ্‌লে না? এমনই কি রাগ রে বাবু, যাতে মেয়ে জামাইকে কাঙ্গাল-ফকিরের মত রাত দুপুরে দূর্-দূর্ করে খেদিয়ে দিতে হয়?—তারা তো আর সত্যি কারুকে খুন করে যায় নি, ওরা উকিল মানুষ, জোঁকের জাত! টাকাই বোঝে—নিজের স্বার্থটাই বোঝে তোমার মত তো আর ভাল মানুষটি নয়! তুমি নিজের সর্ব্বস্ব ওদের ধরে দিয়ে একটি কথায় পথে দাঁড়ালে—যেমন! তা' যাই হোক, আমাকে তো আজ যেতেই হচ্চে, ঘরে একটি কড়িও নেই, না গেলে ছেলেটা বিনা চিকিৎসায় মারা যা'বে, আমরা তো টাকাওলা বাপ নই—যে সন্তানের অভাব টাকা নেড়ে ভুলে থাকবো, ছেলে মেয়ে আমাদের প্রাণ।"

উত্তপ্ত জল একটু তাপ পাইয়াই ফুটিয়া উঠিল। মূঢ়! এটুকু বুঝিবার শক্তি নাই? কি মোহেই সে ডুবিতেছিল! যোগেশের হাত ধরিয়া বলিল—"যোগেশ! তুমি আমায় ছেড়ে যেও না—তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই, আমার বল বুদ্ধি ভরসা—সব-ই তুমি!

কি করে আমার ন্যায়সঙ্গত অধিকার ফিরে পা'ব, আদালতে কি প্রমাণ হ'বে, ও মাগী বিন্‌দার বউ নয় ?"

যোগেশ মনের মধ্যে জয়ের হাসি হাসিয়া সদম্ভে বলিল—"ব'ল কি, এ তো হয়েই রয়েছে! বৃন্দাবনের বিশ-টে সাক্ষী হলপ নিয়ে বলবে যে, ও বিনোদবাবুর বিয়ে করা স্ত্রী নয়—কুছ পরোয়া নেই! সব ঠিক হয়ে যা'বে, তবে ভাবনা এই, তোমার মনের সৎসাহস আবার না কোন সময় বৌদির চোখের জলে ধুয়ে যায়।"

নিজেকে নিতান্ত অপমানিত বোধ করিয়া হেমেন্দ্র গর্জ্জিয়া উঠিল—"রেখে দাও, তোমার বৌদি! আমায় কি এম্‌নি পেয়েছ? আমায় কি করতে হ'বে ব'ল ?"

"প্রথমে একখানা উকিলের চিঠি বুড়োকে পাঠান যা'ক্, ভালয় ভালয় দেয় তো মন্দ কি ? নৈলে—হাতেই তো উপায় রয়েছে।"

হেমেন্দ্র শুনিয়া একটু চিন্তিতভাবে আপনা আপনি বলিল—"উকিলের চিঠি—কেমন যেন সঙ্কোচ হয়।"

"ঐ তো! গোড়াতেই বলেচি, ও-সব তোমার কর্ম্ম নয়! যাও, লক্ষ্মীপুরেই ফিরে যাও, তবে মাপ ক'রো তাঁ'রা কি তোমার মায়া করেছিলেন ? তোমার শ্বশুর যে শেয়াল কুকুরের মত সেই রাত্রে—"

"যোগেশ! থামো—তুমি যা বলবে, করতে রাজি, নাঃ, ভদ্রতা চক্ষুলজ্জা—সব আমার মন থেকে ধুয়ে গেছে—ভাগ্যে তুমি ছিলে!"

ইহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া পরামর্শ চলিল। ফলে যোগেশের বাড়ী ও শান্তির লক্ষ্মীপুর যাওয়া—বন্ধ রহিল।

লক্ষ্মীপুরের বাড়ীতে আবার সেই নিরানন্দ ও হতাশ্বাস দ্বিগুণিত হইয়া উঠিয়াছিল। শ্যামাকান্ত পীড়িত, ডাক্তারের প্রেস্ক্রিপশন ও কবিরাজের বড়িপাঁচন ব্যবস্থার ক্রটি না থাকা সত্ত্বেও রোগের কিছুমাত্র উপশম হইতেছিল না, মনের উপর যে রোগের প্রভাব অধিক, ঔষধ তার কি করিবে?

শিবানী সেবার ক্রটি করে না, কিন্তু শ্যামাকান্তের মনে হয় শান্তি হইলে ইহার স্থলে এই করিত, এটা না বলিয়া অন্য কিছু বলিত, নিদ্রাহীন প্রতি রাত্রে স্তিমিতালোক কক্ষে দ্বারের দিকে সোৎসুকনেত্রে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে গভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইতেন। কত সময় মনে হইত, যেন এখনি ঐ দ্বারপথে নিঃশব্দে সে প্রবেশ করিয়া সতর্ক গতিতে তাঁর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইবে, বুঝি তাঁর ঘুম ভাঙ্গিবার ভয়ে শ্বাস রুদ্ধ করিয়া হাতের চুড়িগুলির শব্দ বাঁচাইয়া সশঙ্ক ব্যাকুলতায় সে মুখের দিকে ঠায় চাহিয়া দেখিতেছে—কতবার এমনও অনুভব হইয়াছে—কি সে করুণামাখা কোমল দৃষ্টি! স্নেহকাতরা জননী রুগ্ন সন্তানের মুখের পানে যে দৃষ্টিপাত করেন, তাহাতেও সেই মাধুর্য্য—সেই মহিমা!

কোথা গেলে তুমি ভুবনমোহিনি! তুমি কেন অকালে চলিয়া গেলে? তুমি না গেলে কি—যে আমার মায়া কাটাইয়াছে, সে তোমার মায়া ত্যাগ করিয়া পলাইতে পারিত? শুধু তোমার জন্য—তোমার অভাবে চিরদিন ধরিয়া এত কষ্ট! সবই যদি

গেল তবে তুমি এসো—হে বরেণ্য মৃত্যু!—তুমি এই বহনক্ষম শরীরকে তাপক্লিষ্ট জীবনকে মুক্তি দান কর—হে বন্ধু! হে সুহৃৎ! এসো! এসো! এসো!

নূতন ঠেলাগাড়ীতে বেড়াইয়া আসিয়া অমূল্য চাকরের নামে নালিশ করিল—"দাদামশাই! আমায় কেস্‌ত লাস্তায় নামতে দেয় নি, ও বড় দুস্‌তু হয়েছে, ওকে মালো।" শ্যামাকান্ত সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চমকিয়া শিশুকে ব্যগ্রভাবে কাছে টানিয়া পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে থাকেন, দুই চোখ দিয়া জলধারা গড়াইয়া পড়িয়া হৃদয়ের পাষাণ ভার কথঞ্চিৎ লঘু করিয়া দিতে সক্ষম হইল। এইটুকুই যে তাঁর সান্ত্বনার অবশেষ! কিন্তু অভাগ্যের ধন—অন্ধের নড়িটুকুর উপর দৃষ্টি ফেলিতেও যে আর সাহস হয় না, নিরবলম্বনের একমাত্র অবলম্বন—যদি তাঁর শনি-দৃষ্টিতে শুখাইয়া যায়।

এই ধনৈশ্বর্য্যপূর্ণ প্রকাণ্ড অট্টালিকায় বাস করা শিবানীর পক্ষেও একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল, আজকাল যদিও শ্বশুরের সেবা ও তাঁর চিন্তা—তার বিক্ষিপ্ত চিত্তকে অনেকখানি অবলম্বন দিয়া সংসারের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে, তথাপি তার কাছে সবই অন্ধকার।

সময় পাইলেই সে চাবি খুলিয়া বালক বিনোদের পড়িবার ঘরে প্রবেশ করে, চারিদিকে পুস্তকভরা আলমারি, দেওয়ালে বঙ্গের খ্যাতনামা মনীষিগণের চিত্র, ঘরের ঠিক মধ্যস্থলে লিখিবার টেবিলে ড্রয়ারের মধ্যে বিনোদকুমারের হাতের লেখা ও তার টুকিটাকি জিনিষপত্র যথাপূর্ব্ব রক্ষিত। শিবানী সন্তর্পণে ড্রয়ার খুলিয়া জিনিষপত্রগুলি নাড়িয়া আবার পূর্ব্বের মত সাজাইয়া রাখিত, আঁচল দিয়া টেবিল মুছিয়া কেদারাখাড়িয়া সেই আঁচলখানি মাথায় ঠেকাইয়া অপরিতৃপ্ত চিত্তে দ্বার বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিত। কই—সেখানে তার জন্য কোন সান্ত্বনার

আশ্রয়ই তো রক্ষিত নাই। সে যে বিনোদকে জানিত—যে তার স্বামী—তার যোগ তো এঁদের মধ্যে সে দেখিতে পায় না? হাতের লেখাগুলি এমন সুন্দর—এমন রচনাসরস, কিন্তু শিবানী তো তাঁর হস্তাক্ষর দেখে নাই। এখানে আসিয়া শিবানী তাঁর শাশুড়ীর পরিত্যক্ত গৃহে স্থান পাইয়াছিল, সেই ঘরের প্রবেশ দ্বারের উপর একখানা বিচিত্র ফ্রেমে বাঁধান—বিনোদের সুবৃহৎ চিত্র। কিশোর বিনোদ—অজাতগুম্ফ, কুঞ্চিত কেশ, উৎসাহচঞ্চল দৃষ্টি, মাতা ভুবনমোহিনীর কোল ঘেঁষিয়া তাঁহারই বাহুর উপর ঈষৎ হেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। শিবানী প্রভাতের সর্ব্ব দেবতার পূর্ব্বে ইহাকেই প্রণাম করিত—কিন্তু এ পূজায় সে তৃপ্তি পাইত না, এ তার অপরিচিত মূর্ত্তি—ইহাকে ধ্যানে আনিতে বাধে!

প্রথম ভাগ্যপরিবর্ত্তনের বিস্ময় ও শান্তির ভালবাসার আবর্ত্তে পড়িয়া কিছুদিন যেন সে একটু আরাম পাইয়াছিল, কিন্তু শান্তির প্রস্থানে তার চিত্তে শূন্যতার হাহাকার পূর্ব্বের মতই জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। সিদ্ধেশ্বরী মেয়েকে এখনও চিনিয়া উঠিতে পারেন নাই, আর কখনও যে পারিবেন সে আশাও তাঁর নাই, এই সব ভাবিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, 'বেইমানী' মেয়েকে কোন কথাই আর বলিবেন না, তবে মায়ের প্রাণ—সেইজন্যই মধ্যে মধ্যে এক আধ দিন নেহাৎ 'অসৈরণ' হইলে তাহারই ভালর জন্য দুইটা কথা না বলিলেও তো চলে না, পোড়া মেয়ের 'বরাত' যে এখনও মেঘাচ্ছন্ন রহিয়াছে, শ্বশুরকে দিয়া ইহার একটা পাকা প্রতিকার করান যে অবশ্য কর্ত্তব্য, এই সামান্য কথা 'আবাগীর বেটী'কে না বুঝাইয়াই বা তিনি নীরব থাকেন কি করিয়া? কিন্তু একগুঁয়ে পোড়া মেয়ে এখনও সেই পূর্ব্বের মত নিজের 'গোঁ ধরিয়া' চুপ করিয়া সব কথা শুনিয়া যায়, না হয় কাঠের মত শক্ত হইয়া বলে—"আমি বলবো না!" এদিকে সিদ্ধেশ্বরী শুনিয়াছেন, কর্ত্তা নাকি উইল করিতেছেন, হেম ও হেমের

বউ তাঁর অর্দ্ধেক বিষয় পাইবে—এমন সময় শিবানী যদি শ্বশুরকে বলে—সেটা অন্যায়, তবে ওটি বন্ধ হইতেও তো পারে, তা সে বলিবে না। পোড়া কপাল—অমন বুদ্ধির, ঝাঁটা মার অমন ধর্ম্মজ্ঞানে। রাগ করিয়া একদিন সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন—"আমার এখানে মন টিকচে না, আমি বৃন্দাবনে চলে যাই, কি বলিস্?—শিবানী সাগ্রহে তৎক্ষণাৎ বলিল—"তা'ই চল মা, তা'ই চল, দু'জনেই যাই।"

হা রে বুদ্ধি! সিদ্ধেশ্বরী আর উচ্চবাচ্যটি করিলেন না, কিন্তু শিবানীর চিত্তে এই সম্ভাবনাটা যেমন হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়াছিল, তেমন শীঘ্রই মিলাইয়া গেল না, একদিন রাত্রে সে মায়ের ঘরে গিয়া কাছে বসিল, সিদ্ধেশ্বরী একটু বিস্মিত হইলেন, সে আপনা হইতে বড় একটা তাঁর কাছে আসে না, সম্ভবতঃ উপদেশের ভয়ে। কোমলস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিরে শিবু? এমন সময় এলি যে?

শিবানী ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"এই এলুম একবার।" সিদ্ধেশ্বরী সন্দিগ্ধ নেত্রে কন্যার পানে চাহিয়া দেখিলেন, কিছু বলিলেন না, কথাটা বোধ করি তেমন বিশ্বাস হইল না। বিমলাদাসী তাঁর পায় তেল মালিশ করিয়া আগুনের তাপ দিতেছিল, তার কার্য্য শেষ হইলে আগুনের কড়া লইয়া সে চলিয়া গেল। তখন শিবানী ডাকিল "মা?" "কি—মা?" বলিয়া সিদ্ধেশ্বরী সস্নেহে চাহিয়া দেখিলেন। শিবানী সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া কহিল—"মা! চল না আমরা আমাদের সেই নিজেদের ঘরে ফিরে যাই।"

সিদ্ধেশ্বরীর ওষ্ঠপ্রান্তে দুঃখের হাসি ফুটিয়া উঠিল—"হ্যাঁরে—দিন দিন কচিটি হচ্চিস্ নাকি? কি বলিস্ বল দেখি?—অমূটার কি হবে?"

শিবানী উত্তর দিল—"সে এখানে থাক না—শুধু আমরা দু'জনে চলে যাই চল, মা!—আর যে 'আমি এখানে থাকতে পারচি নে'।"

শিবানীর কণ্ঠস্বরে আজ সিদ্ধেশ্বরী রাগ না করিয়া হঠাৎ ব্যথা বোধ করিলেন, তার প্রাণের প্রচ্ছন্ন বেদনা, নিগূঢ় অভিমান ও শূন্যতা তাঁকে আঘাত করিল, সত্যই তো—কেমন করিয়া এখানে তার মন টিকিবে? চারিদিকে সুখ, ঐশ্বর্য্য ছড়ান, অথচ সে ভোগে বঞ্চিতা!—যা'র জন্ত সব—সে আজ কোথায়? দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—"যেমন কপাল করে এসেছিলি মা! কি করবি বাছা! সহ্যই কর—সত্যি, ভগবান কি কখনও মুখ তুলে চাইবেন না? কোথায় যাবি—এ যে তোর ঘর।"

শিবানীর সর্ব্বশরীরে তাড়িত সঞ্চালিত হইয়া গেল, ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিবেন!—চাহিবেন কি?—ওগো সর্ব্বান্তর্য্যামী!—তবে আর কতদিন বিমুখ থাকিবে? একবার মুখ তোল!—একবার চাহিয়া দেখ, তোমার একটু কৃপা দৃষ্টির উপর এখনও যে তার কত খানি নির্ভর করিতেছে, এ কথা সে তো প্রায় ভুলিয়াই বসিয়াছিল। যদি আবার স্মরণ করাইয়া দিলে, তবে কৃপা দৃষ্টি কর। সিদ্ধেশ্বরী শিবানীকে নীরব দেখিয়া তাড়াতাড়ি কথাটা উল্টাইয়া ফেলিবার আশায় বলিলেন—"এবার 'পৈরাগে' অৰ্দ্ধ-কুম্ভ হ'বে, মনে কচ্চি, 'ছান্'টা করে চুলগুলো মুড়িয়ে আসবো, কল্পবাস কর্ব্বারও বড় সাধ আছে। বড় বেন, মেজ বেন, নিস্তারিণী—ওরাও সব যেতে চায়, দেখি শরীরটা ভাল থাকে তো যা'ব। কি বলিস্।"

শিবানী হয় তো সে কথা শুনিতে পায় নাই, সে তখন ভাবিতেছিল—যদি তা হয়, তিনি নিশ্চয় ঠাকুরপোকে ফিরাইয়া আনেন—চাও—ঠাকুর, মুখ তুলিয়া চাও!

যোগেশ মধ্যে মধ্যে বাহিরের ঘরে শ্যামাকান্তের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে হেমেন্দ্রদের সংবাদ দিয়া যাইত, একদিন সে আসিয়া জানাইল, শিবানী ও তার পুত্রকে জাল প্রমাণ করিবার জন্য হেমেন্দ্র শীঘ্রই মকদ্দমা আনিবে—শুনিয়া বৃদ্ধ জমিদার বহুক্ষণ বজ্রহতের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া একদিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে সভয়ে প্রশ্ন করিলেন—"সত্যি কি হেম এমন কেলেঙ্কারী করতে পারবে? যোগেশ! তুমি তা'র বন্ধু, তুমি তা'কে ভাল করে বুঝিও—বাবা! শুধু শুধু একটা ঝোঁকে পড়ে সে যেন কুলমর্য্যাদা ভুলে গিয়ে শত্রুপক্ষের মুখ না হাসায়। আমি তো তা'কে আমার অর্দ্ধেক সম্পত্তি চুলচেরা ভাগ করে দিতে এখনি রাজি রয়েছি, সে আমার কাছে না থাকতে চায়, স্বতন্ত্র বাড়ীতে থাকতে পারবে, তুমি তা'কে ফিরে আসতে ব'ল। না হয়, সে কোথায় আছে—আমায় নিয়ে চল, আমি তাদের সঙ্গে করে নিয়ে আসি।"

চতুর যোগেশ টলিল না। বৃদ্ধের কাতরোক্তিতে তার মনে করুণা আসিতেছিল, কিন্তু হেমকে এখন জ্যেঠার হাতে সঁপিয়া দিলে তার যে বেগার খাটাই সার হইবে! না, না—নিজের একটা উপায় না করিয়া আয়ত্তগত শিকার কখনই ছাড়া যাইতে পারে না। হেম দারিদ্র্যের মধ্যে এমনি উত্তপ্ত ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছে যে, অর্দ্ধেক বিষয়েই হয় তো সে সম্মত হইবে।

বলিল—"আপনি হঠাৎ গেলে, সে যে রকম ছেলে, হয় তো একেবারেই বেঁকে বসবে, বিশেষতঃ আপনাকে তা'দের খপর দিয়েছি জানতে পারলে আমার উপর শুদ্ধ অবিশ্বাস হয়ে যা'বে; কোন কাজই

হ'বে না। তা'র চেয়ে আমিই তা'কে বুঝিয়ে সুঝিয়ে যা'তে নোয়াতে পারি তা'রি চেষ্টা করি। দেখুন, আমরা পুরুষানুক্রমে আপনাদেরই খেয়ে মানুষ, আমার দ্বারা চেষ্টার ত্রুটি হ'বে না। আপাততঃ এক কাজ করুন, তা'দের তো একটা কানা কড়িও হাতে নেই, বৌঠাকৃরুণের গহনা বাঁধা রেখে পরশু চারশো টাকা ধার করে দিয়েছি—জানেন তো আমার অবস্থা? আমার নিজের তো আর পুঁজি-পাটা নেই, নৈলে আমিই দিতুম—তাঁ'র গায়ের গহনা খস্‌তে দিতুম না, তা সেই টাকাটা বরং আমায় চুপে চুপে দিয়ে দিন, গহনা ক'খানা বরং খালাশ করে দিইগে', জিজ্ঞেস করলে না হয় বলব, অন্য জায়গা থেকে ধার করে ছাড়িয়ে এনেছি।—আহা, বৌঠাকৃরুণেরই কষ্ট!"

মর্ম্মের মধ্যে তপ্ত লৌহশলাকা দিয়া যোগেশ খোঁচাইয়া তুলিল! যোগেশ চলিয়া গেলে বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া শ্যামাকান্ত বালকের মত কাঁদিয়া উঠিলেন—"মা রে আমার!—কি চণ্ডালের হাতেই তোকে আমি দিলুম রে!"

দেওয়ানকে ডাকাইয়া রজনীনাথকে পত্র লিখাইলেন—"হেম শুনিতেছি সম্পত্তি প্রাপ্তির জন্য নালিশ করিবে, আমি স্থির করিয়াছি, তার পূর্ব্বেই আমার বিষয় বিভাগ করিয়া ফেলিব। আইন মত অর্দ্ধাংশ বিনোদের পুত্রকে ও অর্দ্ধাংশ তাহাকে দিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইতে চাই, তুমি আসিয়া ব্যবস্থা করিয়া যাও।—মা ও হেম শারীরিক ভাল আছে বলিয়া শুনিলেও—আমার বিশ্বাস হয় না, যোগেশ তাদের দেখিতেছে, সে বড় ভাল ও অতিশয় কর্ত্তব্যপরায়ণ। শুনিলাম, তাহারা চন্দননগরে আছে, কোথায় আছে—হেমের বিরক্তির ভয়ে তাহা বলিতে সে সাহস করিল না।"

তিনদিন পরে রজনীনাথের নিকট হইতে পত্র আসিল। এতদিন

ধরিয়া শ্যামাকান্ত মনে মনে অনেকখানি আশা গড়িয়া রাখিয়া ছিলেন, পত্রপাঠে তাহা চূর্ণ হইয়া গেল, সে পত্র এইরূপ ;—

"কিসের পুরস্কারস্বরূপ আপনি তাদের এত বড় সম্পত্তির অধিকার দান করিতে চাহিতেছেন? উচ্ছৃঙ্খলতার? অবাধ্যতার? ঈর্ষার? না অকৃতজ্ঞতার—? বিষয় আপনার, আপনি রাস্তার লোক ডাকিয়া বিলাইয়া দেন, তাহাতে বাধা দিবার আমার কোনই অধিকার নেই, কিন্তু আমার সহিত তাদের যে সম্বন্ধ ছিল, তার জন্য শুধু এইটুকু স্মরণ করাইয়া দেওয়া উচিত বলিয়া মনে করিতেছি, দোষীকে দণ্ডের পরিবর্ত্তে দান যদি নিতান্তই আপনার অভিপ্রেত হয়, অন্য লোকের দ্বারা সে কার্য্য করাইয়া লইবেন—আমায় ক্ষমা করুন, আমি আপনার দাসানুদাস হইলেও এ বিষয়ে আমায় নিতান্ত অক্ষম জানিবেন।"

কি ভয়ানক! এই সেই রজনীনাথ? সেই সন্তানবৎসল পিতা? প্রাণাধিকা কন্যার সম্বন্ধে আজ তাঁর এই হৃদয়হীন পত্র।

মর্ম্মাহত শ্যামাকান্ত মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন।

শ্যামাকান্তের সে পত্রের উত্তর রজনীনাথ যে তেমন কঠোর ভাষায় দিয়াছিলেন, তারও একটা কারণ ছিল।

শান্তিকে দণ্ড দিবার পর যখন অনুতপ্ত চিত্ত বেদনায় কশাঘাত করিয়া পুনঃ পুনঃ বলিল—"মূঢ়—তুমি নিতান্তই মূঢ়! ধিক্ তোমার বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞানে! এই বুদ্ধিতে তুমি নিরীহ মক্কেল ঠকাইয়া খাও? তোমার নিজের সন্তানের প্রকৃতি তুমি নিজে জান না? একটা বালক তোমায় ঠকাইয়া গেল!" তখন ইহাও তাঁর স্মরণ হইল যে হেমেন্দ্র সত্য সত্যই কোথায় গেল তাহা জানিবারও উপায় রাখা হয় নাই—সেদিন তাদের সঙ্গে একটা লোকও দেন নাই, দিলে—তারা কলিকাতা ত্যাগ করিল কি না অন্ততঃ এটুকুও জানা যাইত। একি আত্মবিস্মৃতি!—একি বিচারের ভাণে পূর্ণ অবিচারকে আশ্রয় করা!—শান্তির সেই জলসিক্ত পদ্মপাপড়ীর মত সজল চোখ বেদনাবিক্ষত পিতৃবক্ষে অহোরাত্রি কাঁটার মত বিঁধতে লাগিল।

অনুসন্ধানের পথ নাই, কাহারও নিকট বলিতে আত্মমর্য্যাদায় আঘাত লাগে, অসুস্থতার দোহাই দিয়া বসুমতী সেই হইতে শয্যাশ্রয় করিয়াছেন, তাঁর নিকটই বা সান্ত্বনা কোথায়? গুরুভার চিত্ত কর্ম্মস্রোতে ভাসাইয়া দিন কাটিতেছিল বটে, কিন্তু বিদ্রোহী রাত্রি কিছুতেই পোহাইতে চাহে না—নিঃশব্দে—নিরানন্দে সময় গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে থাকে।

সুকু এখন অনেকটা বড় হইয়াছে, সে এখন লোকের সুখদুঃখ কতকটা অনুভব করিতে পারে, দিদি হঠাৎ আসিয়া অন্তর্দ্ধান হইবার

পর হইতেই যে পিতার মনে একটা সুগভীর ক্লেশ বাসা বাঁধিয়াছে, এটা সে সর্ব্বদাই তাঁর মুখের ভাবে বুঝিতে পারে, তা'ই দিদির সম্বন্ধে অদম্য কৌতূহল ও আগ্রহ সত্ত্বেও পিতাকে কোন প্রশ্ন করিতে সাহস করে না, কিন্তু এবার দিদি শ্বশুরবাড়ী গিয়া তার চারখানা চিঠির একখানারও জবাব দিল না কেন? এ প্রশ্নে সে বসুমতীকে দিনের মধ্যে বার বারই বিচলিত করিয়া তুলিত। কখনও অভিমান করিত, কখনও—"মা! দিদির কাছে আমায় পাঠিয়ে দাও।"—বলিয়া আব্দার ধরিয়া কাঁদিয়া রাগিয়া মাকে অস্থির করিয়া তুলিত।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও রজনীনাথ পাঠাগার হইতে বাহির হ'ন নাই, সুকু তার পেঁপে গাছের নলে তৈয়ারি টেলিফোন যন্ত্র আনিয়া অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক প্রতিভার পরিচয় দান করিয়া তাঁর হাস্যবিহীন অধরপ্রান্ত স্নেহের মৃদু হাস্যে চকিত করিয়া তুলিতেছিল, এমন সময় চাকর একখানা ডাকের চিঠি আনিয়া দিল। চিঠিখানা লইয়া ডাকের ছাপ ও হাতের লেখার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই চকিতভাবে বলিয়া উঠিলেন—"চৌধুরীমশায়ের চিঠি!"—ক্ষিপ্রহস্তে খাম ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, মানসিক উদ্বেগে থর থর করিয়া তাঁর হাত কাঁপিতেছিল, কি সংবাদ? তা'রা কি তবে সেখানে? পত্র পাঠ শেষ হইলে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া কাগজখানার উপর দৃষ্টি স্থির করিয়া নতমুখে বসিয়া রহিলেন, তবে তারা ফিরিয়া আসে নাই?—তবু একটা খবর পাওয়া গেল, ফরাসডাঙ্গা কি এমন মস্ত সহর যে সেখানে তার সন্ধান মিলিবে না! সুপ্রকাশ আসিয়া উৎফুল্ল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, রজনীনাথ সাগ্রহ-আনন্দে পুত্রকে বুকে টানিয়া সহসা অজস্র চুম্বনে অভিসিঞ্চিত করিয়া দিলেন, সুসংবাদের আনন্দ চাপিয়া রাখা কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। সুকুও বুঝিয়াছিল, এ আদরটা ঠিক তার নয়, এর মধ্যে তার দিদিরও অংশ আছে।

জিজ্ঞাসা করিল—"দিদি ভাল আছে বাবা ?" রজনীনাথ চিঠিখানা আবার একবার পড়িতে পড়িতে উত্তর দিলেন—"আছে।"

"দিদি কি আর আস্‌বে না, বাবা ?"

পিতা শিহরিয়া উঠিলেন। বুকের মধ্যে চলন্ত রক্তস্রোত সহসা একটা বাধা পাইয়া থমকিয়া গেল কিন্তু তখনি সবলে মনকে উৎসাহিত করিয়া উত্তর দিলেন—"কাল ভোরেই তাকে আনতে যাব।"

সুপ্রকাশ আনন্দে করতালি দিয়া উঠিল—"আর আমি ?"

"তুমি তোমার মার কাছে থাকবে, দিদির জন্যে নূতন নূতন জিনিষ পত্র তৈরি করে রাখবে, দিদি এসে বলবে—'সুকু যেন বাঙ্গালার বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন্ হয়েচে!" বালকের নেত্র গৌরব দীপ্ত হইয়া উঠিল।

একটা শিল্পকার্য্য লইয়া বসুমতী আলোর কাছে ঝুঁকিয়া সেলাই করিতেছিলেন, কিন্তু আজ কিছুই অগ্রসর হইতেছিল না, আজকাল আঙ্গুলের মধ্যে সূঁচ বিঁধিয়া যায়, চোখের ভিতর কর কর করে, এমনি নানা বাধায় শিল্প-কুশলা বসুমতীর সকল কার্য্যই অসমাপ্ত পড়িয়া থাকে, তথাপি সময় কাটাইবার একটা অবলম্বনও তো চাই।

সবেমাত্র একটা ভুল করিয়া মনটা উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময় বাহিরে দুপ্-দাপ্ শব্দ সুপ্রকাশের আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করিল, সেই সঙ্গে রজনীনাথেরও সাড়া পাইয়া বসুমতী হঠাৎ কাজের উপর অত্যন্ত মনঃসংযোগ করিলেন। সুকু ঘরে ঢুকিয়াই বলিয়া উঠিল—"মা, মা, বাবা কাল সকালে দিদিকে আনতে যা'বেন।"—সেলাইটা হাত হইতে পড়িয়া গেল, বিদ্যুৎসঞ্চালিতের ন্যায় তিনি স্বামী পানে চাহিলেন।

রজনীনাথ ধীরকণ্ঠে কহিলেন—"আমি কাল ফরেসডাঙ্গা যা'ব।"

"ফরেসডাঙ্গা! সখানে—"

"হ্যাঁ, সেখানে তা'রা আছে, খবর পেয়েছি।"

দাসীকে ডাকিয়া বসুমতী 'হরির লুটে'র বন্দোবস্ত করিতে আদেশ দিলেন।

পরদিন ফরাসডাঙ্গায় গিয়া একজন ধনী মক্কেলের সাহায্যে রজনীনাথ তাদের অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু হেমেন্দ্রের বাসার সন্ধান কেহই বলিতে পারিল না, অগত্যা রজনীনাথকে সে রাত্রি মক্কেলের বাড়ী থাকিতে লইল।

পরদিনও অনুসন্ধান ব্যর্থ হইল, ডাকঘরেও খবর লওয়া হইল—হেমেন্দ্র চৌধুরীকে কেহ চিনে না। হতাশ হইয়া রজনীনাথ ফিরিয়া চলিলেন। কলিকাতায় ফিরিয়া যোগেশের সন্ধানে তিনি লক্ষ্মীপুর যাইবেন স্থির করিলেন, কিন্তু চন্দননগর ষ্টেশনে পৌছিয়াই প্রবেশ পথের সম্মুখে দেখিলেন—যোগেশের বাহু অবলম্বনে হেমেন্দ্র আসিতেছে,—অভাবনীয় সাক্ষাৎ! প্রথমটা দুইজনেই হতবুদ্ধি হইয়া গেল—এবং রজনীনাথও বিস্মিত হইয়া পড়িলেন, মুহূর্ত্তমধ্যে প্রত্যুপন্ন-মতিত্বে যোগেশ আপনাকে সামলাইয়া লইয়া দুই হস্তে রজনীনাথের পদধূলি মাথায় গ্রহণ করিয়া নিতান্ত সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"এখানে এসেছিলেন? কাজ ছিল?"

হেম যোগেশের আড়ালে আপনাকে যথাসম্ভব ঢাকিয়া দূরেই দাঁড়াইয়া রহিল, রজনীনাথ উত্তর দিলেন—"কাজেই এসেছি, তবে সে কাজ এখনও বাকি রয়েছে, যোগেশ! শান্তির কাছে আমায় নিয়ে চল—আমি বাড়ীর সন্ধান করতে না পেরে ফিরছিলাম।"

যোগেশ হেমেন্দ্রের দিকে চকিত কটাক্ষনিক্ষেপ করিল, তার মুখ ঈর্ষায় বিদ্বেষে মসীবর্ণ হইয়া গিয়াছে, কি একটা কথা বলিবার জন্য অধর কম্পিত হইতেছিল, ইঙ্গিতে যোগেশ তাহাকে নিবৃত্ত করিয়া তৎক্ষণাৎ

বলিল—"বেশ তো, আসুন না!—আপনি না এলে আমিই বোধ করি কাল আপনার ওখানে যেতুম। দাঁড়ান, একটা গাড়ী ঠিক করি—"

গাড়ী ডাকিতে যোগেশ একটু অগ্রসর হইয়া গেল, তাকে অনুসরণ করিয়া হেমেন্দ্র বিরক্ততিক্ত স্বরে বলিল—"যোগেশ! তোমার মতলবটা কি? ওঁকে কেন তুমি নিয়ে যেতে রাজি হ'লে?—কি তেজ দেখেছ? আমাকে দৃক্‌পাতও নেই! মনে করেছেন, আমায় ঠেলে ফেলে মেয়ে নিয়ে যাবেন! দিচ্চি তা'ই নিয়ে যেতে!"

যোগেশ মৃদুস্বরে বলিল—"থামো না, লোকটাকে চটিয়ে কি হ'বে? চুপ করে দেখ না, খুব সহজেই কাজ সারা যাবে'খন, আমার উপর যদি নির্ভর কর তো তুমি একটিও কথা কয়ো না, আর যদি পার তো ভাল ব্যবহারই ক'রো।"

হেম যোগেশের ক্রীড়াপুত্তলিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে তাকে যেমন গড়িতেছে, শিব বা বানর, নির্ব্বিবাদে সে তাহাই হইতেছে, সম্মত হইল। গাড়ী আসিলে প্রথমেই রজনীনাথ উঠিয়া বসিলেন, হেমের দিকে না চাহিয়াই বলিলেন "এসো—যোগেশ!" যোগেশের ইঙ্গিতে হেম সম্মুখে আসিয়া প্রণাম করিল, যোগেশ ও হেম গাড়ীতে উঠিলে মুমূর্ষুপ্রায় অশ্বদ্বয় চাবুকের আঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া মন্দগতিতে চলিল।

অনেকটা পথ, অশ্বের গতি অত্যন্ত মন্থর, কাজেই সময় লাগিল, পথের মধ্যে যোগেশ বলিল—"আপনার কাছে যা'ব বল্‌ছিলুম, বৌ-ঠাকরুণের মাথাটা যেন দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্চে, তাই ছোটবাবু আমায় বলছিলেন, তিনি হঠাৎ রাগের মাথায় বড়ই একটা গর্হিত কাজ করে ফেলেছেন, এখন কি করবেন, ভেবে পাচ্চেন না, কেমন করেই বা আপনাদের কাছে মুখ দেখাবেন, আরও বলছিলেন, বৌঠাকরুণেরও যে কি হয়েচে, তিনি কিছুতেই লক্ষ্মীপুরে বা কল্‌কাতায় যেতে চা'ন না,

জোর করে নিয়ে যা'বার চেষ্টা করলে বলেন—'ট্রেনের তলায় পড়ে মরবো!' এ যে বিষম কথা! তা'ই আমায় একটা উপায় করতে বলছিলেন। তা দেখুন, এর আর আমি কি করব? আমার সামান্য বুদ্ধিতে মনে হ'ল এই যে, আপনাকে আমি গিয়ে সব কথা বলি, যেমন ভাল হয় আপনারা করবেন। তা' আপনি যখন নিজেই এসেছেন, তখন তো আর কথাই নেই? আমরা এখন নিশ্চিন্ত হলুম। আপনি তাঁ'কে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাড়ী নিয়ে যা'ন, এখানে কি তাঁ'র থাকা সাজে, শুধু কেমন ঐ একটা খেয়াল চেপেচে, যে 'এখান থেকে কোথাও যা'ব না'।"

রজনীনাথ ভালমন্দ কোন কথাই বলিলেন না, কিন্তু মনের মধ্যে হঠাৎ যে বেত্রাঘাতের জ্বালা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, গাম্ভীর্য্যের চেষ্টার মধ্য দিয়াও তাহা গোপন করা গেল না।

যোগেশ পুনরায় একটা সুগভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিল —"নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গেছে, তা নৈলে আর অমন বুদ্ধি কি এমন করেই বদলে যায়? কর্ত্তার নামও শুনতে পারেন না, আপনার কাছে যা'বার কথা শুনলেও—তা ও-সব কথায় কাজ নেই আর, আপনাকে দেখলে হয় তো আবার মনের ভাবটা ফিরতে পারে, আমি কত বোঝালুম, তা বল্লেন কি—'আমি মনে করি, আমার কেউ নেই, এখন বুঝতে পেরেচি, স্বামীই জগতে শুধু আপনার, আর কেউ আপনার নয়, আমায় যখন কেউই চাইলে না, তখন আমিও আর কারুকে চাই নে'!"

রজনীনাথের পক্ষে আত্মসম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতেছিল, তথাপি একটা সন্দেহ, একটা আশা—কিন্তু লাভ কি? যোগেশের এত মিথ্যা বলিয়া লাভ কি? লাভ থাকিলে অনেক লোক মিথ্যাকে কি রকম সাজাইয়া তুলিতে পারে, সে কথা রজনীনাথ ভালই জানেন, কিন্তু এ

অহেতুকী মিথ্যা যোগেশ কেন বলিবে? বিশেষতঃ সেই তো শ্যামা-কান্তকে ইহাদের সংবাদ হেমেন্দ্রের অজ্ঞাতে দিয়াছে; সে তাহাদের সত্যকার শুভার্থী।

কশাঘাতে জর্জ্জরিত অশ্ব একটা গলির সম্মুখে থামিলে তেমনি কশা-জর্জ্জরিত চিত্তে রজনীনাথ যখন সেই প্রদর্শিত গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া সঙ্গীদ্বয়ের সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখন আবার তাঁর হৃদয় অনুতাপপূর্ণ বেদনায় আলোড়িত হইয়া উঠিল। নিশ্চয়ই তার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে।—কেনই বা হইবে না? এইখানে সে বাস করে?—আর তাঁর কাছে সেই ব্যবহার পাইবার পর! সম্মুখেই হেমেন্দ্রের বাড়ী, যোগেশ দ্বার খুলিয়া দাঁড়াইল, রজনীনাথকে একটু ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া যোগেশের ইঙ্গিতে হেম কহিল—"আসুন! —আচ্ছা একটু দাঁড়ান, আমি একবার খবর দিয়ে আসি, হঠাৎ বেশী আনন্দ হয় তো সহ্য হবে না।"

যোগেশ কহিল—"হ্যাঁ, আসুন, আপনার কথা শুনলে তাঁর মনটা ফিরতেও পারে।"

রজনীনাথ কিছু বলিলেন না, বলিবার শক্তিও বোধ করি তাঁর অল্পই ছিল, আবার দারুণ সন্দেহ ও আশঙ্কা জাগিয়া উঠিয়া হৃদয়কে বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতে লাগিল—সত্যই কি তবে সে এতখানি ভুল বুঝিয়াছে? পিতার একান্ত বিশ্বাস ও অপরিসীম স্নেহও কি সেই শাস্তির মধ্যে সে দেখিতে পায় নাই? তাকে দোষী ভাবিতে তাঁর বুক যে ফাটিয়া গিয়াছিল, তাও কি সে বুঝিতে পারে নাই? সে কি জানে না, কি কষ্ট এতদিন ধরিয়া তিনি ভোগ করিতেছেন?—কৈ বুঝিয়াছে? এতদিন একখানা পত্রও কি সে লিখিতে পারিত না? হায়! বুকের রক্ত দিয়া গড়া তাঁর সেই শাস্তি! উত্তেজনায়

মাথায় ও মুখে গরমরক্ত ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল। যোগেশ কহিল—"দোষটা মশাই ছোটবাবুরই সম্পূর্ণ—তিনি প্রথমটা ওঁকে জোর করে এখানে টেনে আনেন, তারপর এখন ওঁর নিজের মনেও একটা অভিমান এসে পড়েছে, এটা স্বাভাবিক। হাজার হোক, এই তো বালিকা বয়েস ওঁর, বুদ্ধিতে এখনও পাক ধরে নি।"

কিছুক্ষণ পরে হেমেন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া কহিল—"সে দেখা করতে চায় না—বলে—"

রজনীনাথ উদ্যত আঘাতের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্ত দুই পা পিছাইয়া গিয়া আর্ত্তকণ্ঠে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন—"থামো—আমি শুন্‌তে চাই নে, সে কি বলে, নিজে একবার—"

তীক্ষ্ণ শ্লেষের হাসি হাসিয়া হেমেন্দ্র বলিল—"তবু শুনুন, কি বলে, সে বলে—'কুকুর শেয়ালের মত রাত দু'টোর সময় বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, তা'তেও কি সাধ মেটে নি? আর কেন এসেছেন?' তা হোক, একবার চলুন, দেখা করবেন আমার আপত্তি নেই—আপনার নিজের মেয়েরই আপত্তি।—তা' আমি কেন বাধা দেবো? যান, একবার—"

সমরনিপুণ সেনাপতি যেমন দৃঢ় বর্ম্মাচ্ছাদিত বক্ষে সহসা প্রচণ্ড আঘাত পাইলেও সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও অকস্মাৎ বেদনাক্রান্ত হইয়া উঠে, সেইরূপ ভাবেই রজনীনাথ দ্রুতপদে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন। যোগেশও তাঁর অনুসরণ করিল, হেমেন্দ্রকে আসিতে ইঙ্গিত করিলেও সে গেল না। নিকটে গিয়া তাঁর মুখের দিকে চাহিয়া একটু চমকিয়া উঠিল, একটু অনুতপ্তও সে হইয়াছিল, কিন্তু স্বার্থপরতা করুণাকে সর্ব্বদা পরাজয় করিয়া থাকে, এ ক্ষেত্রেও অসুরের জয় হইল, হেমেন্দ্র শ্বশুরের সহিত মিলিত হইলে মকদ্দমা বাধে না, না বাধিলে যোগেশ যে

ভাঙ্গা বাড়ী সারাইয়া দ্বিতল গৃহ আরম্ভ করিয়াছে, অসমাপ্তই থাকিয়া যায়, সেজবধূর কোমরের বিছা ও ডায়মনকাটা তাবিজ পরার সাধও অপূর্ণ থাকে। শ্যামাকান্তের ন্যায় রজনীনাথকেও নিজের স্বার্থসিদ্ধির কল তৈয়ার করিবার লোভে যোগেশ রজনীনাথের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল, কুণ্ঠিত ভাবে কহিল—"মাপ করবেন—নিজে একবার তাঁ'র সঙ্গে দেখা করলেই ভাল হ'ত না? হেম যদি ঠিক না বুঝতে পেরে থাকে, তা ছাড়া যদি অভিমান করে কিছু বলেই থাকেন, আপনারই তো সন্তান—"

রজনীনাথ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন—তাঁর দুই চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কহিলেন—"আমার সন্তান? না—আমার সন্তান হ'লে আমায় অপমান করে ফিরিয়ে দিতে পারত না, এ আমি কা'কে খুঁজতে কোথায় এসেছিলাম? যে আমায় চেনে না, সে আমার সন্তান, না!"—

রজনীনাথ প্রায় একরূপ ছুটিয়াই গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন, হাঁকিয়া বলিলেন—"ষ্টেশন, জোরসে হাঁকাও।"—হতবুদ্ধি যোগেশ দাঁড়াইয়া রহিল, বুঝিল—সবাই শ্যামাকান্ত নহে।

হেমেন্দ্র যখন সেই জনহীন প্রায় নিস্তব্ধ বাড়ীতে প্রবেশ করিল, তখন তার দুই চোখে যেন একটা আগুনের হল্কা বাহির হইতেছিল, তার ওষ্ঠে নিষ্ঠুর মৃদু হাসি অত্যন্ত গৌরবের ভাবে ফুটিয়া উঠিয়া তার সুন্দর চেহারাকে উপাখ্যানবর্ণিত দানবের মত ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছিল। সেদিনকার অপমানের প্রতিশোধ যে সে অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া লইতে পারিয়াছে, এর জন্য যোগেশকে ও নিজেকে সে ধন্যবাদ দিল। গম্ভীর-প্রকৃতি শ্বশুরের সম্মুখে মনটা এখনও সঙ্কুচিত হইয়া আসে বটে, কিন্তু তথাপি কি আশ্চর্য্য যে, পৌরুষের সাহায্যে সে সেই দুর্ব্বলতার হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছে।

পশ্চিম দিকের ছোট ঘরখানায় তক্তপোষের উপর মলিন শয্যায় ছায়াখানির মত শান্তি শয়ন করিয়াছিল, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ঘর ঠাণ্ডা কনকনে হইয়া উঠিয়াছে, হেমেন্দ্র দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া বলিল—"মনে করচি, আজ একবার কল্‌কাতা যা'ব, কাঁহাতক আর এই বনের মধ্যে পড়ে থাকি, তোমার অসুখ একটু কম আছে তো?"

শান্তি দেওয়ালের দিক হইতে মুখ ফিরাইল, কহিল—"আমি? আমি ভাল আছি—বাইরে কে' এল? ও, জুতোর শব্দ যে চিনি—উঠতে পারলুম না—কে' এল?"

হেমেন্দ্র একটু চকিত একটু বিস্মিত হইল কিন্তু তখনি সামলাইয়া লইয়া উত্তর দিল—"ও একটি বাবু, ঐ রায়েদের বাড়ীর।

শান্তি ধীরে ধীরে নিশ্বাস ফেলিয়া মৃদু স্বরে আপনি আপনি কহিল—"বাবার জুতোর মত শব্দ কিন্তু—"

হেমেন্দ্র মনে মনে বিস্ময়ানুভব করিলেও প্রকাশ্যে ব্যঙ্গ করিতে ছাড়িল না, বিদ্রূপ করিয়া বলিল—"হ্যাঁগো হ্যাঁ—তোমার বাবার তো তোমার জন্যে ঘুম হচ্চে না। তুমিই 'বাবা' 'বাবা' করে মর, তাঁর তো মায়া ধরে না!"

আহতভাবে শান্তি মাথা তুলিল—"অমন কথা বলো না, তিনি তো বলেছেন, জ্যেঠামশায় ক্ষমা করলেই তিনি ক্ষমা করবেন।—"

হেম অধীর হইয়া উঠিল, কহিল—"থাম, থাম, আমার এখন লেকচার শোনবার অবকাশ নেই, আমি চল্লুম, কালও হয় তো আসতে পারব না। যা দরকার হয়, ঝিকে দিয়ে করিও, আমি একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছি, আর পারছি নে—"

হেমেন্দ্র গমনোদ্যত হইল। শান্তি কাতর কণ্ঠে কহিল—"পারবার দরকার কি? আমায় জ্যেঠামশায়ের কাছে দিয়ে এসো না—"

হেমেন্দ্র উচ্চকণ্ঠে হাসিতে হাসিতে বলিল,—"ক্ষেপেচ !"

সেদিন সন্ধ্যার পর রজনীনাথ বাড়ী পৌছিলে প্রথমেই সুপ্রকাশ গাড়ির কাছে ছুটিয়া আসিল—"দিদি! এলে ভাই?" গাড়ীর মধ্য হইতে রজনীনাথ ধীরভাবে বাহির হইয়া আসিলেন, গাড়ীর ভিতর দিদির কোন চিহ্ন না পাইয়া বালক তার গভীর আনন্দের মধ্যে অত্যন্ত আঘাত বোধ করিল, বিস্ময়বেদনাবিস্ফারিত নেত্রে পিতার পানে তাকাইয়া মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল—"বাবা! দিদি?"

রজনীনাথ কোন উত্তর দিলেন না বা পুত্রের দিকে চাহিয়াও দেখিলেন না—সোজা পাঠাগারে প্রবেশ করিলেন। শ্যামাকান্তের পত্রের উত্তর লিখিয়া ভৃত্যকে ডাকে দিতে দিয়া যখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। স্বামী ফিরিয়া আসিয়াছেন, বসুমতী জানিয়াছিলেন, শান্তি আসে নাই, তাহাও সুবিদিত, ভয়ে ভাবনায় তিনি শুকাইয়া উঠিয়াছিলেন, সুপ্রকাশ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

যমুনার পুলের উপর হইতে মথুরাপুরীর প্রাসাদ-মন্দিরময়ী সমৃদ্ধা নগরীর শোভা অপরূপ। সারি সারি উচ্চ প্রাসাদমালার নিম্নে প্রশস্ত প্রস্তর সোপান শ্রেণী যমুনার নীল জলতলে নামিয়া গিয়াছে, প্রতি ঘাটেই ঘাট আলো করিয়া অপূর্ব্ব গৌরাঙ্গী ব্রজরমণীগণ স্নান করিতেছে, তাদের হাস্যের ঝঙ্কারে ও সৌন্দর্য্যের ছটায় মূক প্রকৃতি সজীব হইয়া উঠিয়াছেন।

নীরদ ট্রেনের জানালা হইতে প্রীতিপূর্ণ নেত্রে ঐ সব দৃশ্য পরম আগ্রহের সহিত দেখিতেছিল, বহু দিন পর আত্মীয়জনকে দেখিলে মনে যেমন অব্যক্ত আনন্দ জাগিয়া উঠে, তেমনি একটা স্মৃতিপূর্ণ আনন্দে চিত্ত উদ্বেল হইয়া উঠিল। ক্রমে পুল ছাড়াইয়া সবুজ ও হরিদ্রাভ শস্য ও পুষ্পখচিত মাঠের মধ্য দিয়া কৃষকবালিকার সকৌতুক কালো চোখে ছায়া ফেলিয়া মৃদুমন্দ গমনে ট্রেন আসিয়া যথাস্থানে থামিল। সঙ্গে লগেজের মধ্যে একটিমাত্র ব্যাগ ও একটা ছাতা, কুলীদের ঝাঁক ঘেরিয়া ফেলিল না বটে, তবে ঘেরিয়া ফেলিল, পাণ্ডার দল। "কি নাম? গোত্র কি? নিবাস? বাসা চাই কি না?" ইত্যাদি প্রশ্নে পরস্পরের মধ্যে শিকার লইয়া ছেঁড়াছিঁড়িতে যাত্রী মুহূর্ত্তে কণ্ঠাগত প্রাণ হইয়া উঠে। নীরদ তীর্থদর্শন করিতে আসে নাই, আত্মীয়গৃহে আসিয়াছে, এই সামান্য কথাটা কোনমতেই যখন তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারিল না, তখন অসহায়-ভাবে তাদের হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া বলিল—"কোথায় যেতে হ'বে চল তা'ই যাচ্ছি।" কিন্তু তাহাতেও মুক্তি নাই, সে কাহার ভাগে পড়িল, তাহা স্থির না হইলে কেহই ছাড়িয়া দিতে রাজী নহে, এবার রীতিমত

ঘরোয়া কলহ বাধিয়া উঠিল, এমন কি শেষটা প্রায় হাতাহাতির উপক্রম। একজন আসিয়া নীরদের ডান হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া বলিল—"চলুন বাবু! আমি আপনার পাণ্ডা হলুম, রঘুবল্লভ মিশ্র, সাড়ে সাত ভাই আমরা, আমরাই সকলের প্রধান, আমার সঙ্গে চলুন।"

আর একজন তাহাকে ধাক্কা দিয়া নীরদের অন্য হস্ত ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিল, বলিল—"কি মতলববাজ লোক তুমি হ্যা ? এ বাবু আমার। এস বাবু, আমি তোমায় ভাল বাড়ী দেব, আমার সঙ্গে চলে এস। 'হাতে নাড়ু' গোপাললাল ব্রজবাসী আমি।" ক্রমে ক্রমে 'সাড়ে পাঁচ ভাই', 'সাড়ে তিন ভাই' ও 'হাতে নাড়ু', 'কানে নাড়ু'র দল—সকলেই বাবুকে লইয়া টানাটানি করিতে করিতে বিবাদ বাড়াইয়া তুলিল। অনেকক্ষণ টানাহেঁচড়ার পর অবশেষে যে সর্ব্বপ্রথমে ধরিয়াছিল, নীরদ তাহারই অংশে পড়িল বলিয়া বিচারে সাব্যস্ত হইলে অপর সকলে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য শিকারের সন্ধানে চলিয়া গেল এবং নীরদও মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

গাড়ীওয়ালাদের মধ্যেও একবার এইরূপ একটা অভিনয়ের আয়োজন হইতেছিল, কিন্তু সে গাড়ী চাহে না বলিয়াই তাড়াতাড়ি তাদের সীমানা ছাড়াইয়া আসায় একটু ডাকাডাকি করিয়া অগত্যা ক্ষুণ্ণ মনে নিবৃত্ত হইল।

নীরদ ষ্টেশন পার হইয়া সহরের দিকে গেল না, বিপরীত পথ ধরিল, দেখিয়া সঙ্গী পাণ্ডা কহিল—"বাবু! এইতেই বলছিলে তোমার পাণ্ডা চাই না ? এখনি পথ ভুল করলে। ও রাস্তা নয়, সহরে ঢোকবার এই রাস্তা—"

নীরদ দাঁড়াইল, পকেট হইতে মণিব্যাগটি বাহির করিয়া দুইটি টাকা পাণ্ডার হাতে দিয়া বলিল—"তোমার যা পাওনা, তা দিলুম, ঘরে যাও, আমার সঙ্গে ঘুরতে পেরে উঠবে না।"

পাণ্ডা বিস্মিত হইয়া নূতন ধরণের লোকটাকে সন্দিগ্ধভাবে দেখিতে লাগিল, তারপর জিজ্ঞাসা করিল—"ঠাকুর দেখবেন না ?"

নীরদ বলিল—"তোমার কাজ তো হয়ে গেল ; তুমি কেন এইবার যাও না।"

পাণ্ডা ভাবিল, লোকটা নিশ্চয় খৃশ্চান, তা' হোক দুই দুইটা টাকা তো দিয়াছে, অথচ পরিশ্রমও করিতে হইল না, আশীর্ব্বাদ করিয়া ফিরিয়া গেল।

নীরদ সম্মুখে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে লাগিল।

তিনদিকে প্রকাণ্ড মাঠ ধূ ধূ করিতেছে, অপর দিকে যমুনা। মাঠের মধ্যে মধ্যে গম, সরিষা ও ছোলা মটরের ক্ষেত অর্দ্ধপক্ক শস্যে হরিতাভ হইয়া উঠিয়া মাতা বসুন্ধরার শ্যামাঞ্চলের মত শোভা পাইতেছে, স্থানে স্থানে কলাই সুঁটির প্রস্ফুটিত পুষ্পগুচ্ছ সুপ্রসিদ্ধ ভায়োলেটের মত বেগুনী রংয়ের উজ্জ্বল আভায় ক্ষেত আলো করিয়া রহিয়াছে, কোথাও সরিষা ফুলের নিকট মৌমাছির দল মাতাল হইয়া ঘুরিতেছে, মৃদু বাতাসে গাছের মাথা নুইয়া পড়িয়া একটা সর্ সর্, তর তর শব্দ উঠিতেছে এবং তাহার সহিত মিশিয়া যমুনার তীর হইতে অজ্ঞাতনামা কোন এক যুবকের সুমিষ্ট কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীতের একটি চরণ ভাসিয়া আসিতেছিল, নীরদ শুধু এইটুকু বুঝিতে পারিল—"কৈসে যাঁউ রে যমুনা ?"

নীরদ মুগ্ধনেত্রে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। পশ্চিমে সীমান্ত রেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত বাধাহীন মাঠের শেষে সূর্য্যাস্তের বিপুল সৌন্দর্য্য তাহার চিত্তকে আকর্ষণ করিল। ভূমার সহিত ভূমির, মহতের সহিত ক্ষুদ্রের এই যে অনাদি সম্বন্ধ চিরসম্বদ্ধ রহিয়াছে, ইহা কি কোন এক-দিনের জন্যও ছিন্ন হইতে পারে ? রক্তবর্ণ কিরণচ্ছটা সহস্র বাহু বিস্তারে ধরণী-বক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় চাহিতেছে, আকাশে শুভ্র মেঘের

শুভ্র স্তর তাহারই গোলাপী আভায় রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে, নীরদ নিকটবর্ত্তী একটা দেবদারু গাছের তলায় বসিল।

আর অল্পক্ষণ পরেই সসীমের সহিত অসীমের মিলনে যে একটুমাত্র বাধা আছে অন্ধকারে সেটুকুও মুছিয়া যাইবে। এই যে মিলনের জন্য উদগ্র ব্যাকুলতা, এই যে দুই বাহু বাড়াইয়া সাগ্রহ আবেদন, অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণতার মধ্যে সমর্পণপূর্ব্বক পূর্ণ হইবার ঐকান্তিকতা, ইহার অর্থ নাই!

নীরদ নীরবে চাহিয়া রহিল, চারিদিকের সাড়া শব্দ ডুবিয়া গিয়াছে, সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা, মধুকরের গুঞ্জন ও রাখালবালকের হাস্য-পরিহাস থামিয়া এখন কেবল অবিচ্ছিন্ন মহারাগিণীর অনন্ত অব্যক্ত সঙ্গীত জনহীন প্রান্তরে ও অন্ধকার জগতে পরিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে। নীরদ নক্ষত্র-খচিত আকাশের পানে চাহিল, স্নিগ্ধ কিরণময়ী জ্যোতিষ্কগণ বিপুল স্নেহে জগতের দিকে চাহিয়া আছে, আর অনন্ত আকাশ ঊর্দ্ধে তেমনি চিরপ্রশান্ত, তেমনি চির উদাসীন। সূর্য্যের প্রতপ্ত কিরণ গ্রহ-তারকার বিমল জ্যোতিঃ কিছুই তাহাকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না, কি মহান্ উদার, কি অপূর্ব্ব মহিমময়!

নীরদ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। স্তব্ধ অন্ধকারে ঝিল্লীর একতান বিশ্বতপোবনোচ্চারিত সেই এক অনাদি ধ্বনির সহিতই মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল, শীত রাত্রের মুক্ত আকাশ—দেখিতে দেখিতে ঘন কুহেলীর আবরণে অর্দ্ধাবরিত হইয়া ক্ষীণ নক্ষত্রালোকে অন্ধকার বিশ্বপ্রকৃতিকে যোগীন্দ্রের সমাধি মূর্ত্তির মতই স্থির ও প্রশান্ত দেখাইতেছিল।

নীরদ উঠিয়া দাঁড়াইল। কিসের লজ্জা? কিসের সঙ্কোচ? এখনও অভিমান? আমিত্বের এতখানি অহঙ্কার এখনও হৃদয়দ্বারের কবাট চাপিয়া প্রহরা দিতেছে? না, বিচ্ছিন্ন বিখণ্ডিত বিভক্ত বিশ্ব যেমন

এই একের মধ্যে মিশিয়া এক অবিচ্ছিন্ন অখণ্ড অবিভক্তে পরিণত হইয়া গেল, তেমনি তারে লজ্জা সঙ্কোচ সব সেই এক কর্ত্তব্যের মধ্যে ডুবাইয়া ফেলিতেই হইবে।

অন্ধকারে কষ্টে পথ চিনিয়া সে সহরের দিকে ফিরিল।

সূর্য্য পৃথিবী ও গ্রহগণকে আকর্ষণ করিতেছে, সেই আকর্ষণের বলে সূর্য্যের পানে তাদের গতি অবিরাম—আবার গ্রহগণের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া উপগ্রহসকল তাদের চারিদিকে আবর্ত্তিত হইতেছে, এইরূপে কত কোটি সূর্য্য অগণ্য গ্রহ উপগ্রহকে অবিশ্রান্ত আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে, কে' বলিতে পারে? আবার সেই সমুদয় সৌরজগৎই যে কোন এক অতীন্দ্রিয় মহাশক্তির পার্শ্বে ক্ষুদ্র নক্ষত্রবিন্দুর মত আকৃষ্ট হইয়া অহোরহঃ ভ্রমণ করিতেছে না—তাহারই বা প্রমাণ কোথায়? আকর্ষণই সৃষ্টির ধর্ম্ম, পদার্থমাত্রই আকর্ষণধর্ম্মী, পরস্পর পরস্পরের আকর্ষণে আকৃষ্ট। নীরদ কল্পনাক্ষেত্রে দেখিতে লাগিল—যমুনাতীরের সেই ক্ষুদ্র বাতায়নটি। যমুনার জল স্থির রহিয়াছে, আকাশের আপ্রান্ত নক্ষত্রখচিত, বাতাস গাছের পাতার মধ্য দিয়া থামিয়া থামিয়া বহিতেছে আর সেই শুব্ধ নির্জ্জন গৃহে, দূর আকাশের দিকে অচঞ্চল নির্নিমেষে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া সে একা বসিয়া! কোথাও কোন সাড়া নাই, বিরামশয়নে সকলেই শায়িত, শান্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকলকেই আপন স্নেহাঞ্চলে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, শুধু সে-ই একা জাগিয়া! নীরদ নিজেরও অজ্ঞাতে ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল। ঐ যে দুইটি নিদ্রাহীন নেত্র সুদীর্ঘ কৃষ্ণপল্লবের মধ্য হইতে যুগল তারার মত রাত্রির পর রাত্রি অনিমেষে চাহিয়া আছে, ঐ যে হৃদয়খানি বাহিরের সকল ঝটিকা সমুদয় বজ্রনাদ উপেক্ষা করিয়া মৌন দৃঢ়তায় আপনাতে আপনি সংযত থাকিয়া সদা জাগ্রত রহিয়াছে, উহাদের মধ্যে কি একটা প্রচ্ছন্ন আকর্ষণীশক্তি নিহিত নাই? জগতে কোন শক্তি

ব্যর্থ যায় না, চুম্বক লৌহকে বুঝি এমনি করিয়াই টানিয়া আনে?—গভীর রাত্রে রুদ্ধ গৃহের দ্বার ঠেলিয়া স্পন্দিত বক্ষে ডাকিল—"শিবানী!"

শীতের রাত্রে রুদ্ধদ্বার প্রতিবাসিগণ সকলেই নিদ্রামগ্ন, গলির মধ্যে অন্ধকার নিবিড়ভাবে জমিয়া রহিয়াছে, সম্মুখে যমুনার জল কল কল শব্দে বহিয়া চলিয়াছে, ঘুমন্ত রাত্রে পল্লীর প্রান্তবর্ত্তী একটি স্থান হইতে তবলার চাঁটির সহিত একটা সঙ্গীতের সাড়া আসিতেছিল। নীরদের আহ্বান তার নিজ কর্ণেই প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল, কেহই উত্তর দিল না, গৃহে কেহ বাস করিতেছে এমন চিহ্নও পাওয়া গেল না, ভিতরে আলোকের রেখাটি পর্য্যন্ত নাই। হঠাৎ সে দেখিল, দ্বারে তালা বন্ধ।—নীরদের হৃদয় স্তম্ভিত বেদনায় নিশ্চল হইয়া পড়িল। অবশিষ্ট রাতটুকু সেই দ্বার—যে দ্বারে সে একদিন আশ্রয়হীন, নিরাত্মীয় দারিদ্র্য ও রোগক্লিষ্ট পথিকরূপে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল—নিতান্ত দুরদৃষ্টের সময় যে তাহাকে সাদরে নিজের কোলে স্থান দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, আবার একদিন যার অনুযোগ তিরস্কার ও মিনতি উপেক্ষা করিয়া সে তার নিকট হইতে নিজেকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিল—সে দ্বারে বসিয়াই কাটাইল। যেটুকু সুখ সে মাতৃহীন হইবার পর লাভ করিয়াছিল তাহা এইখানেই—সে কথা আজ খুব পরিস্ফুটরূপেই সে অনুভব করিতে লাগিল। প্রাণঢালা নির্ভরতা ও প্রেম সে তো একমাত্র এইখানেই পাইয়াছে। সে যে তাকে তার সর্ব্বস্বই দিয়াছিল, নীরদ তার মূল্য না বুঝিয়া তাহা ধূলিলাঞ্ছিত করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, ফিরিয়া এতদিন পরে আবার সেই অনাদৃত দান কুড়াইয়া লইতে আসিয়াছে, কিন্তু—তার সুমুখে কি এবার এই ক্ষুদ্র দ্বার চিররুদ্ধ হইয়া গিয়াছে নাকি?

ভোরের আলোক প্রকাশিত হইতে না হইতে রাস্তায় লোক চলাচল

আরম্ভ হইল। ঠাকুরবাড়ীর নহবতে ভৈরবী রাগিণী বাজিতে লাগিল। নীরদ নিকটবর্ত্তী দোকানের সভ্যজাগ্রত ছোক্‌রা দোকানীর নিকট গিয়া সিদ্ধেশ্বরীর বাটীর অধিবাসীদিগের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল। এ দোকানী নূতন লোক, নীরদকে চিনিত না। বাঙ্গালীবাবুকে একজন ভাল খরিদ্দার ভাবিয়া খাতির দেখাইয়া বলিল—"আপনি ও বাড়ী ভাড়া নেবেন? তা নেন্ না, কলি ফিরিয়ে নিলেই সব দোষ কেটে যা'বে। না হয়, একটু বিলিতি ওষুধ ছড়িয়ে দিলেই হ'বে, বাড়ীখানি খাসা।"

নীরদ তার কথার ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ও বাড়ীতে কি হয়েছে? বাড়ীর লোকেরাই বা গেল কোথায়?"

দোকানী গম্ভীর হইয়া বলিল—"আর সে কথা কি বলবো বাবু। ঐ সেদিন পেলেগ হয়ে বাড়ীতে দু'জন মারা গেল না! আহা, মেয়ে তো নয়, যেন সাক্ষাৎ রাধিকা ঠাকুরুণ, একখানি থানপরা—তা'তেই যেন রূপ ফেটে পড়চে—"

নীরদ আর দাঁড়াইল না।

বন্ধন কাটিয়া আসিতেছে—শিবানী নাই! পাষণ্ডের নিষ্ঠুর অত্যাচার বক্ষে লইয়া নীরবে জীবনের দুঃখভার বহন করিয়া সে সকল যন্ত্রণার হাত এড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে। ব্যর্থ জীবনের মর্ম্মচ্ছেদী তৃষা আজ তার প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের কানায় কানায় ভরিয়া নাই, অনাদৃত সেই প্রেমমাল্য, যাহা সে ছিঁড়িয়া মাটিতে ছড়াইয়া দিয়াছিল, সেই সুরভি-হার আজ যাঁর কণ্ঠ হইতে কোনদিন বিস্মৃত হইবার আশঙ্কা নাই, তাঁহারই বক্ষে লুণ্ঠিত। অনাদৃত ও অনাদৃতা উভয়কেই তিনি অমৃতময় বক্ষে তুলিয়া লইয়াছেন।

নীরদ আজ মুক্ত! যে বন্ধনের ব্যথা, বন্ধন ছাড়াইয়া গিয়াও

মুহূর্ত্তের জন্য ছাড়ে নাই, আবার যে বন্ধনের মধ্যে আসিতে হইবে ভাবিয়া লজ্জা ক্ষোভ ও ভাবনায় তার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া থামিয়া যাইয়া তাহাকে পৌরুষহীন জড়ে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিতে প্রায় সক্ষম হইয়া আসিয়াছিল, সে আজ স্বয়ং যখন তার বন্ধন-রজ্জু কাটিয়া দিয়া গিয়াছে—শুনিল, তখন নীরদ কই মনে করিতে পারিল না তো সে আজ ভাগ্যবান্—সে মুক্ত!—মুক্ত?—ইহারই নাম মুক্তি? সে কি ইহাই চাহিতেছিল? এমন সম্ভাবনা সে মনেও স্থান দেয় নাই, ইহা তার পক্ষে মুক্তি নহে—দৃঢ় বন্ধন। যে অনুতাপ ও আত্মগ্লানির দাহ সহ্য করিতে না পারিয়া সে অস্থির হইয়া বেড়াইয়াছে, কোথাও শান্তি পায় নাই, তা'ই সমুদয় গর্ব্ব অভিমান ও লজ্জাকে পদদলিত করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে ছুটিয়া আসিয়াছিল, সেই অনুতাপের জ্বালা যে জীবনব্যাপী চতুর্গুণ দাহ লইয়া তাহাকে নিয়ত দগ্ধ করিতে থাকিবে, একটি দিনও যদি অবসর দিতে শিবানি?

অনাহারে অনিদ্রায় যেমন আসিয়াছিল, তেমনি ফিরিয়া চলিল।

ট্রেন ছাড়িলে ত্বরিত হস্তে নীরদ একবিন্দু তপ্ত অশ্রু মুছিয়া ফেলিল। দেখিতে দেখিতে হিম কুহেলিকার ন্যায় সমস্ত নগরী তার চক্ষের সম্মুখ হইতে অদৃশ্য হইয়া দূরে মিলাইয়া গেল। বাষ্পযান প্রচুর ধূমোদ্গীরণের সহিত উচ্চ চীৎকার করিতে করিতে দূর হইতে দূরান্তরে ছুটিয়া চলিল। দুই পার্শ্বে গিরি, নদী, দেবালয়, গ্রাম ও সুবিস্তীর্ণ মাঠ বায়স্কোপের বিচিত্র চিত্রের মত একটার পর একটা দেখা দিয়া অদৃশ্য হইয়া যাইতেছিল। কত পুরাতনের স্মৃতি কত নূতন অধ্যবসায় কত সুখদুঃখ হাসিকান্নার সম্মিলিত রূপ ইহাদের মধ্যে মিশ্রিত, কতদিনের কত কথাই ইহাদের সহিত বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। নীরদ অপলক নেত্রে চাহিয়া রহিল। চলন্ত গাড়ির সহিত দৃশ্য-সমুদয়ও ছুটিয়া চলিয়াছে। চঞ্চল চিত্তের ভিতরও

সহস্র স্মৃতি ওতঃপ্রোতভাবে উঠিতে পড়িতেছিল। তার জীবনের গতিও এইরূপ মুহুর্মুহুঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে না কি? বেদনায় বুকের ভিতর টন্‌টন্ করিয়া উঠিতেছিল, মাথার মধ্যে ঝিম্‌ঝিম্ করিতেছিল, হাত-পায়ের তলা শীতল ও বলহীন হইয়া আসিতেছে, হায়, কোন দিনই কি সে শান্তির মুখ দেখিতে পাইবে না? অভিশপ্ত, এমনি করিয়াই কি আমরণ—বিমানমার্গের কেন্দ্রচ্যুত গ্রহের মত লক্ষ্যহীন পথেই ঘুরিয়া বেড়াইবে—নিজের কক্ষায় কি ফিরিতে পারিবে না?

এবারও সে আর একবার তার কল্পনা-প্রবণ মস্তিষ্কের সাহায্যে নিজের ভবিষ্যৎকে সুচারুরূপে গড়িয়া তুলিয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে আর কখনও তার আশা উৎসাহ বা উন্নতির সহিত শিবানীর কোন সম্পর্ক স্থাপিত হয় নাই, বরং তাদের নিকট হইতে মূর্খ শিবানীকে সে সন্তর্পণে দূরেই সরাইয়া রাখিয়াছে। তার জ্ঞানতৃষ্ণা স্বদেশপ্রেম কর্ম্মোদ্যম প্রভৃতি উচ্চ ভাব যে সে ধারণা করিতে সক্ষম নহে, এইটাই তার বিশ্বাস থাকিলেও ইদানীং সে সেই ভ্রমটা সংশোধন করিয়া তাহার স্থলে নূতন একটা অনুকূল ধারণাকে ধরিয়া লইয়াছিল। ভাবিতে গিয়া সে দেখিতেছে, যাহাকে সে বিদ্যাবুদ্ধি-জ্ঞানকর্ম্মে তার অনুপযুক্তা বলিয়া অবজ্ঞার চোখে দেখিয়া আসিয়াছে, বস্তুত সে তাহা নহে, তেজস্বিতা ও মমতায় পরিপূর্ণ সেই কালো চোখের ছায়া-নিবিড় পক্ষ্মতলে বুদ্ধি ও জ্ঞানের একটা অনন্যসাধারণ জ্যোতিঃ সর্ব্বদাই বিচ্ছুরিত হইতেছে, তার পরে—হৃদয়ধর্ম্ম? সিদ্ধেশ্বরীর কন্যা হইলেও সে কত মহৎ। কিসে সে তার উচ্চ আদর্শের সহিত মিশিতে পারিবে না? তা ছাড়া পরের গণ্ডি মূর্খ ছেলে লইয়া সে আদর্শ মানুষ গড়িতে বসিয়াছে, নিজের স্ত্রীকে মনের মত গড়িয়া লইতে পারিবে না?

নীরদ কয়দিন ধরিয়া অনেক ভাঙিয়া গড়িয়া অবশেষে একটা চিত্রকে

কল্পনার তুলিতে ফলাইয়া তুলিয়াছিল। তার তপোবনে, আশ্রম-গৃহের সে গৃহলক্ষ্মীর আসনে তপস্বিনীর প্রতিষ্ঠা করিবে। ক্ষৌমবসনা শঙ্খবলয়ধারিণী প্রশান্তবদনা নারী, তার পূত হস্তে আশ্রমখানিকে পবিত্রতম করিয়া তুলিবে। আনন্দময়ী জননীরূপে শিশুবৃন্দকে স্নেহ রুগ্নকে সেবা ও শিশুকে শুশ্রূষা দ্বারা সে তার কর্ম্মভার লঘু করিয়া নিজে তাহার অংশ গ্রহণ করিবে, আবার নিয়মিত পূজা উপাসনা কালে পার্শ্বে বিরাজিতা রহিয়া তার শাস্ত্রালোচনা, শাস্ত্রব্যাখ্যায় প্রাণমন ঢালিয়া দিবে, বিশ্রামে কর্ম্মে ক্লান্তিতে সুখে দুঃখে এক হইয়া যাইবে, এমনি করিয়া প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর একখানি ছবি বড় সাবধানে অল্পে অল্পে হৃদয়ফলকে ফুটাইয়া তুলিয়া তার দিকে লোলুপ দৃষ্টি সংন্যস্ত করিয়াছিল। সেই কল্পনামূর্ত্তির সহিত শুভ্রবসনা সৌম্যমূর্ত্তি বিধবার গৌরব-পবিত্র সম্মিলন করিতে গিয়া লজ্জা ও আত্মগ্লানির সহিত একটু কৌতুকও সে অনুভব করিতেছিল, এমন সময় সব ভাঙ্গিয়া গেল।

নীরদের কল্পনা তার আশা শুধুই যেন মরু মরীচিকা বা আকাশ-কুসুমে পর্য্যবসিত হইবার জন্যই সৃষ্ট! আজীবন ব্যাপিয়া জ্বালাই যার পাওনা, তার দাহ থামিবে কি দিয়া? শূন্য কামরায় জানালার কাঠের উপর মাথা রাখিয়া নীরদ জ্বালাময় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া স্থির হইয়া রহিল। হায়, সে যদি আর কিছুদিন পূর্ব্বে আসিত? সেই যখন আসিলই, তখন কেন এত বিলম্ব করিয়া ফেলিল?

হাট্‌রাস জংসনে গাড়ি থামিল। এইখানেই আরোহিগণের মেল ধরিবার কথা। কুলীর 'বাবু! বাবু!' ডাকে সজাগ হইয়া তাড়াতাড়ি সে নামিয়া পড়িল, তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে।

পাঞ্জাব মেল আসিতে আধ ঘণ্টা দেরি, একটা কুলীর হাতে ব্যাগটা দিয়া নিশ্চলপ্রায় চরণকে টানিয়া লইয়া সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে

লাগিল। শরীরটাকে যেন আর বহিতে পারিতেছিল না, মাথা ঘুরিতে এবং পা টলিতেছিল—এমন সময়—"মিঃ রায়, না? হ্যাঁ, এই যে, তুমি কোথা থেকে?" বলিয়া পিছন হইতে কে' কাঁধে হাত দিল। গলাটা চেনাচেনা, নীরদ পিছন ফিরিয়া দেখিল, মাদ্রার একজন পরিচিত বন্ধু—বীরেশ্বর দত্ত।

বীরেশ্বর তাহাকে দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিল, তার স্কুলের কথা জিজ্ঞাসা করিল, প্রশ্ন করিল—"কোথা গেছলে? যাচ্ছ কোথায়?"

নীরদ বলিল—"বৃন্দাবন থেকে আসচি, বোধ হয় কল্‌কাতায় যা'ব?

"বোধ হয়?—ঠিক নেই নাকি?"

নীরদ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"না, কল্‌কাতাতেই যা'ব, তুমি কোথায়?"

"আমি যাচ্ছি, একটু ভ্রমণে, এই দিল্লী পর্য্যন্ত, তা'র পর আর কি, ঘরের ছেলে ঘরে।—তুমি দিল্লী গেছ?"

নীরদ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—যে যায় নাই।

"ব'ল কি! জগতের মধ্যে একটা প্রধান জিনিষই দেখলে না—অ্যাঁ! না না, তা কি হয়? চল, আমার সঙ্গেই চল, একটু ঘুরে আসবে। ক'টা দিনই বা? তা'র পর আমি চন্দননগর, আর তুমি হাবড়া, ব্যস্। কি হে, কথা কওনা যে? যাচ্ছ তো? তোমার চেহারা বড্ড শুকিয়ে গেছে, তা' অসুখ বিসুখ হ'লে তোমার ভয় নেই, আমার সঙ্গে তা দেখ, হোমিওপ্যাথিক বাক্স, রুবিণীর ক্যাম্ফর, কুইনিন পিল, তারপর দেখ, ডিসেণ্টি্র পিল-টিল সব আছে। পেটেণ্ট-টেটেণ্ট কিছুই আমি কিনতে বাকী রাখি নি, আমার শরীরটা ভারী দুর্ব্বল কি না, ওষুধের বিজ্ঞাপন দেখলেই পড়ি, হ্যাঁ—তবে আমার রোগটার একটা খুব সুলক্ষণ এই দেখতে পাই, যখন যে রোগের কথা পড়ি, আমার রোগের সব লক্ষণই

প্রায় তা'র সঙ্গে মিশে যায়, এখন ডাক্তারের হুকুমে বেড়াতে বেরিয়েছি। ডাক্তার বলে পাঁচটা দৃশ্য দেখে শুনে বেড়ালেই সব সেরে যা'বে। হ্যাঁ, তা হ'লে তুমি দিল্লী যাচ্ছ, কেমন ?—চল, চল, একা মন লাগে না।"

দুইটা দিন অন্ততঃ অন্তরের আঘাত সামলাইয়া লইবার জন্য ব্যয় করার প্রয়োজন বুঝিয়াই নীরদ উত্তর করিল—"চল।"

বীরেশ্বর মহাস্ফূর্ত্তির সহিত তার হাতটায় একটা ঝাঁকানি দিয়া সোৎসাহে কহিয়া উঠিল—"থ্যাঙ্ক ইউ ভেরী মাচ্।"

৪২

দিল্লীর জুম্মা মসজিদ কেল্লা প্রভৃতি দর্শনীয় স্থান দেখা হইয়া গেলে চারদিনের দিন বীরেশ্বর নীরদকে মুক্তি দিয়া বলিল—"এবার ফেরা যেতে পারে, আর তোমায় ধরে রাখব না।"

শুনিয়া নীরদ যতটা উচিত ছিল খুসী হইতে তো পারিলই না বরং একটু বিপন্ন বোধ করিল। অতীত গৌরবের স্মৃতিজর্জ্জরিত সমাধিক্ষেত্রে কয়দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে যেন ক্লান্ত হইয়া উঠিয়াছে, সে চাহিতেছিল—শান্তি, কিন্তু এখানে প্রতি প্রস্তর খণ্ডটির সহিত পুঞ্জীভূত অবসাদ বিজড়িত রহিয়াছে। শ্রান্ত উপকূল-প্রয়াসী প্রাণ যাহা খুঁজিতেছিল, তাহা কোথায় ? তথাপি যখন বীরেশ্বর বলিল—'এখন ফিরতে পারো', তখন মনে হইল থাকাটাতে কিছু আকর্ষণ নাই সত্য, তথাপি ফিরিবার আগ্রহ আরও কম।

সন্ধ্যার সময় আকাশের বিচিত্র শোভা যমুনাবক্ষে উদ্ভাসিত হইতেছিল। শীত-বিশীর্ণা নদী সন্ধ্যারাগরঞ্জিত বক্ষমগ্ন গগনছবি আনন্দে নাচাইতে-ছিল, মৃদুমন্দ বাতাসে জল পুলককম্পিত ও মৃদুতরঙ্গায়িত, প্রকৃতি অলক্ষ্যে অন্তর ও বহির্জ্জগতে পরিবর্ত্তন আনিয়া দিতেছিলেন, নদীবক্ষে স্রোতের মুখে নৌকা ছাড়িয়া ধীবর সময়োচিত ভাষায় আপনাকে ধিক্কার দিতেছে। দিবস-অন্তে পরিশ্রমের পরিসমাপ্তির মনোজ্ঞ স্ফুরণ। দূর-সমাগত পরিশ্রান্ত তরঙ্গটি যেন তার বিরামের উপকূল খুঁজিতেছে। ধীবর গাহিতেছিল—'দিন চলিয়া গিয়াছে, সম্মুখে গভীরা রজনী সমাগতা, যাত্রীর দল চলিয়া গেল, এখনও ওরে মূঢ়, ওরে ভ্রান্ত, এখনও পশ্চাতে ফিরিয়া কি দেখিতেছিস্? আর কেন? আর কেন? পিছনে না চাহিয়া সোজা পথে চলিয়া আয়, বিলম্ব হইয়া যাইতেছে, আর না, যে গেছে, তা'র সঙ্গ লইবি যদি তো ছুটিয়া যা, যে পড়িয়া রহিল, তার জন্য ওরে ভীরু! তাহার জন্য দেরি কেন?'—প্রকৃতির মধ্যে শোভা আছে কিন্তু সে সৌন্দর্য্যে যেন প্রাণ নাই! সঙ্গীতের সুরে ঝঙ্কার ও পুষ্পে সৌরভহীনতার মত সর্ব্বত্রই যেন একটা অপূর্ণতা—অতৃপ্তি ভরিয়া রহিয়াছে।

নীরদ তাদের বাসাবাটীর একতলার বারান্দায় অগণ্য জ্যোতিষ্ক-স্ফুরিত মহিমান্বিত মুক্ত গগন চন্দ্রাতপতলে একা দাঁড়াইয়া গান শুনিতে ছিল। 'যে চলিয়া গিয়াছে', তার সঙ্গে তো তার প্রার্থিত ছিল না, হায়, সে যে তাহার প্রতীক্ষা করিয়া অবশেষে ম্লান বিশুষ্ক হইয়া মাটিতে ঝরিয়া পড়িয়াছে! তবে এখন—আর কেন, তারই অনুসরণে ছুটিয়া ফিরা? না, কোন প্রয়োজন নাই। যাহা ছিল না তাহা নাই বা থাকিল? লঘুচিত্ত মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত সে তার স্বহস্তরচিত কানন-পাদপছায়ায় নিঃসঙ্কোচে ফিরিয়া যাইবে, অলক্ষ্য উপহাস-বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইয়া হৃদয়ের

নিভৃত প্রান্ত হইতে আকর্ণ কপোল রঞ্জিত করিয়া তুলিবে না। জগতের এই একটি মাত্র প্রাণীর স্মৃতিতল ভিন্ন এত বড় একটা কাপুরুষতার ইতিহাস জগৎ হইতে চিরবিস্মৃতির সমাধিগর্ভে বিলীন হইয়া যাইবে।—এ কি মহা মুক্তি দিলে তুমি, শিবানি!

নীরদ উর্দ্ধনেত্রে আকাশের প্রতি চাহিয়া কাহারও উদ্দেশে যেন অন্তরের অসীম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল।

কিন্তু পরক্ষণেই চিত্ত লঘুতর হইয়া ক্রমেই শূন্য হইয়া আসিল। সে যে তাহাকে বিদায় দিল, তবে কাহাকে সেখানে স্থাপন করিবে? যাহা লইয়া আছে, যাহা তাহার আজন্মের উপাসিত তাহার চেয়ে কি অনাদৃতা একটা বালিকার স্মৃতি?—এতদিন এ স্মৃতি তার নিকট লজ্জার কশাঘাত-স্বরূপ যন্ত্রণাকর ছিল, ইহাকে তো সভ্রুভঙ্গে দূরে ঠেলিয়াই ফেলিতে গিয়াছে, করুণা কটাক্ষে কাছে টানিয়া লয় নাই। আর আজ যতই তাহাকে ভুলিবার চেষ্টা করিতেছে, ততই যেন তার গোপন সৌন্দর্য্য-রাশি ইন্দ্রজালের মত প্রকাশ করিয়া শত প্রলোভনে তাহারই পানে সবলে আকর্ষণ করিতেছে। সংযম শাসন ব্যর্থ করিয়া প্রাণটা বলিতেছে —"সে ভিন্ন সব বৃথা সব শূন্য! মনের ভিতর পুঞ্জীভূত অনুশোচনা তীক্ষ্ণ ছোরার মত বিঁধিয়া তিরস্কার করিতেছে—'বৃথাই, এতদিন নষ্ট করিলি!' সে দেখিল—চিরদিনই সে নিজের সম্বন্ধে নিজেই অন্ধ, কোনদিনই আপনাকে চিনিল না। অবজ্ঞায় যাহাকে একদিন চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিবারও অবসর ঘটে নাই, আবার একদিন যে সেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রার্থিততম হইয়া দাঁড়ায়, বৈচিত্র্যময় জগতে ইহা যে একটা কি গূঢ় রহস্য—কি অখণ্ডনীয় প্রতিশোধ, তাহা বুঝিবার সাধ্য নাই, কিন্তু ইহাতে বাধা দিবার শক্তিও কাহারও থাকে না—এইটুকু আশ্চর্য্য!

শিবানী গিয়াছে? না, কোথায় গিয়াছে, সে? দূরে ছিল, আজ

সে—অন্তরের অভ্যন্তরে স্থান গ্রহণ করিয়াছে। রাজরাজেন্দ্রাণীর মহিমায় সেই সংযতবাক্, দীনা বালিকা তার নিজ অধিকারে সগর্ব্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, আজ তার কৃষ্ণ তারকোজ্জ্বল বিশাল চক্ষে ভিক্ষার নীরব আবেদন নাই, মৌন অধর-প্রান্তে নাই সেই নিবিড় ছায়াময় অভিমানের হতাশা—নিজের পরিপূর্ণ গৌরবে সে সহধর্ম্মিণীর আসন গ্রহণ করিয়াছে। নীরদের সর্ব্ব শরীর বিস্ময়ে স্পন্দিত হইতে লাগিল, মুদ্রিত নেত্রে স্বপ্নাভিভূতের মত বলিল—"এসো, তুমি এসো—সতি! পুণ্যবতী! সহধর্ম্মিণী!"

ষ্টেশনে পৌঁছিয়া টিকিট কিনিবার সময় নীরদ বলিল—"এসো, বেনারসের টিকিট কিনি।"

বীরেশ্বর ঈষৎ বিস্মিত হইল, বলিল—"হঠাৎ!"

"ইচ্ছা হ'ল।" বলিয়াই নীরদ মুখ নীচু করিয়া রহিল। বীরেশ্বর কহিল—"কখন্ তোমার যে কি খেয়াল! প্রথমে তো দিল্লী যেতেই নারাজ, এখন আবার ফিরতেই চাও না, তা—যা'বে তো চল, অগস্ত্যকুণ্ডু ১০০।১২ নম্বরে আমার মাসীমা আছেন, সেখানে সুখেই দু'দিন থাকা যেতে পারবে, তা ছাড়া যাচ্ছি তো ক'টা দিন থেকে, কংগ্রেসটাও দেখে আসা যাবে—তোমার বোধ করি এতে খুব সহানুভূতি আছে, এই 'বয়কটটার' সঙ্গে!—না!"

"সমস্ত ভারতবাসীরই থাকা উচিত, যা'র নেই—"

"সে মানুষ নয়, এই না!"

"ঠিক।"

বীরেশ্বর হাসিয়া বলিল—"আমরা তা' হ'লে পশু?"

"যা বল—তোমার ছুটী কদ্দিনের?"

নীরদ কথা উল্টাইতেছে দেখিয়া বীরেশ্বর হাসিয়া কহিল—"বোধ করি চিরদিনেরই, আমার আর পোষাচ্ছে না সেখানে, কলকাতায় ফিরে যদি

কোথাও একটু সুবিধা করতে পারি তো আর নাবালকের মোসাহেবী করতে যাচ্ছি নে।"

টিকিট বেনারসেরই কেনা হইল, প্ল্যাটফর্ম্মে লোক বেশী ছিল না। দুই জনে বেঞ্চে আসিয়া বসিলে নীরদ জিজ্ঞাসা করিল, "ওখানে কত পাচ্ছ?"

বীরেশ্বর শালখানা ভাল করিয়া মুড়ি দিয়া কাশির একটা পিল মুখে ফেলিয়া বলিল—"তা মন্দ দেয় না, দেড়শো টাকা মাইনে, তা ছাড়া বাড়ী—"

"তবে হঠাৎ ছাড়বে যে?

"কি করি ব'ল না। ও রকম হস্তিমূর্খ ছেলেকে পড়ানোর চাইতে সপরিবারে না খেয়ে মরাও যে ভাল! তা'র উপর কিছু বলবার যো নেই, একদিন রাজকুমারকে একটু ধমক দিয়েছিলুম, অমনি দু'দিক থেকে দু'বেটা মোসাহেব ছুটে এসে তা'র মাথায় খানিক ফুলেল তেল থাবড়ে হাওয়া করতে আরম্ভ করলে, জিজ্ঞাসা করলুম, তা বল্লে কি না— 'আপনার ধমক খেয়ে বাবু সাহেব যদি মূর্চ্ছা যায়! আবার তা'তেই শেষ হ'ল না—বিকেল বেলা গিয়ে শুনলুম, আমার ধমকে কুমার সাহেবের জিউ ঘাবড়ে গেছে, আজ রাণীজী পড়তে দিতে পার্ব্বেন না। এই তো ব্যাপার! এমন চাকরী কি পোষায়?"

ঘণ্টা পড়িল ও গাড়ী নিকটবর্ত্তী হইল। নীরদ একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল—"আমার স্কুলে কিন্তু পারিশ্রমিক কম। তাতে কি পোষাবে?"

বীরেশ্বর বর্ত্তাইয়া গেল, "আঃ, তা হ'লে তো ভালই হয়। তুমি তো পঞ্চাশ টাকা দাও বলেছিলে? তা'তেই চলে যা'বে। গিন্নিও সম্প্রতি পৈতৃক ধন কিছু পেয়েছেন, বলচেন ব্যবসা করতে, তা তোমার সঙ্গে থাকি তো বিলিতী জিনিষ ব্যবহার করব না, তাতে খরচ কমবে।"

নীরদ আবেগের সহিত তাহাকে আলিঙ্গন করিল।

বর্ষার বাতাস হুহু করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। আকাশ মেঘে ভরা, বৃষ্টিরও বিরাম নাই। এক পা কাদা মাখিয়া ছাতা বা তাল-পাতার টোকা মাথায় পথিকেরা পথ চলিতেছিল, রাস্তার ওপারে মুদির দোকানে বিলাতী কম্বল গায় বুড়া দোকানী কারিকরকে বেগুনির জন্য তেওড়ার দাল কেনাইতে উপদেশ দিতেছে ও মধ্যে মধ্যে থেলো হুঁকায় কলাপাতার নলে টান দিতে দিতে খাঁচার পোষা ময়নাটিকে 'হরে কৃষ্ণ, রাম রাম', বুলি শিক্ষা দিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে, শীতে ও বাদলায় পক্ষীশিশু অস্ফুটবাক্‌ হইয়া গিয়াছিল। সঙ্কীর্ণ গলিপথ—দুই একখানা গোরুর গাড়ী কেরোসিনের টিন বোঝাই লইয়া বলাইচন্দ্র শীলের আড়তের দিকে অত্যন্ত অনিচ্ছুক মন্থর গমনে চলিয়াছে, তাদের চক্রমথিত কর্দ্দমে পার্শ্বের ইষ্টক প্রাচীরগুলো চিত্র-বিচিত্র হইয়া উঠিতেছিল।

সেই অপ্রশস্ত পথের ধারে—ক্ষুদ্র একখানা বাড়ীর মধ্যে রাস্তার ধারের একটি একতল ক্ষুদ্র গৃহের খোলা জানালার নিকট বসিয়া একটি তরুণী ছেঁড়াসাড়ী সেলাই করিতেছিল। ঘরখানি ক্ষুদ্র; ঘরের আসবাব-পত্র সামান্য, দরিদ্রের গৃহ বলিয়াই মনে হয়।

মেয়েটি কোলের উপর সেলাইটা রাখিয়া কিছুক্ষণ কার্য্য করিতেছে, আবার অল্পপরেই ক্লান্ত হইয়া তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক জানালার বাহিরে রাস্তার দিকে চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতেছে, মধ্যে মধ্যে জানালার কপাটে পিঠ রাখিয়া চক্ষু মুদিয়া ক্লান্তি দূর করিয়া লইতেছে।

কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ জ্যোৎস্নার মত, শীত রাত্রির কুহেলিকাসমাচ্ছন্ন পাণ্ডু চন্দ্রের ন্যায় বিবর্ণা এই অপরিচিতা নারীই যে শান্তি, তাহা তাহাকে দেখিলে বিশ্বাস হয় না। সুবিধা এইটুকু যে, এখানে এই দীর্ঘদিনের মধ্যে কোন পরিচিত লোকের সহিত তার সাক্ষাৎ ঘটে নাই, তার স্বামী সেই যে তাকে তার সকল আশ্রয় সকল আনন্দ সকল গৌরব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনিয়া স্বামিত্বের সমস্ত দাবী পরিশোধ করিয়া দিয়াছে সেই পর্য্যন্তই এই নিরানন্দ নির্ব্বাসনে সে একাকী। সেই পর্য্যন্ত জগতের সমস্ত আশা আনন্দের আলোক স্পর্শ তার নিকট হইতে নিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সূর্য্যাস্তের পর গোধূলির ম্লান আভাটুকু—সন্ধ্যার শ্যামাঞ্চলে নিঃশব্দে মিলাইয়া আসিবার পূর্ব্বক্ষণে যেমন বিষণ্ণ কাতরতার সহিত এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া ধরণীর পানে চাহিয়া দেখে, অতীত দিনের সুখস্মৃতির পানে—শান্তির বর্ত্তমান জীবনও তেমনি অবসানোন্মুখ ম্লান দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছিল। এই পথ দিয়া দিনের মধ্যে একটিবার লালপাগড়ী মাথায় ডাকের পিয়ন স্কন্ধবিলম্বিত চামড়ার ব্যাগ ঝুলাইয়া 'চিঠি আছে' হাঁক দিয়া দুই একটা দ্বারে আসিয়া দাঁড়ায় এবং চিঠি বিলি করিতে করিতে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলিয়া যায়। দূর হইতে যতই সে নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, শান্তির আশা-উদ্বেলিত বক্ষ ততই যেন স্থির হইয়া আসে, অবশেষে সে যখন দ্বার অতিক্রম করিয়া সম্মুখস্থ আমবাগানের শুঁড়ী পথ ধরিয়া দত্ত বাবুদের বাগান বাড়ীর অভিমুখে প্রস্থান করে তখন তার অশ্রুরাশি বন্ধনমুক্ত জলস্রোতের মতই দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠে।

সেদিন সে রাস্তায় লাল পাগড়ী দেখা গেল না। শীতের বাতাসে গায় কাঁটা দিয়া উঠিতেছিল, আলস্যে সমস্ত শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, তথাপি চুম্বকাকৃষ্ট লৌহের ন্যায় সেই লাল পাগড়ীধারী পিয়নের আকর্ষণে

জানালা ছাড়িয়া সে উঠিতে পারিতেছিল না। ক্লান্ত মস্তক জানালার কবাটের উপর রক্ষা করিয়া অদূরস্থ বৃহৎ অট্টালিকার শ্বেত প্রাচীরের দিকে সে তাকাইয়া রহিল।

সেও একদিন অমনি অট্টালিকায় বাস করিত, এইরকমই আমগাছের ছায়ার মধ্যে প্রশস্ত দীর্ঘিকার সান-বাঁধানো ঘাট পাখীদের মধুর সঙ্গীতে ও পুরবাসিনী নারীগণের হাস্য-কলরবে মুখরিত থাকিত। যখন অদূরস্থ কোন দেবালয়ে সন্ধ্যারতির কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠে, তখন তার মনের মধ্যে আরও উদ্দাম ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠে, দুই চোখের জলধারায়—অস্পষ্ট ছায়ার মধ্যে সেই এক পরিচিত মন্দিরের পরিচিত মূর্ত্তিগুলি মনে পড়িয়া যায়, হয় তো এতক্ষণে সেখানেও এমনি করিয়া কাঁসর ঘণ্টা বাজাইয়া আরতির প্রদীপ জ্বালাইয়া সন্ধ্যারতি আরম্ভ হইতেছে, সেই আলোকিত মন্দিরের মৃদু সৌরভরাশির মধ্যে দেব-প্রতিমার সমস্ত দৃশ্যটা মনের ভিতর একখানা ছবির মত সুস্পষ্ট হইয়া উঠে, সবই যথাযথ আছে, শুধু সে নাই! শ্যামাকান্ত সেই যে নববধূর হরিদ্রা সূত্রবদ্ধ কচি হাতখানা ধরিয়া আনিয়া শ্যামার দিকে চাহিয়া বলিয়াছিলেন—"দেখ্‌ছিস্, মা পাষাণি! মাতৃহীন আবার মা পেয়েছে!" তার অধিকৃত স্থানটিই আজ সেখানে শূন্য! পাষাণ-প্রতিমা তেমনি হাস্যাধরী, মন্দির কক্ষের শুদ্ধ বায়ু তেমনি সুরভি-স্নাত, পুরোহিত ও দর্শকগণ তেমনি ভক্তি-বিহ্বল। এইরূপে দিনে রাত্রে শ্বশুর ও বাপের বাড়ীর কত কথা, কত আদর—অবিরাম মনে জাগিয়া উঠে। আর সব চেয়ে বেশি করিয়া মনে পড়ে, পিতার কথা—কি স্নেহময় পুণ্য-চরিত্র পিতার প্রাণে সে কি দারুণ আঘাত দিয়া আসিয়াছে! এ ভুল কি এ জন্মে আর ভাঙ্গিবে না? দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া অসম্বরণীয় আবেগে সে কাঁদিয়া ফেলে।

সহসা রাস্তায় পথিকগণের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি বিরক্তিসূচক শব্দ

করিয়া উঠিল—"আঃ, কি পিছল! মিউনিসিপ্যালিটি কি ঘুমুচ্ছে? রাস্তা ঘাটের কি দশা!"

এ যে পরিচিত স্বর!—শান্তি চমকিয়া মুখ তুলিল—পথিকের প্রতি চোখ পড়িতেই সে বিস্ময়ে অস্ফুটধ্বনি করিয়া উঠিল—"মিষ্টার রায়!" পথিকও শব্দানুসরণে সাশ্চর্য্যে সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিল এবং স্বপ্নজড়িত স্বরে বলিয়া উঠিল—"রজনীবাবুর মেয়ে না?" অনেক দিন পরে শান্তির পাণ্ডু মুখখানি একটু লাল হইয়া উঠিল, ম্লান হাসি হাসিয়া সে বলিল—"চিনতে পারচেন না?"

"পেরেছি—কিন্তু এ কি আশ্চর্য্য সাক্ষাৎ শান্তি! কা'দের বাড়ী এ?"

শান্তি উত্তর দিল না, তার সব শক্তিটুকু যেন নিঃশেষ হইয়া ফুরাইয়া গেল? তার মুখের অস্বাভাবিক বিবর্ণতা দেখিয়া নীরদকুমার ব্যাকুল আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল—"আমি কি বাড়ীর মধ্যে যেতে পারি?"

শান্তি উঠিয়া কম্পিত স্বরে—"আসুন", বলিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

দুই এক কথায় নীরদ ব্যাপারটা এক রকম বুঝিয়া লইল, যে কারণেই হউক, হেমেন্দ্র তার পিতার সহিত বিবাদ করিয়া শান্তিকে তাঁদের নিকট হইতে কাড়িয়া আনিয়াছে, এই অপরিচ্ছন্ন ক্ষুদ্র আবাসই এখন শান্তির গৃহ! তীব্রস্বরে সে বলিয়া ফেলিল—"এত নিকৃষ্ট লোকের হাতে তুমি পড়েছ শান্তি! কি ভয়ানক!" বলিতে বলিতে শান্তির অপ্রতিভ ভাবে লজ্জা পাইয়া থামিয়া আত্মসম্বরণ করিয়া লইল। সংসারে কেমন করিয়া চলিতে হয়, তাহাও শিখিল না সে!

আহতভাবে কহিল—"আমায় কিছু লুকিও না, মনে কর, আমি তোমার বড় ভাই—কেন তোমরা লক্ষ্মীপুর থেকে চলে এলে? এলেই যদি, তবে এ অবস্থায় কেন? রজনীবাবুর মেয়ে তুমি, তুমি আজ

এ কোথায়? কি চেহারা হয়ে গেছে তোমার!—এসবের মানে কি?"

এই সুগভীর মর্ম্মস্পর্শী স্নেহসম্ভাষণে শান্তির এতদিনকার অনাদৃত বেদনারাশি আবেগ তরঙ্গে উথলিয়া উঠিতেছিল—সে আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না? কতদিন যে সে এমন স্নেহের ভাষা শুনে নাই! কিন্তু মাদুরার সেই বিদায়-দৃশ্যের পর আজ এই শ্রদ্ধাপূর্ণ মহৎ বন্ধনস্থাপন, এত কষ্টের মধ্যেও ইহা যেন তাহাকে অনেকখানি স্বচ্ছন্দতা দান করিল। সে চোখ মুছিয়া বলিল—"সেখানে দিদি এসেছেন কিনা—তা'ই আমরা থাকতে পারিনি" বলিতে বলিতে সে মুখ ফিরাইয়া লইল।

নীরদ সাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিল—"দিদি?—দিদিটি কে'?"

শান্তি অন্যদিকে ফিরিয়াই উত্তর দিল—"আপনি বুঝি জানেন না—আমার যা—তিনি বৃন্দাবনে তাঁ'র ছেলেটিকে নিয়ে থাকতেন, আমরা গিয়ে তাঁ'কে এনেছি।"

আকস্মিক বজ্রপাত রবে স্তম্ভিত পথিকের মত স্তব্ধ দৃষ্টি বহুক্ষণ পরে ফিরাইয়া নীরদ গভীর বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিল—"কে এসেছে? বিনোদের স্ত্রী! সে বেঁচে আছে? সত্যি এ কথা?"

তাহার ভাব দেখিয়া শান্তি বিস্ময়বোধ করিল কিন্তু তাহা প্রকাশ না করিয়া কহিল—"আছেন বৈ কি! তাঁ'র নাম শিবানী—তাঁর ছেলেটি কি রকম যে সুন্দর!"

নীরদ তীব্র স্বরে বলিয়া উঠিল—"বুঝেছি শান্তি! শিবানীর নাম নিয়ে কোন পাপিষ্ঠা স্ত্রীলোক তোমাদের বিষয়ে ভাগ বসাতে এসেচে? সে তো বেঁচে নেই; তা'ই হেম সহ্য করতে পারে নি—চলে এসেছে! আমি তা'র ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দোব—

লজ্জায় আতঙ্কে শিহরিয়া শান্তি আর্ত্তভাবে কহিল—"ও কথা বলবেন

না—আপনি অমন কথা বলবেন না!—ঐ একজন ভিন্ন কেউ এ কথা বলে নি। তিনি সতী-লক্ষ্মী, পুণ্যবতী। আজন্ম দুঃখ পাচ্ছেন, তা'র উপর তাঁকে এ রকম অপবাদ দেওয়া মহা অধর্ম্ম। নিজে তো তিনি আসেন নি, তাঁর স্বামীর পরিচয়ও তিনি জানতেন না, জ্যেঠামশায়ই আমার ভাসুরের সঙ্গে অমুর মিল দেখে খুব কাঁদতে লাগলেন, তা'র পর তাঁ'র কাছে পাওয়া জ্যেঠাইমার ছবি ও নামলেখা আংটি থেকে বোঝা গেল—কে' তাঁরা।—সব্বাই বলে—অমু ঠিক তা'র বাপের মত দেখতে।"

শান্তির কথাগুলি নীরদ স্থির হইয়া শুনিল, সত্যই এমন কিছু সে শুনে নাই, যাহাতে নিশ্চিত হইতে পারে—যে শিবানীর মৃত্যু হইয়াছে? কি ভয়ানক! তার একটি সন্তানও আছে? সে তার সন্তানের মাতা সমেত তাহাকে এতদিন তাচ্ছিল্যভরে দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছিল। সেই নিজ-পুত্রের জননীকে নিজের মিথ্যা মৃত্যু-সংবাদ পাঠাইয়া আবার আর এক-জনকে বিবাহও করিতে চাহিয়াছিল। শান্তি যখন তাহাকে তার 'দিদি'র স্বামী বলিয়া জানিতে পারিবে?

গভীর লজ্জায় আরক্ত হইয়া নীরদ মাথা হেঁট করিল। অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া হৃদয়ের গভীর লজ্জা-জড়িত আকুলতা দূর করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া পরে কিছু সহজভাবে কহিল—"হেম কোথায়?"

ক্ষীণকণ্ঠে শান্তি উত্তর দিল—"কি জানি?"

"কখন্ আসা সম্ভব?"

"আজও আসতে পারেন, দু'দিন দেরিও হ'তে পারে।"

নীরদ বিস্মিত হইয়া কহিল—"এই নির্জ্জন পুরীর মধ্যে তোমায় একলা ফেলে সে বাড়ীতেও থাকে না?" বিরক্তিতে চিত্ত তার উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিল—"তোমার বাবার সঙ্গেও বোধ করি সে ঝগড়া করেচে?"

অশ্রুজলে শান্তির দৃষ্টি লোপ পাইয়া আসিতেছিল, সে উত্তর দিল না।

বিরক্ত বিস্মিত অনুতপ্ত নীরদ কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় বিদ্যুৎ হানিয়া কড় কড় শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল। আকাশ ঘন মেঘে ছাইয়া আসিতেছে, নীরদ বিপন্নের মত কিছুক্ষণ জানালার ভিতর দিয়া বাহিরের আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল, তা'র পর শান্তির পানে চাহিয়া দেখিল—নিঃশব্দে উদাস দৃষ্টিতে সেও চাহিয়া আছে, সেই অর্থহীন উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি তার বক্ষে সজোরে আঘাত করিল। সেই শান্তি! সুন্দর চঞ্চল আনন্দময় সংসার-সুখোদ্যানের সেই ফুটন্ত সুবাসিত ফুল—দেবতার পায়ের নির্ম্মাল্যটুকুর মত সুরভিত সুপবিত্র, সংসার সমরক্ষেত্রের এই নিষ্ঠুর আঘাত হইতে সেও রক্ষা পাইল না? কি বিচিত্র এই জগতের বিধান!

সহসা নীরদ জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার মা বাবা ভাল আছেন শান্তি? তাঁ'দের কাছে গেলে না কেন? তাঁ'রা কেন তোমায় এখানে থাকতে দিয়েছেন?"

আবার দমিত অশ্রু উথলিয়া উঠিতে চাহে, জোর করিয়া চোখের জল চাপিয়া রাখিয়া শান্তি মাথা নীচু করিল।

নীরদ উত্তরের জন্য কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রহিল, তা'র পর তার মনে হইল, মহৎপ্রকৃতির রজনীনাথের সহিত লঘুপ্রকৃতি জামাতা হেমের বনিবনা না হওয়া মোটেই আশ্চর্য্য বা অসম্ভব নয়। শান্তিকে ভালবাসিয়া না হউক—তাঁহাদিগকে দুঃখ দিবার মানসে সে হয় তো তাহাকে বলপূর্ব্বক আটক রাখিয়াছে। ভালবাসিলে তাকে কখনই এত কষ্ট দিতে পারিত না। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সমবেদনা ও আত্ম-গ্লানি মিশ্রিত করুণ চক্ষে চাহিয়া রহিল। ধরিতে গেলে সে-ই শান্তির সকল কষ্টের মূল।

শীতের অপরাহ্ন মেঘাড়ম্বরে বর্ষা-রজনীর ন্যায় অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল, আসন্ন বর্ষণের একটা বিপুল আয়োজন হইয়া উঠিতেছে, দুর্য্যোগময়ী প্রকৃতির পানে চাহিয়া নীরদের স্মরণ হইল, তাহাকে যাইতে হইবে। এখানে পুরুষহীন গৃহে সে একজন বাহিরের লোকমাত্র, অথচ শান্তিকে এই দুর্য্যোগরাত্রে একা ফেলিয়া চলিয়া যাওয়াও তার পক্ষে অকর্ত্তব্য। ভাবিয়া চিন্তিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হেম যদি না আসে, রাত্রে কি একাই থাকবে? চাকররা বিশ্বাসী তো?"

শান্তির ম্লান অধরে বিষাদের এক ফোঁটা অতি সূক্ষ্ম হাসি ফুটিতে ফুটিতে বিদ্যুতের ক্ষীণ রেখাপাতের ন্যায় চারিদিকের পুঞ্জীকৃত অন্ধকার-রাশির মধ্যে মিলাইয়া গেল—"চাকর তো নেই, একজন ঝি আছে, সেই থাকে, সে খুব ভাল।"

নীরদ চমকিয়া উঠিল। কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল—"আমি তোমায় এ অবস্থায় এই বনের মধ্যে ফেলে তো চলে যেতে পারি নে'—না হয়—"

তার কথা শেষ হইতে না দিয়াই তাড়িতাহতার ন্যায় চমকিয়া শান্তি আর্ত্ত দৃষ্টি মেলিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"না, না, আমায় কোন সাহায্য কর্ত্তে হ'বে না, আমি কত দিন এই রকম থাকি।" পাছে হেমেন্দ্র আসিয়া আবার কোন বিরুদ্ধ ভাব ইঁহার সম্বন্ধে মনে আনে, সেইজন্যই হঠাৎ শান্তি এতটা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু নীরদ তার ভিতরের অর্থ না বুঝিয়া উল্টাই বুঝিল। পূর্ব্বেকার সেই লজ্জার অভিনয়গুলা চকিতের মধ্যে মনের ভিতর আসিয়া তার কর্ণমূল অবধি রাঙ্গা করিয়া তুলিল, ধিক্কারের সহিত সে নীরব হইয়া রহিল। এখন যে সে সকল দুরাশাস্বপ্ন মনের কোণেও আর জাগিয়া নাই, যৌবনের সেই সব উদ্দাম চপলতা তার উৎপত্তিস্থলেই নিঃশেষে লীন হইয়া গিয়াছে, এ

কথা কেমন করিয়া সে বুঝাইবে? একবার ইচ্ছা হইল বলিয়া উঠে—'আমি তোমায় রক্ষা করিতে লোকতঃ ধর্ম্মতঃই অধিকারী। সেই আত্মীয়তার সম্পর্কেও আমি তোমায় এ অবস্থায় ফেলিয়া যাইতে পারি না?'—কিন্তু সে কথাটা বলা এখন আরও কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।—যে দিদি শান্তির শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সামগ্রী, সেই দিদিরই স্বামী সে। অমু তারই অংশ, তারই হৃদয়-শোণিতের বিন্দু—তথাপি এ কথা কেমন করিয়া ঘৃণা লজ্জার মাথা খাইয়া সে ব্যক্ত করিবে? দর্পহারী! এ কি ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত!

অনিচ্ছার সহিত বিদায় চাহিল। শান্তি ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"আর আস্‌বেন না?"

নীরদ সাগ্রহে উত্তর দিল—"কাল সকালেই আস্‌বো।"

নীরদ চলিয়া গেল। শুষ্ক অশ্রুহীন নেত্রে শান্তি বহুক্ষণ ধরিয়া তার গন্তব্য পথের দিকে চাহিয়া রহিল, ক্রমে যখন সন্ধ্যার ম্লান ছায়ান্ধকারের মধ্যে গলির বাঁকের মুখে নীরদের সুদীর্ঘ আকৃতি মিলাইয়া গেল, তখনও সে পলকহীন নেত্রদ্বয় সেইদিকেই স্থির রাখিয়া গঠিত মূর্ত্তির মত স্তব্ধ রহিল। অবশেষে যখন মেঘভরা আকাশ হইতে বজ্রপাতের সাড়া আসিয়া ঝন্‌ঝন্ শব্দে ঘরখানাকে কাঁপাইয়া তুলিল এবং ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া জল পড়িতে আরম্ভ হইল, তখন সে সেই লক্ষ্যহীন দৃষ্টি বহুদূর হইতে ফিরাইয়া আনিয়া বিছানার উপর অবসন্ন দেহভার লুটাইয়া দিল।

পরদিন প্রভাতে মাথার যন্ত্রণায় শয্যাত্যাগ করিতে না পারিয়া শান্তি পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলিল—"চন্দর! আজ কি রোদ উঠেছে? জানালাটা খুলে দাও না, আমার প্রাণটা যেমন হাঁপিয়ে উঠেছে!"

কয়দিন হইতেই শান্তির, অসুখ চলিতেছিল, গত রাত্রি হইতে জ্বরটা খুবই বাড়িয়াছে। এখানে আসিয়া শরীরের প্রতি যত্ন তো একেবারে নাই। কাজেই রোগ দিনে দিনে দুষ্ট কীটের মত জীবনী-শক্তির আধার-স্থল কর্ত্তন করিয়া পুষ্ট হইতেছিল। দাসী জানালা খুলিয়া দিলে খোলা জানালার মধ্য দিয়া বাহিরের পানে চাহিয়া দেখিবার পূর্ব্বেই দ্বারে জুতা পায়ের শব্দ শুনা গেল ও পরমুহূর্ত্তে হেমেন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিল। শান্তির উৎসুক নেত্র মুহূর্ত্তে নিরাশায় ম্লান হইয়া আসিল। যে অবসন্নভাবে বালিশের উপর মস্তক নিক্ষেপ করিয়া একটা হৃদয়ভেদী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। হেমেন্দ্র তার অবস্থা লক্ষ্য করিল না—সে আজ বহুদিন পরে অনেকটা প্রফুল্ল,—ছাতা ও শালখানা একটা বাক্সর উপর নিক্ষেপ করিয়া পরিশ্রান্তভাবে বিছানার উপর বসিয়া পকেট হইতে একখানা রসিদ বাহির করিয়া শান্তির সম্মুখে ধরিয়া প্রফুল্লকণ্ঠে কহিল—"এতদিনে কতকটা সুবিধা হয়ে এসেছে—এইখানা ভাল করে রেখে দাও দেখি?"

শান্তি বিষণ্ণ দৃষ্টি তুলিয়া স্বামীর পানে চাহিল, কাগজখানা লইতে কোন আগ্রহই সে প্রকাশ করিল না। হেম তখন আপনা হইতেই বলিল—"তোমার গহনাগুলো লক্ষ্মীপুর থেকে যোগেশ আদায় করে এনে

একজন ব্যারিষ্টারের কাছে বন্দক রাখিয়ে দিলে, টাকাগুলো তাঁর কাছেই জমা রইল, তিনি তো খুবই উৎসাহ দিচ্ছেন, বলচেন—কোন ভাবনা নেই! বাসন্তী থিয়েটারে কাল "যমুনা" প্লে হ'ল কুমার উৎপলাদিত্য সেজে কি নামটাই বেরিয়েছে! ম্যানেজার তো যোড়-হাত! মাইনে দিতে চায়, দুশো টাকা, কিন্তু এখন কিছুদিন সবই ছাড়তে হবে, এইবার ভাল করে অদৃষ্টটাকে পরীক্ষা করেই দেখা যাক্।"

শান্তি একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, বাবু ঘরে ঢুকিতেই চন্দন ঘর ছাড়িয়া গিয়াছিল। বাহিরে যোগেশের সহিত তার কোন্দলের একটা উচ্চ স্বর শুনা যাইতেছে। রক্তহীন পাংশু মুখ স্বামীর প্রতি ফিরাইয়া প্রদীপ্ত নেত্র তার মুখে স্থির রাখিয়া উচ্চ তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল—"ভাগ্য পরীক্ষা! ভাগ্য পরীক্ষা বলো না—ভাগ্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বল—বিদ্রোহ বল।"—উত্তেজনায় নিশ্বাস তার রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল—"বেশী দিন নয়—আর দু-চারটে দিন অপেক্ষা কর, আমায় মরতে দাও, তারপর তোমার যা খুসী করো, কে বারণ করবে? শুধু এই সামান্য কটা দিন ভিক্ষা চাইচি, দয়া চাইচি, কখনও তো তোমার কাছে কিছু পাই নি, শেষ ভিক্ষা, শেষ—"

হেমেন্দ্র সভয়ে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, আকস্মিক ভয়ে তার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল—"শান্তি! শান্তি পাগল হলে নাকি? কি করচ?—থামো থামো—"

আলুথালুভাবে বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া চিরসহিষ্ণু শান্তি সবেগে মাথা নাড়িয়া তেমনই উত্তেজিত তীব্র কণ্ঠে বলিতে লাগিল—"আর আমি থাকতে পারছি নে! কত আর থামব? আমার সময় যে ফুরিয়ে এসেছে, তুমিই একটু থামো—আমায় আগে মরতে দাও, তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে যা তোমার খুসী তাই করো, কেউ বাধা দেবে না—মাগো!" সহসা

সে সবেগে বিছানার উপর পড়িয়া গেল, শক্তির অতিরিক্ত ব্যয়ে দেহ অবসন্ন হইয়া গিয়াছিল।

নির্ব্বাক হেম তার নিশ্চেষ্ট অসাড় শরীরের দিকে কিছুক্ষণ বদ্ধদৃষ্টি হইয়া থাকিয়া সহসা তাহার নিকট ছুটিয়া আসিয়া ডাকিল—"শান্তি! শান্তি!" গায় হাত দিয়া দেখিল, দেহ নিশ্চল! তখন ভয়ে বিস্ময়ে তার হাত পা অবসন্ন হইয়া আসিল, রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল, যোগেশ!

যোগেশ দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিয়া ক্রোধোত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"কি পাজী, তোমার ঐ ঝি মাগীটা! আমায় বলে কি না, 'তুমিই তো বাবুর শনি হয়েচ'—এ কি ছোটবাবু?"

হেম অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িয়া তীব্র যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদের সুরে কহিয়া উঠিল—"আমি ওকে খুন করেচি।"

"এঁ্যা!—সে কি!" তড়িতস্পৃষ্টের মত যোগেশ হেমের দিকে ফিরিতেছিল কিন্তু সেই সময় শান্তিকে একটু নড়িতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি সামলাইয়া লইয়া কাছে আসিল—"না, না, মূর্চ্ছা হয়েচে! একটু জল আন, কপালটা ভয়ানক গরম যে! আমি একজন ডাক্তারকে ডেকে আনি।"

হেম সাতঙ্কে বলিয়া উঠিল—"না যোগেশ, আমিই তার চেয়ে ডাক্তারের জন্যে যাচ্চি। তুমি থাক।"

যোগেশ বলিল—"তাই যাও" মনে মনে ভাবিল, ভীরু! সব তাতেই তোমার সমান ভয়! যোগেশকে স্ত্রীর সঙ্গে একটা কথা কইতে দেখলেও তো প্রাণে সয় না! শান্তির পরিণাম তাকেও যেন অলক্ষ্যে অনুতাপের কশাঘাতে ক্লিষ্ট করিতেছিল, যথার্থ কথা বলিতে গেলে সেই তো হেমের মন্ত্রণাদাতা। আহা, দুজনে মিলিয়া কি তবে সত্য সত্যই বেচারাকে খুন করিয়া ফেলিল নাকি? এতটা হইবে কে জানিত!

হেমেন্দ্রকে অধিক দূর যাইতে হইল না। গলির মধ্যেই পরিচিত প্রসন্নবাবু ডাক্তারের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"আমি আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম, শীগ্‌গির একবার আমার বাড়ী আসুন—"

ডাক্তার কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তার পূর্ব্বেই তাঁর সমভিব্যাহারী ভদ্রলোকটি তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিল, "কি হলো? শান্তি কেমন আছে?"

হেমেন্দ্র অপরিচিতের এই অযাচিত আত্মীয়তায় যথেষ্ট বিস্মিত হইলেও বিরক্ত হইতে পারিল না বা ঘনিষ্ঠতা দেখানর জন্য আগন্তুকের ধৃষ্টতার কথা মনেও ধরিল না। সে তখন ঘোর বিপন্ন—মনে হইল—হয় তো ইহার নিকট কিছু সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। সে কে, সে প্রশ্ন পর্য্যন্ত না তুলিয়া ঈষৎ আশ্বস্ত চিত্তে উত্তরে বলিল—"হঠাৎ তার মূর্চ্ছা হয়েচে। আপনারা শীগ্‌গির আসুন।" শান্তির চেহারা দেখিয়াই নীরদ তার শারীরিক অবস্থার বিষয় বুঝিয়াছিল, সেইজন্য সে বীরেশ্বরের নিকট সন্ধান লইয়া ডাক্তারের নিকট গিয়াছিল।

ডাক্তারের সঙ্গেই যোগেশ প্রেস্ক্রিপ্সন লইয়া চলিয়া গেলে নীরদ পরুষ কণ্ঠে মুহ্যমান হেমেন্দ্রকে বলিয়া উঠিল—"এমনি করেই কি মেরে ফেলতে হয়?" নীরদের ব্যবহারে হেম বুঝিয়াছিল—তিনি রজনীনাথেরই কোন আত্মীয়—শান্তির বিশেষ আপন জন। হেমেন্দ্র লজ্জিত-মৃদুস্বরে গুন্ গুন্ করিয়া বলিল—"চিকিৎসা তো হচ্ছিল, ডাক্তার বল্লে ম্যালেরিয়া—"

নীরদ বাধা দিল—"ছাই চিকিৎসা হচ্ছিল! ও কি জীবনে কখনও এমন অবস্থায় থেকেচে? এ তোমার একবার মনেও হ'ল না!"

অপরিচিতের এই তীব্র তিরস্কারে গর্ব্বিত হেমেন্দ্র আজ রাগ করিল না বরং লজ্জায় মরিয়া গেল। সে যে কত বড় অপরাধে অপরাধী সে

কথা জ্বলন্ত লৌহ দ্বারা বুকের ভিতর আগুনের অক্ষরে বিধাতা সম্প্রতিই লিখিয়া দিয়াছেন যে! নীরদ আসিয়া কাছে বসিল, একটুও ইতস্তত না করিয়া তার মুখে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া বলিল—"শুনলে তো, ডাক্তার কি বলে গেলেন? এখনও কি রজনীবাবুকে খপর দিতে আপত্তি আছে? ভেবে দেখ, শান্তি যদি না বাঁচে, চিরদিনের জন্য তাঁদের কি আক্ষেপই না থেকে যাবে!"

হেমেন্দ্র শিহরিয়া কাতর কণ্ঠে বলিল—"ও কি সত্যই বাঁচবে না? দয়া করে আপনি ওকে বাঁচান, আমায় আপনি যা করতে বলবেন, আমি করবো, আমিই ওকে মেরে ফেল্লুম।"

হেমেন্দ্রের চোখ ফাটিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। বিমর্ষ মুখে কহিল—"ও যদি না বাঁচে আমি লোকের কাছে মুখ দেখাব কেমন করে? আমার এ সংসারে শান্তি ছাড়া আছেই বা কে? আমার—" থামিয়া গভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পুনশ্চ কহিল—"বেঁচে থাকা অসহ্য হয়ে উঠবে, আপনার বল্‌তে এ পৃথিবীতে আমার কেউ নেই।"

নীরদ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। হেমকে সে যেরূপ মমতাহীন পাষণ্ডরূপে কল্পনা করিয়াছিল, তাহাকে ঠিক সে রকমটি না দেখিয়া সে যেন অনেকটা আশ্বস্ত হইল। অবস্থা চক্রে পড়িয়া সেও বার বার তার স্বভাবের বিপরীত আচরণ করিয়াছে। সে নিজে দোষী, সে অন্যের বিচারক হইবে কোন্ মুখে? তাহাকে যে তিরস্কারগুলা শুনাইবে বলিয়া জমা করিয়া রাখিয়াছিল, নিঃশব্দে সেগুলা হজম করিয়া লইয়া সান্ত্বনাপূর্ণ ধীর স্বরে কহিল—"হতাশ হ'য়ো না হেম! প্রারব্ধ বলবান বটে, কিন্তু পুরুষকারও সামান্য বল নয়। আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে আমরা যেন পরাঙ্মুখ না হই। তারপর ফলদাতা তাঁর কাজ কর্ব্বেন। তাহ'লে টেলিগ্রাম করি? শান্তির পক্ষে এখন তার রোগের মূল ওষুধেরই বেশী

দরকার।” লজ্জায় হেমেন্দ্র কোন কথা বলিতে পারিল না, কিয়ৎক্ষণ পরে সে মুখ না তুলিয়াই মৃদুকণ্ঠে কহিল—“তাঁরা কি ক্ষমা করবেন ?”

হেমেন্দ্র সব কথাই অপরিচিত আত্মীয়ের নিকটে খুলিয়া বলিল—কেমন করিয়া রজনীনাথকে যোগেশের সাহায্যে বিদায় দিয়া সেদিন সে তার অপমানের প্রতিশোধ লইয়াছিল, সে কথাও বাদ দিল না। তার আহত মুখের সেই রক্তহীন বিবর্ণতা স্মরণ করিয়া অন্তরের মধ্যে আজ সে লজ্জা ও অনুতাপের তীব্র কশাঘাত অনুভব করিল।

অদূরে দত্তবাবুদের শ্বেত প্রাসাদের উপর হইতে ধীরে ধীরে সূর্য্যরশ্মি নামিয়া যাইতেছিল এবং শীতের অকাল সন্ধ্যায় শান্তির ছায়াচ্ছন্ন ললাটের মতই পশ্চিম আকাশ ম্লান হইয়া আসিতেছিল, সেই দিকে চাহিয়া থাকিয়া নীরদ আগ্রহহীনভাবে প্রশ্ন করিল—“তোমার বিনোদদা’র স্ত্রী তো জাল ? সে না কি লোক ভাল নয় ?” এমন বিপদের মধ্যেও একটা দুর্দ্দমনীয় কৌতূহলের হাত সে এড়াইতে পারিল না।

হেম ঈষৎ বিস্মিত ও অপমানিতভাবে মুখ তুলিয়া চাহিল। ঈষৎ গর্ব্বিতভাবে কহিল—“তা’ আমি কি করে জানব ? তা ছাড়া সে সব পারিবারিক কথা—” বলিতে বলিতে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া ঈষৎ অপ্রতিভভাবে বলিল—“আমায় মাপ করবেন, সেও যা ঘটেছে আমারই দোষে। সত্য কথা বলতে কি···আমি তাঁকে কিছুই জানি নে, তবে তার উপর শান্তির যে রকম মনের ভাব, তাতে তাঁকে দেবী বলেই আমার মনে করা উচিত ছিল।” আবার দুজনে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। —“সেখানেও একটা খপর দিলে হয় না ? তিনি হয় তো এলেও আসতে পারেন। শুনেছি, জ্যেঠামশায় এখনও আমায় স্নেহ করেন, আমার জন্য না হলেও শান্তির স্বামী বলে তাঁরা হয় তো আমায় ক্ষমা করবেন—”

হেমের এই কথায় নীরদ উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—"তুমি শান্তির কাছে যাও আমি টেলিগ্রাম দুটো করে আসছি।"

হেমেন্দ্র আসিয়া দেখিল, শান্তি জাগিয়াছে, সে যেন ব্যাকুল নেত্রে কাহারও অন্বেষণ করিতেছিল, তাহাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অভিমানে অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

সেই রোগক্লিষ্ট অভিমানী চিত্তের নীরব বেদনা—হেমকে আজ একান্তরূপেই আঘাত করিয়াছিল, তথাপি প্রকৃতিগত আত্মাভিমানের বশে মুখটা মুহূর্ত্তের জন্য ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠিল কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে ভাবটা সামলাইয়া লইয়া বিছানার উপর তার অত্যন্ত নিকটে আসিয়া বসিল এবং কিছুক্ষণ তার অভিমানাহত বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল—"শান্তি!" সেই এক উৎসব-রজনীর পুষ্পমণ্ডিত প্রাঙ্গণে শঙ্খরোলের মধ্যে যে দুইটি লজ্জা মুকুলিত নেত্র অর্দ্ধমুদিত ফুল-কলিকার মত তার দিকে প্রথম সলজ্জ দৃষ্টিপাত করিয়াছিল, তার মধ্যে তখন কি পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভরতাই ছিল, আজ কে' তাহার পরিবর্ত্তে এই হতাশা ও বেদনা মাত্র প্রতিদান দিল?—সেই না?

"আমার দিকে চাও, শান্তি—" বলিয়া সে শান্তির একখানা শীর্ণ হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইল, তার স্বর অশ্রুজলে জড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। শান্তি সাশ্চর্য্যে মুখ ফিরাইল, নিঃশব্দে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি আমার জন্য দুঃখ করচো? আমি মরে যাচ্চি বলে?"

হেমেন্দ্র দুই হাতে শান্তির দুর্ব্বল হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া তার মুখের উপর নত হইয়া পড়িয়া আবেগ-রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল—"হ্যাঁ, তোমারি জন্যে শান্তি! শান্তি! তুমি যে আমার সর্ব্বস্ব! আমি সব দুরাকাঙ্ক্ষা ছেড়ে দিয়ে মানুষ হ'ব, শান্তি! শুধু তুমি আমায় ছেড়ে যেও না! শান্তি!

লক্ষ্মী তুমি আমার! তোমায় চিনি নি, তাই আজ আমি লক্ষ্মীছাড়া হয়েছি। আমার মঙ্গল-লক্ষ্মী! অমঙ্গলের মুখে আমায় একা অসহায় ভাসিয়ে দিয়ে তুমি অমন করে চলে যেও না!"

বলিতে বলিতে হেম দেখিল, তার কথাগুলা সবই ব্যর্থ হইতেছে—শান্তি জাগিয়া নাই, তার ক্ষীণ হাতখানি হেমের হাতের মধ্যে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। রোগের গতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হেম তার সেই অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত আনন্দের মূর্চ্ছাকে নিদ্রা ভাবিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে কাছে বসিয়া তার রুক্ষ চুলগুলা মুখের উপর হইতে সরাইয়া দিতে লাগিল। শান্তির মুখে এত সৌন্দর্য্য আর কখনও তো সে লক্ষ্য করে নাই! নির্ব্বাপিত প্রায় দীপশিখার ম্লান আলোকে তার মনের সমস্ত অন্ধকার কালিমা দূরীভূত হইয়া গিয়া সেখানে আজ এক অসম্ভাবনীয় দিব্য জ্যোতি প্রকাশিত হইয়া উঠিল।

৪৫

বাড়ীতে ক্রিয়াকলাপ কাজ কর্ম্ম যথাপূর্ব্বই চলিতেছে, তথাপি বাঁশী এক হইলেও ভিন্ন সুরে যেমন তাহা হইতে আনন্দ ও বিষাদ যুগপৎ ধ্বনিত হইয়া থাকে, সেইরূপ শান্তি না থাকায় লক্ষ্মীপুরে দেব-সেবা অতিথি-সেবা হইতে সমস্ত কাজ-কর্ম্মের মধ্যে কি এক অভাব—কি এক শূন্যতা, যেন কি একটা শ্রীহীন অবসাদে বিজড়িত হইয়া গিয়াছিল।

ঠিক এমন সময় সিদ্ধেশ্বরীর আকস্মিক মৃত্যুতে সংসারের সমুদয় ভার শিবানীর ঘাড়ে, পড়িয়া তাহাকে নিমেষে জাগাইয়া তুলিল। এত বড় সংসার তার দিকে বাহু প্রসারিত করিয়া আহ্বান করিতেছে? এখন তার

এমন করিয়া নিজের মর্ম্মবেদনায় বিদ্ধা-বিহঙ্গিনীর মত এখানে সেখানে লুটাইয়া বেড়াইলে চলিবে কেন? সম্মুখে যে সুবিস্তৃত কর্ম্মভূমি কর্ত্তব্য-সাধনের জন্য অলঙ্ঘ্য অঙ্গুলি হেলাইয়া দৃঢ় কণ্ঠে আহ্বান করিতেছে, তার নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিবার সাধ্য কাহার আছে? মনকে সে বুঝাইতে লাগিল, ঈশ্বর যাকে যেখানে দিয়েছেন, সেখানকার সকল কর্ত্তব্য প্রফুল্ল চিত্তে যদি পূর্ণভাবে সমাধা করা যায়, তবে এ জীবন উদ্দেশ্যহীন কেন হবে? যিনি আজ তাঁর মধ্যে সম্মিলিত, এ কি তাঁকেই পাওয়া যাবে না? —শিবানী এই প্রথম বার জোর করিয়া মনে করিল, সে বিধবা! ছিঃ, মিথ্যাকে সত্যের ভাণে চাপিয়া মনকে সান্ত্বনা দেওয়া না তাকে আঁখিঠারা? ঈশ্বরের দেওয়া দণ্ড সহিষ্ণুতার সহিত মাথা পাতিয়া গ্রহণ করাই মনুষ্যত্ব। হাহাকার করিয়া মাথা কুটিলেও অদৃষ্ট বন্ধনের গ্রন্থি যখন খুলিবার নয়, তখন তাকে পাকে পাকে জড়াইয়াই বা কি লাভ। শিবানী মনের সমস্ত দুর্ব্বলতা ত্যাগ করিয়া নিজের রুদ্ধ গৃহের কবাট খুলিয়া বাহিরের তপ্ত রৌদ্রে আসিয়া দাঁড়াইল। কাহাকেও সে কিছু বলিল না, চুপি চুপি স্নানের পর শাদা থান পরিয়া হাতের গহনাটা খুলিয়া ফেলিল।

শ্যামাকান্ত শিবানীর বিধবা বেশ দেখিয়া প্রথম তাহাকে চিনিতে পারেন নাই, তারপর চিনিয়া "তারা!" বলিয়া শিহরিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন, বুকের মধ্যে একান্ত অতর্কিতে ভীষণ একটা আঘাত সজোরে পড়িয়াছিল। অল্প পরে শ্বাস লইয়া আর্ত্তভাবে বলিলেন—"বৌমা! আমায় তোমরা সবাই মিলে এমন করে হত্যা করো না। কেমন করে তোমার এ মূর্ত্তি আমি দেখব মা?" শিবানী এই ভৎ'সনার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল, সে অকুণ্ঠিত সাহসে মুখ তুলিয়া পরিষ্কারস্বরে কহিল—"আমায় আর অন্যায় কার্য্যে প্রশ্রয় দেবেন না, যা করতেই হ'বে, তা'র জন্য প্রস্তুত হওয়াই ভাল।"

শ্যামাকান্ত কাতর স্বরে কহিলেন—"তবু যে আশা ছাড়তে পারি নে, মা! এখনও যে তাকে ফিরে পা'ব মনে করতে বড় ভাল লাগে, সেও ছেড়ে দেবে।!"

এদিকে কাশী-যাত্রার সমুদয় আয়োজন প্রস্তুত। সেখানে দেওয়ানজী নিজে গিয়া বাড়ী ঠিক করিয়া আসিয়াছেন, বিষয় কার্য্যের বন্দোবস্ত ঘর-বাড়ীর ব্যবস্থা সবই যথাসম্ভব স্থির হইয়াছে, শুধু তাঁর শরীরটা একটু সুস্থ হইলেই যাওয়া হয়। শিবানীও লক্ষ্মীপুর ত্যাগ করিতে পারিবে ভাবিয়া অনেকটা প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। সমাজ-বন্ধনের বাহিরে জনবিরল কুটিরের শান্তিপূর্ণ স্বাধীন জীবন মনে মনে তপঃপূত শুদ্ধ করিয়াই সে গঠিত করিতেছিল। ঐশ্বর্য্যের ক্রোড় ছাড়িলে—আঃ, কি শান্তি, কি অপরিমেয় সুখ! বনের হরিণী যেন নিগড় নিবদ্ধ হইয়াছিল। কেবল অমূল্যকুমারই এ বন্দোবস্তে খুসী হইতে পারিতেছিল না। সে মধ্যে মধ্যে আসিয়া পিতামহকে প্রশ্ন করিতেছিল—"সেখানে গালি আচে? পুতুল আচে? কমলা নেবু আচে? আল কি আচে?"

কয়েকদিন পরে রোদ উঠিয়াছে, রোদ উঠার সঙ্গে পায়ের বেদনা কমিয়া গিয়াছে দেখিয়া শ্যামাকান্ত পাঁজি দেখাইয়া কাশী যাত্রার দিন স্থির করিলেন।—আগামী বুধবার যাত্রার শুভ দিন। শ্যামাকান্ত মনে মনে বলিলেন—"মাগো! যেন শীঘ্র শীঘ্র মুক্তি পাই মা! আর কিছুই শুভ আমার নেই—শুধু এখন তোর পাদপদ্মে একটু স্থান।"

শিবানী সমস্ত দিন ধরিয়া বাসনকোসন গুছাইয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি একত্র করিল, যাহা যেখানে রাখিবার রাখিতে তুলিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল, তাড়াতাড়ি কাপড় কাচিয়া পূজার ঘরে প্রবেশ করিতে যাইতেছে, এমন সময় রোরুদ্যমানা জ্ঞানদা আসিয়া ডাকিল—"বড়মাগো! কর্ত্তা-বাবু তোমায় শীগ্‌গির ডাকচেন।"

কি একটা অজানিত ভয়ে শিবানীর বুকের মধ্যে 'ধড়াস্‌' করিয়া উঠিল। কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"কেন রে? কেন ডাকছেন?" ক্রন্দন-বিজড়িত স্বরে জ্ঞানদা কহিল—"ছোটমার নাকি বড্ড ব্যারাম গো—বাবুর কাছে তার এয়েচে—বাঁচে কি না বাঁচে।" শিবানীর হাত পায়ের তলা হিম হইয়া গেল।

শ্যামাকান্ত বধূকে দেখিয়া অসম্বরণীয় হৃদয়াবেগে রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন—"আমার মৃত্যু নেই, অর্দ্ধমৃত অবস্থায় এই সব চোখে দেখবার জন্যই বেঁচে থাকলাম! নিজে ছুটে গিয়ে যে দেখব সে শক্তি নেই! মৃদু হইতে মৃদুতর স্বরকে আবার একটু স্পষ্ট করিয়া বলিলেন—"তুমি যাও মা! বেশী করে টাকা নিয়ে যাও, যেন বিনা চিকিৎসায় মাকে আমার মেরে ফেলে না। কবিরাজ মশাই, বিপিন আর দাসীদের দু-একটাকে সঙ্গে নিও, হ্যাঁ, আর এই দলিলখানা হেমকে দিও, যদি তার এতেও একটু দয়া হয়। আর একটা কাজ কর, বিপিনকে ডেকে পাঠাও, রজনীকে একটা তার করুক—সে বোধ করি কিছুই জানে না। তারা! মা! ব্রহ্মময়ী! আমায় তোর চরণে স্থান দেনা মা! মাগো আর যে আমি পারি নে!"

শিবানী নীরবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। আজ অনেক দিন পরে তার শুষ্কনেত্রে জল পড়িতেছিল।

যখন দারুণ উৎকণ্ঠা ও নিরাশা বহিয়া গাড়োয়ান নির্দ্দিষ্ট বাড়ীর মধ্যে শিবানী প্রবেশ করিল, তখন চারিদিকের গাছপালার উপর দিয়া সন্ধ্যার ঘনান্ধকার পল্লীখানিকে নিবিড়ভাবে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে। শীতের কুয়াসা ও মেঘ তারকা চন্দ্রকে আচ্ছাদিত করিয়াছে। মধ্যে মধ্যে চলন্ত তরল মেঘের আবরণের মধ্য দিয়া বিকারের রোগীর নিষ্প্রভ ঘোলা চক্ষুর ন্যায় ম্লান চন্দ্র প্রকটিত হইয়া আবার মেঘান্তরের আচ্ছাদনে লুকাইয়া পড়িতেছিল। ঝোঁপঝাপ গাছপালার মধ্যে পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার আশ্রয়

গ্রহণ করিয়াছে। ঝিকিমিকি জোনাকির পুচ্ছ শত শত স্তিমিত আলোক-রশ্মি জ্বালাইয়াও সেই দুর্ভেদ্য ঘনান্ধকারকে পরাভূত করিতে না পারিয়া বৃক্ষে বৃক্ষে কেন্দ্রচ্যুত উল্কাখণ্ডের মত অসহায়ের মত ছুটিয়া বেড়াইতেছিল।

প্রবেশ দ্বারের ঠিক সম্মুখের বারাণ্ডায় একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বলিতেছে। কে' একজন সেই আলোর সম্মুখে বসিয়া একখানা ক্ষুদ্র নোটবুকে পেনসিল দিয়া নিবিষ্ট মনে কি সব লিখিতেছিল। তার ললাটের উপর হইতে অসন্নিবেশিত কুঞ্চিত কেশের গুচ্ছ আসিয়া পড়িয়াছিল বলিয়া শিবানী তার মুখ দেখিতে পায় নাই, বর্ণে ও আকারে হেমেন্দ্র বলিয়াই সে তাহাকে অনুমান করিয়া লইল—এবং সেই বিশ্বাসেই অগ্রসর হইয়া ভয়বিহ্বল ব্যাকুলকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল—"ঠাকুরপো!"

সেই ব্যক্তি চমকিয়া মুখ তুলিল। সম্মুখস্থ আলোকরশ্মি অতি পরিষ্কাররূপে তাঁর মুখের উপর পতিত হইয়াছিল—শিবানী দেখিল—সে হেমেন্দ্র নহে, কিন্তু কে'—? কে'?—কে'? একবারমাত্র সেই মুখখানার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই শিবানীর আপাদমস্তক বায়ুস্রোত বিতাড়িত কাশ-গুচ্ছের মত সঘনে বিকম্পিত হইয়া উঠিল। একি, তবে সেই? শিবানি তার বিস্ফারিত দৃষ্টি সেখানে সংবদ্ধ রাখিতেও পারিতেছিল না—ফিরাইয়া লইবার শক্তিও তার ছিল না—

কোন্ মহা ঐন্দ্রজালিকের গৃহ এ—যেখানে অসম্ভবও অনায়াসে সম্ভবপর হইয়া উঠে? যেখানে স্বপ্ন প্রত্যক্ষ শরীরে দেখা দিয়া চির নিরুদ্ধ আশাস্রোত অতর্কিতে আঘাত করে? এ কোন্ মায়ার রাজ্যে সে আজ সহসা আসিয়া পড়িল?—মুহূর্ত্ত মাত্র সে ব্যক্তি নিশ্চেষ্ট রহিল—কিন্তু তার পর—এও কি ইন্দ্রজাল? হঠাৎ সে পেনসিল ও খাতা পকেটে ফেলিয়া শিবানীর নিকটে—সে এতই নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল যে তার দ্রুত তপ্ত শ্বাস শিবানীর গণ্ড স্পর্শ করিল—শিবানীর বক্ষের দ্রুত

কখনও হয়ত তার কর্ণে অনুভূত হইয়া থাকিবে ?—একমুহূর্ত্ত কেহ কোন কথাই কহিল না। দুইজনেই নিস্পন্দ লোচনে পরস্পরের পানে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল।

বিরাট পুরুষের সমাধি অবস্থার ন্যায় সমস্ত চরাচর তখন ধ্যানমগ্নবৎ স্তব্ধ রহিয়াছিল—কেবল ঝিল্লির সমতান সেই যোগময় বিশ্বের অন্তর-কেন্দ্রে প্রণবের অখণ্ড গম্ভীর ধ্বনির সহিত মিশিয়া যেন একাকার হইয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র শান্ত স্তব্ধ কুহেলি-জর্জ্জর শীতের রাত্রি নিঃশব্দে মন্দির-দ্বারে প্রহরারত প্রহরীর মত তার প্রহর-বেত্র হস্তে তর্জ্জনী তুলিয়া জাগিয়াছিল—শিবানীর হাত-পায়ের তলা হিম হইয়া আসিতে লাগিল।

নীরদকুমার আর একটু কাছে আসিয়া শিবানীর একটা হাত ধরিল, মৃদু অথচ অকম্পিত কণ্ঠে কহিল—"শিবানী! ভয় পেয়েছ ?—চিনতে পারছো না ?"

হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় লণ্ঠনের আলোটা নিবিয়া গিয়া ঘোর অন্ধকারের আবরণে চারিদিক আবৃত হইল।

এদিকে দ্বিতীয় মূর্চ্ছার পর হইতেই রোগীর অবস্থা অনেক মন্দ হইয়াছে। ভাল করিয়া আর সংজ্ঞা ফিরিয়া আসে নাই, মধ্যে মধ্যে প্রলাপও সে বকিতেছিল। সেই মৃত্যুচ্ছায়াঘন মুখের পানে আর্ত্তদৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া হেম বিছানা ঘেঁষিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। রোগী অল্পক্ষণের জন্য একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়াছে। নীরদ সন্তর্পণে কাছে আসিয়া কানের কাছে নত হইয়া চুপি চুপি বলিল—"তোমার বৌদি এসেছে—একটা আলো নিয়ে যাও।"—বলিয়াই হেমের মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল—হেমেন্দ্র কিন্তু একটুও দ্বিধা না করিয়া ব্যস্তভাবে বাহির হইয়া গেল।

অন্ধকারে শিবানী একা দাঁড়াইয়া ছিল, হেম আসিয়া তার দুই

পা দুইহাতে জড়াইয়া ধরিয়া পায়ের উপরে মাথা রাখিয়া ডাকিল—"বৌদি! তোমার মনে কষ্ট দিয়েছি ব'লেই আমার আজ এই শাস্তি! তুমি ক্ষমা কর বৌদি! না হলে আমি জন্মের মত গেলাম!"

শিবানীর সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়া উঠিল, অবসন্ন পা দুইখানা তখনও তার থর থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল, কণ্ঠ-তালু সমস্ত শুখাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে। তবু অতি কষ্টে শরীর মনে কিঞ্চিৎ শক্তি সংগ্রহ করিয়া স্নেহময়ী সর্ব্বংসহা জননীর ন্যায় লজ্জা ও অনুশোচনানিপীড়িত দেবরকে সে ধরিয়া তুলিতে গেল, সান্ত্বনা দিয়া বলিল—"এত কাতর হয়ো না ঠাকুরপো! শাস্তি আমাদের ভাল হবে বৈ কি!—ভগবান যে ক্ষমাময়!"

হেম তথাপি তার পা ছাড়িল না, উন্মাদের মত জোর করিয়া দুই হস্তে পা দুইটা ধরিয়া রাখিয়া পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল—"তোমার আশীর্ব্বাদ না পেলে শান্তি বাঁচবে না বৌদি! বৌদি! বল—বল, তুমি আমার কুব্যবহার ভুলতে পারবে?"

"স্থির হও, ঠাকুরপো! আমি কি কখন তোমার উপর রাগ করতে পারি? তুমি যে আমার ছোট ভাই। নিশ্চয়ই শাস্তি আমাদের ভাল হ'বে—ভয় কি?"

হেমেন্দ্র নত হইয়া হৃদয়ের সহিত আবার তার পদধূলি গ্রহণ করিল। ঈষৎ লঘুচিত্তে সে কহিল—"তোমার আশীর্ব্বাদে আবার আজ আমার আশা হচ্চে!"

রজনীনাথ যখন নীরদের টেলিগ্রাম পাইলেন, তখন মক্কেলদের বিদায় দিয়া নিজের পাঠাগারে সুপ্রকাশকে লইয়া বসিয়াছিলেন। সম্মুখে খোলা বই পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু সুকু তাঁকে তাহাতে মন দিতে দেয় নাই। একটু চিত্ত সংযত করিয়া একটি প্যারা না পড়িয়া উঠিতে উঠিতেই সে অসহিষ্ণু হইয়া পিতার বাহু আকর্ষণ করিয়া তাড়াতাড়ি কিছু না কিছু বলিয়া উঠে—"ঠিক এইখানটায় আপনি শুনলেন না!—বিস্কুটের টিন কেটে তো চাকা হ'ল, পাতলা কাঠের ছিল্‌কে দিয়ে পাখা জুটিও হবে—কিন্তু এইবার পেট্রোল না হ'লে তো চলবে না! সোফার আমায় দেয় না—তুমি যদি বাবা! তাকে একটু দিতে বলে দাও। তা হলেই দেখবে, আমার এয়ারোপ্লেন হুস্ হুস্ করে আকাশে উঠবে—ঐ আবার তুমি বই পড়চ—!" সুকুর অভিমানকে আজকাল রজনীনাথ ভয় করেন, তাই তাড়াতাড়ি বই রাখিয়া বলেন—"না রে, এই একটু দেখে নিলুম—আচ্ছা থাক্।"

সুপ্রকাশ খুসী হইয়া কাছ ঘেঁষিয়া আসিল, বিব্রতভাবে কোলে মাথা রাখিয়া দুই হাতে গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—"আচ্ছা, বাবা! সব্বার চাইতে আগে কোন্ দেশের লোকেরা উন্নত হয়েছিল?

এ প্রশ্ন নূতন নহে। রজনীনাথ স্নেহের সহিত হাসিয়া কহিলেন—"আমাদের দেশ।" সুকুও হাসিল।—এমন সময় বলাই আসিয়া বলিল, "আরজেণ্ট টেলিগ্রাম এসেছে একটা"—শুনিয়াই কে জানে কেন, হঠাৎ রজনীনাথ চমকিয়া উঠিলেন। তিনি রসিদটা সই করিতে লাগিলেন,

সুকু উঠিয়া ততক্ষণে খামখানা ছিঁড়িয়া রিং-টি সংগ্রহ করিতে উদ্যত হইল। সহসা তার মনে পড়িল ইহা দিয়া দিদি কতবার তার পুতুলের মালা করিয়াছে! ক্ষুদ্র বুকখানা আলোড়িত হইয়া উঠিল। পাছে বাবা বুঝিতে পারিয়া কাতর হন, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি টেলিগ্রামটা সে খুলিয়া ফেলিয়া পড়িবার চেষ্টা করিল। রজনীনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন—"বুঝতে পারছিস্?" সুপ্রকাশ অকস্মাৎ সর্পদষ্টের মত চমকিয়া আর্ত্তকণ্ঠে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল—"ও বাবা—বাবা—একি লিখেছে।—দিদির অসুখ—সিরিয়স্—মানে তো খুব কঠিন?" ঘরের মধ্যকার সমস্ত বায়ু একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়া রজনীনাথের নিশ্বাস রোধ করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল।—শান্তির কঠিন পীড়া! সুকুর হাত হইতে তাড়াতাড়ি টেলিগ্রামখানা টানিয়া লইয়া রজনীনাথ পড়িলেন। কি পড়িলেন বুঝিলেন না—নিঃশব্দে কাগজখানার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

সুপ্রকাশ সভয়ে ডাকিল—"বাবা!" রজনীনাথ মুখ তুলিলেন। প্রাণহীনের মত বিবর্ণ সে মুখের দিকে চাহিয়া ভীত সুকু আরও শিহরিয়া উঠিল? সভয়ে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সাহস করিয়া সে আবার ডাকিল—"বাবা?"

"কি সুকু?"

"যাবেন না আপনি দিদির কাছে? দেরি হয়ে যাচ্চে যে!"

রজনীনাথ স্বপ্নোত্থিতের মত চমকিয়া অধীর কণ্ঠে কহিলেন—যাবো সুকু—যাবো বই কি!—সে যে আমায় ডেকেচে!" সুপ্রকাশ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সহসা আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। রজনীনাথ ঘর হইতে দ্রুত বাহির হইয়া গেলেন।

ডাক্তার লইয়া ষ্টেশনে গাড়ীতে উঠিবার সময় হঠাৎ নজর পড়িল,

সুকুও সঙ্গে আসিয়াছে। কখন্ যে সে তাঁর সঙ্গ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা গভীর অন্যমনস্কতায় তিনি জানিতেও পারেন নাই। তাঁর আর তো কোন কথাই মনে ছিল না, কেবল মর্ম্মবিদারীযন্ত্রণায় হৃৎপিণ্ডের তালে ধ্বনিত হইতেছিল—শান্তি মৃত্যুশয্যায়—তাঁহাকে সে ডাকিতেছে! রজনীনাথ কাহাকেও কিছু না বলিয়া একেবারে রোগীর ঘরে প্রবেশ করিলেন। হেমেন্দ্রের গৃহে, পৌঁছিয়া আজ তাঁর ধীর ও সংযত ভাব দেখিয়া কেহ মনে করিতেও পারিল না যে, তিনিই এই সঙ্কটাপন্ন রোগীর স্নেহময় পিতা। হেমেন্দ্র মনে করিল—"এখনও আমাদের ক্ষমা করেন নি, উঃ কি কঠিন মন?" নীরদ সাশ্চর্য্যে মনে মনে ভাবিল—অসাধারণ ধৈর্য্য! একেই বলে জ্ঞানী।" ডাক্তারেরা পরস্পর বলাবলি করিলেন —"মেয়েটি ভাল না হলে বেচারা হয় তো পাগল হয়েই যাবে।—কি ভয়ানক আত্মদমন-প্রয়াস!"

শিবানী আসিবার কিছুক্ষণ পরে ভোরের সময় শান্তি একবার ভাল করিয়া চোখ চাহিল, ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ অস্ফুট কণ্ঠে ডাকিল —"দিদি!"

শিবানী তার মুখের উপর নত হইয়া সস্নেহে কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল—"আমরা যে তোমার কাছে এসেছি দিদি!"

দুর্ব্বল রোগী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর আবার অতি করুণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"জ্যেঠামশাই?"—তিনি কাল পরশুর মধ্যেই আসবেন—তাঁর পায়ে ব্যথা হয়েচে, তাই আসতে পারেন নি, তোমার অমূকেও আনবেন।"

শান্তির মুখে ঘোর নৈরাশ্য প্রকটিত হইল, সুদীর্ঘ নিশ্বাস টানিয়া সে ক্ষীণস্বরে কহিল—"বাবা তো আসবেন না।"

রজনীনাথ আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না, কাছে

আসিয়া কন্যার মাথায় হাত রাখিয়া রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিলেন—"শান্তি! মা—!"

"বাবা!" রোগীর ক্লিষ্ট মুখে আনন্দের গভীর উচ্ছ্বাস উজ্জ্বল দীপ্তিতে ফুটিয়া উঠিল। ক্লান্ত মস্তক ঈষৎ ফিরাইয়া সে পূর্ণ চক্ষে চাহিল—"ক্ষমা করেছ কি বাবা? আমার অপরাধ ক্ষমা করেছ কি?"

রজনীনাথের বক্ষ অবরুদ্ধ বেদনায় ফাটিয়া যাইতেছিল, কষ্টে কহিলেন—"ক্ষমা অনেক দিনই যে করা উচিত ছিল মা! সন্তান ভুল করলেও তো পিতার রাগ করবার অধিকার নেই।"

হেমেন্দ্র সহসা রজনীনাথের পায়ে মাথা রাখিয়া বলিল—"শান্তি আপনার আসবার খপরও পায় নি, সে সবই আমার দুর্ব্বুদ্ধি!—যোগেশ ও আমি মিলে মিথ্যা কথা বলে আপনাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলুম! ক্ষমা করুন! ক্ষমা করুন, আমায়!"

শুনিয়া রজনীনাথ রোষ-প্রদীপ্ত নেত্রে জামাতার দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন, শান্তি গভীর ক্লান্তিভরে চোখ মুদিল।

সে দিনটাও কাটিয়া গেল। ডাক্তারেরা বলিলেন—"আজ অমাবস্যা, আজই একটা ক্রাইসিস্, আজই যে কতকটা মানুষ চিনতে পারচে, এটা সুলক্ষণ। তবে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল—হঠাৎ কোন বিপদ না ঘটে যায়—" সমস্ত দিন সশঙ্ক চিত্তে কয়টি প্রাণী নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া রোগীর ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত মুখের দিকে চাহিয়া কাটাইল। পরস্পরের দিকে চাহিতে যেন কাহারও মনে সাহস ছিল না।

অপরাহ্ণের দিকে একবার সে সজাগ হইয়া সুপ্রকাশকে দেখিতে চাহিল। খুকু দিদির মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া যাইতেছিল, পিতার ইঙ্গিতে উদ্গত অশ্রুপ্রবাহ চোখের মধ্যে চাপিয়া গঠিত মূর্ত্তির

ন্যায় স্তব্ধ হইয়া রহিল।—এমন সময় শান্তি বলিল—"বাবা! মিঃ রায় এসেছিলেন না?"

রজনীনাথ নিরুত্তরে নীরদের কুণ্ঠিতমুখের দিকে অকুণ্ঠিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—"ওষুধ খাওয়াবার সময় হয়েচে না?" শিবানীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওষুধ দেবার পর একটু দুধ খাওয়াতে হবে বুঝি?" শিবানী অর্দ্ধাবগুণ্ঠনান্তরালে চাহিয়া দেখিল—মিষ্টার রায় ঔষধের গ্লাস লইয়া অগ্রসর হইতেছেন। সে কম্পিত বক্ষে অবসন্ন পা দুইখানাকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া দুধ গরম করিতে চলিয়া গেল।

বহুদিনের ক্লান্তিতে অবসন্ন ভাবনায় ভারাক্রান্তা শিবানীর বিষাদ ক্ষিণ্ণ ভগ্ন চিত্ত সহসা যে যাদুকরের স্মিতহাস্যমণ্ডিত জ্যোতির্ম্ময় আলোকে স্নাত হইয়া নবীন জগতে সদ্যজাত হইয়াছে, সেখানে জরামৃত্যুক্ষয় ক্ষতির আক্রমণকে গ্রহণ করিতে সে কোনমতেই পারিতেছিল না, তাই এই আসন্ন ঝড়ের মুখেও সে শান্ত সংযত অটলভাবে বিপদের সঙ্গে মুখোমুখী দাঁড়াইয়া আশ্বস্ত চিত্তে বুঝিতে ছিল।

রাত্রে রোগী শান্ত হইয়া ঘুমাইল। রজনীনাথের বিশ্বাসী কলিকাতার দুইজন বড় ডাক্তার কয়দিনই এখানে উপস্থিত, আজ আরও একজন আনা হইয়াছিল। বিশেষ ভয়ের সময়টা কাটিলে যে বাঁচা যায়! বসুমতী সেখানে জীবন্মৃতা। তাঁকে একটু ভাল বলিয়া সংবাদ দেওয়া হইলেও তাহাতে আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া তিনিও এই মাত্র লোক সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছেন।

পরদিন প্রভাতে যখন শান্তি জাগিয়া উঠিল, তখন জানালার চারিধার দিয়া নীলপর্দ্দার অন্তরাল হইতে প্রভাত সূর্য্যের নবীন রশ্মি সশঙ্কিত রোগীগৃহে শঙ্কাহীন নির্ম্মল শিশুর অকুণ্ঠিত সরল হাস্যমণ্ডিত নেত্রপাতের মত দ্বিধাশূন্য হইয়া চাহিয়া দেখিলেন। রাত্রির অন্ধকারে গত দিবসের

কর্ম্মক্লান্তি ও অবসাদের কালিমাকে মিলাইয়া দিয়া স্নিগ্ধ সুন্দর প্রশান্ত প্রভাত নবজাগ্রত জীববৃন্দকে নবীন শক্তি ও উদ্দীপনা দান করিয়া আবার কর্ম্মসংঘাতের মাঝখানে নামাইয়া দিতে আসিয়াছে, এখনও সেখানে ক্ষুধাতৃষ্ণার কাতর ক্রন্দন ও ঘাতপ্রতিঘাতের বিরোধ বা উদ্বেগের আকুলতা জাগিয়া উঠে নাই, জগৎ এখনও সদ্যোজাত শিশুর মতই নির্ব্বিরোধ। জগতের সমস্ত সঙ্কোচ, সমস্ত ভুলভ্রান্তি, সমস্ত পাপতাপ প্রতিদিনই—'অহস্তদবলম্পাতু'—এমনি করিয়া বিগতক্লেশ ও সুস্থ শান্ত হইয়া স্নেহময়ী মায়ের পুণ্য অঙ্কনতলে নবজাত শিশুর মতই দেখা দেয়। যুগ-যুগান্তর হইতে এই নিয়মই চলিয়া আসিতেছে, তবু যেন আজিকার প্রভাত একটা অতিরিক্ত আনন্দাভাস লইয়া এই গৃহেই আজ সর্ব্বপ্রথম জাগিয়া উঠিল।

শান্তিকে জাগিতে দেখিয়া ডাক্তার আসিয়া নাড়ী দেখিলেন, মুখ প্রফুল্ল হইল। রজনীনাথ গভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, শান্তি তাঁদের ভাব বুঝিয়া সম্মুখে উপবিষ্ট হেমেন্দ্রের ঔৎসুক্য-ব্যগ্র মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু করুণার হাসি হাসিল, হেমও ঈষৎ ম্লান হাসি হাসিয়া লজ্জায় মুখ নত করিল। তার পাপ তবে প্রায়শ্চিত্তবিহীন নয়!

একটু বেলা বাড়িলে সুকু আসিয়া রজনীনাথকে চুপি চুপি কি বলিয়া গেল, তাঁকে উঠিতে দেখিয়া এই সময় শিবানী একখানা কাগজ হেমের হাতে দিয়া বলিল—"বাবা আসবার সময় এই কাগজখানা তোমায় দিতে দিয়েছিলেন। কদিন দিতে পারি নি, ঠাকুরপো। এইটে নাও।"

"কি এখানা?—বলিয়া হেম সেটা খুলিয়া একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়াই তাহা মাটিতে ফেলিয়া দিয়া আরক্তমুখে বলিয়া উঠিল—"না:, ও সব অমূল্যর!—আমি নিজে উপার্জ্জন করবো, আমার আর ও তৃষ্ণাই যখন নেই, তখন ও আমি নোব না। তুমি তুলে রাখ বৌদি!"

রজনীনাথ শ্যামাকান্তের দানপত্রখানা কুড়াইয়া লইয়া মনে মনে পাঠ করিলেন। হেমেন্দ্র ও শান্তি অমূল্যের সহিত সমান অংশে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির অর্দ্ধাংশের অধিকারী এই কথাই তাহাতে লেখা ছিল। রজনী-নাথের সাহায্য না পাইয়া জেলা কোর্টের উকিলের দ্বারা বৃদ্ধ একটু কৌশলে দানপত্রখানি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তিনি তাঁর সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ পৌত্রকে এবং অপরার্দ্ধ বিধবা পুত্রবধূ শিবানীকে দান করিলেন —এই মর্ম্মে এক দলিল লেখাপড়া করা হয় এবং শিবানীও সঙ্গে সঙ্গে তার সমুদয় সম্পত্তি দেবর ও দেবরের পত্নীকে দান-পত্রে লিখিয়া দিয়াছিল। রজনীনাথ দানপত্র পড়িয়া একটু হাসিয়া শিবানীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন —"বিষয় তো তোমার নয় মা! তুমি দান করচো কেমন করে?— তোমার শ্বশুরের সম্পত্তি তাঁর আদেশ হলে তোমার স্বামীই দান করবার অধিকারী।" বলিয়া ক্ষুদ্র টেবিলের উপর শিশিপত্র গুছাইতে অত্যন্ত ব্যস্ত মিঃ রায়ের দিকে ফিরিয়া স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ কণ্ঠে ডাকিলেন "—বিনোদ!"—নীরদ ফিরিয়া দাঁড়াইল—রজনীনাথ কহিলেন—"তোমার বাবা এসেছেন, তাঁকে আনতে চল্লুম। তোমার স্ত্রীকে এ অসিদ্ধ দানপত্র তুমিই ফিরিয়ে দিও—"

সহসা সেই ঘরের মধ্যে বজ্রপাত হইলেও ইহা অপেক্ষা কেহ অধিকতর স্তম্ভিত হইত না। ক্ষণপরে হেমেন্দ্র উঠিয়া গিয়া নিঃশব্দে নীরদকুমারের পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া লজ্জাপীড়িতপ্রায় নিরুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল—"দাদা!"

বিনোদ তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিল, সস্নেহ আলিঙ্গনে সম্বদ্ধ করিয়া প্রশান্ত স্নেহে কহিল—"এসব বাজে কথায় আমাদের কাজ কি ভাই? বাবা আসচেন, এসো, আমরা একসঙ্গে দু-ভায়ে তাঁর পায়ে পড়ে ক্ষমা চাই—আমরা দুজনেই যে তাঁর কাছে অপরাধী।"

শান্তির রক্তহীন মুখ মুহূর্ত্তে আনন্দের উজ্জ্বল দীপ্তিতে জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল ; দিদি !"—বলিয়া সে শিবানীর সাগ্রহ বাহুর মধ্যে পরিতৃপ্ত চিত্ত শান্ত শিশুটির মত নিজেকে অর্পণ করিয়া স্নিগ্ধ হাস্যের সহিত তার মুখে উৎফুল্ল নেত্রের দৃষ্টি সংস্থাপিত করিল।

দ্বারের নিকট হইতে শ্যামাকান্ত ডাকিয়া বলিলেন—"কৈ আমার মা ! আমার মা কৈ গো ?"

সমাপ্ত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস,

২০৩/১/১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬